হিমালয়ের তিন সঙ্গী

(নাগাভূমি, মণিপুর ও ত্রিপুরা ভ্রমণ-কথা)

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

পূর্ণ প্রকাশন

৮-এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯
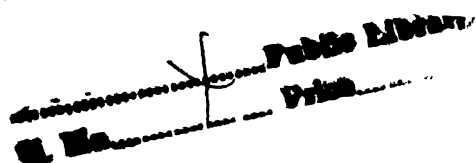
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
অনুজপ্রতিমেষু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

আলোচিত্র ও ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন :—ডিরেক্টার অব্ পাব্লিসিটি, ত্রিপুরা মণিপুর নাগাল্যাণ্ড ; অধ্যাপক সুধীর সাহা, ত্রিপুরা ; অধ্যাপক নীলকান্ত সিং, মণিপুর ; ডঃ আরাম, ডিরেক্টার, পীস্-সেন্টার, নাগাল্যাণ্ড ; শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য, রিসার্চ অফিসার, নাগা ইনষ্টিট্যুট্ অব্ কাল্চার, এবং বন্ধুবর শ্রীসুনীল ঘোষ, কলিকাতা।

এই লেখকের :

ভূস্বর্গ কাশ্মীর

বিপাশা নদীর দেশে (কুলু-মানালী ও কাংড়া-ভ্রমণ)

রূপসী প্রতিবেশী (নেপাল-ভ্রমণ)

এইচ্. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর শ্রেষ্ঠ গল্প

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর—ইত্যাদি

হিমালয়ের তিন সঙ্গী

নাগাভূমি
মণিপুর
ত্রিপুরা
আসাম
মোককচুঙ্
তুয়েনসাঙ্
ডিমাপুর
কোহিমা
মাও
মারাম
কাংপোক্‌পি
উখরুল
মণিপুর
ইম্ফল
বিষ্ণুপুর
লোকতাক হ্রদ
চূড়াচাঁদপুর
মৈরাঙ্
ব্রহ্ম
কৈলাশহর
আগরতলা
ত্রিপুরা
সোনামুরা
বিলোনিয়া
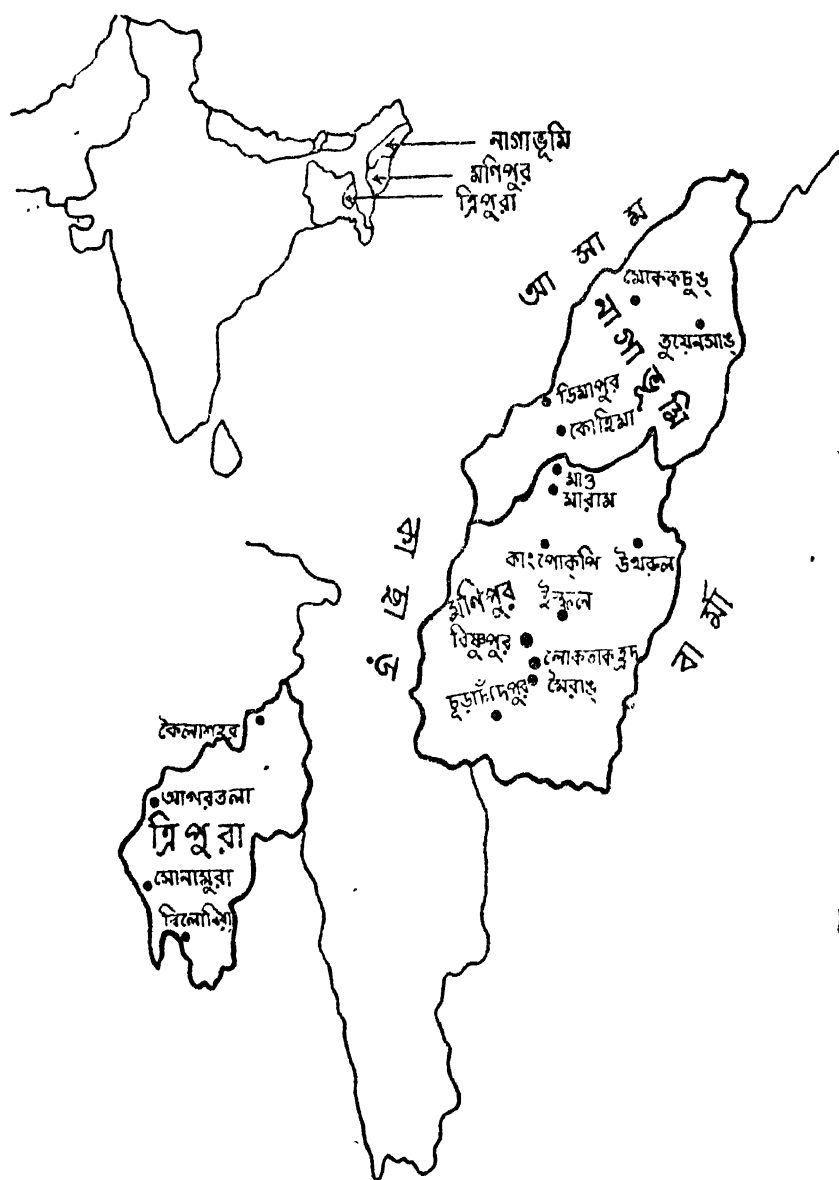
গোবিন্দজীর মন্দির

ইম্ফল (মণিপুর)

রাজপ্রাসাদ ঃ ইম্ফল (মণিপুর

মৃদঙ্গ-নৃত্য (সংকীর্তন) ঃ মণিপুর

গোষ্ঠলীলায় কৃষ্ণ ও বলরাম (মণিপুর)

রথযাত্রা উৎসব : রাজপ্রাসাদ, মণিপুর

হোলি-উৎসব : গোবিন্দজীর
মন্দির-প্রাঙ্গণ, মণিপুর

রাসলীলায় গোপী

বিষ্ণু মন্দিব : বিষ্ণুপুর (মণিপুর)

লাই-হারোবা : নৃত্যরতা
মাইবী ও পল্লী-রমণী
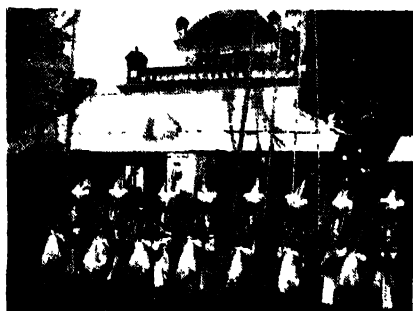
লাই-হারোবা নৃত্য :
থাংজিং মন্দির-প্রাঙ্গণ, মণিপুর

নৃত্যরতা মণিপুরী মাইবী

নৌকা-বিহার : লোকতাক হ্রদ, মণিপুর

মাছ-ধরা : লোকতাক হ্রদ, মণিপুর

নাগাদের একজন : সুসজ্জিত

নাগা মেয়েরা : পিঠে বাঁশের পাত্রে

নাগা পরিবার

ছু'টি সেমা (নাগা) তরুণী

নাগাভূমির একটি গীর্জা

সিমেট্রি, কোহিমা
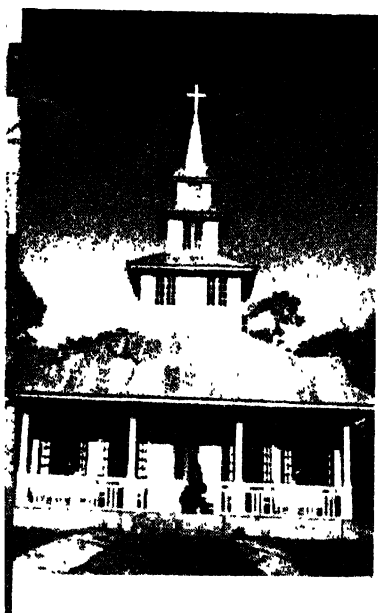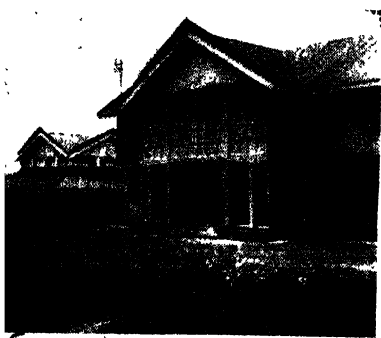
াগা ইন্‌স্টিট্যুট্‌ অব্‌ কাল্‌চার, কোহিমা
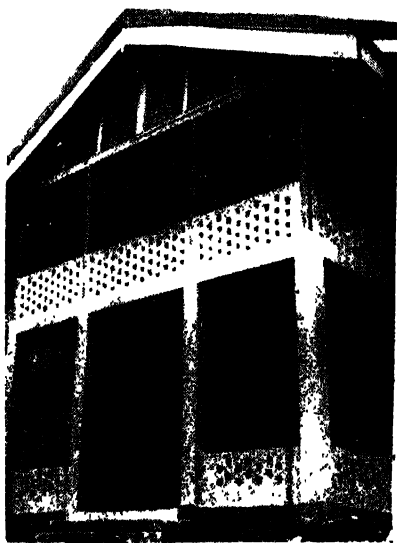
ষ্টেট্‌ মিউজিয়ামের একাংশ, কোহিমা

উৎসব-সাজে নাগারা

নাগা-নৃত্য

পাহাড়ের চূড়ায় নাগা-গ্রাম

নাগা লোকনৃত্য

নাগা মোরাঙ্
(দলবদ্ধ অবিবাহিতদের আবাস)

নাগাদের একজন : ঝুড়ি-গড়ায় ব্যস্ত ; পেছনে—গাছের গুঁড়ি-কেটে-গড়া দামামা

একটি খরস্রোতা : নাগাভূমি

পীস-সেন্টার, কোহিমা : বাঁ দিক থেকে :—মিস্ মহান্তি, লেখক, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, মিসেস্ মিনতি আরাম, সুধার সাহা, ডঃ আরাম ও মিঃ আদ্দু

উপরে---ত্রিপুরী নৃত্য

নীচে---ডম্বুর জলপ্রপাত : ত্রিপুরা—পাশে দু'টি ত্রিপুরা মেয়ে
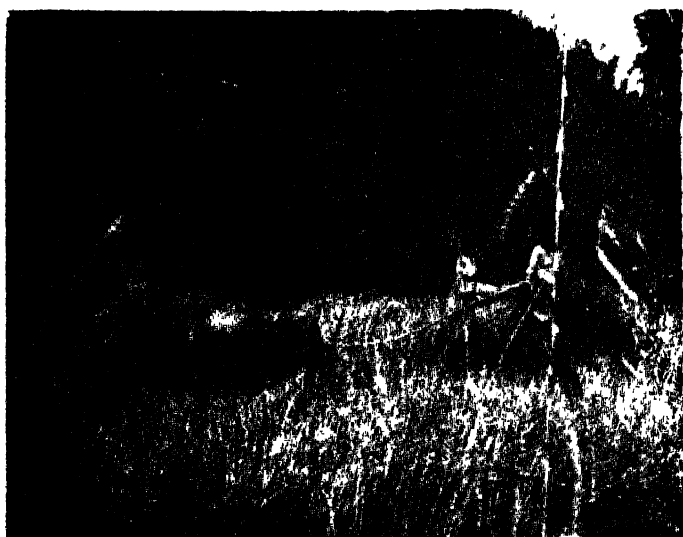
বুনো-হাতি ধরা ঃ ত্রিপুরা

ত্রিপুরার হাট ঃ কেনাকাটা চলছে
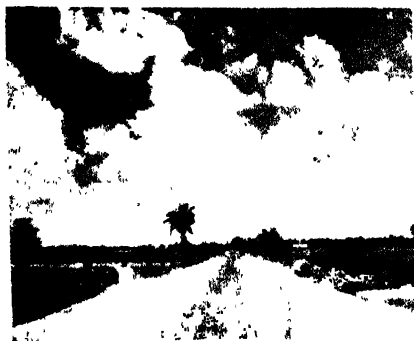
আসাম-আগরতলা রোড ঃ ত্রিপুরা

উখরুল (মণিপুর)

মাও-নাগা নৃত্য ঃ মাও (মণিপুর
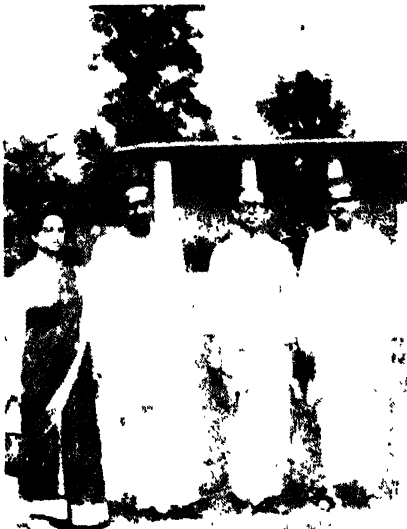
ওয়ার সিমেট্রি ঃ ইম্ফল (মণিপুর)
বাঁ দিক থেকে ঃ—অঞ্জলি ভট্টাচার্য, লেখক, নীলকান্ত সিং ও গোপাল ভট্টাচার্য

ইম্ফলে নীলকান্ত সিং-এর বাড়িতে অঞ্জলি ভট্টাচার্য ও মিসেস নীলকান্ত

মহারাজা বীর-বিক্রম কলেজ
আগরতলা (ত্রিপুরা)

বুদ্ধ-মন্দির : আগরতলা

রাজপ্রাসাদ : আগরতলা (ত্রিপুরা

আমার বেশির ভাগ বন্ধুই সুবুদ্ধিপরায়ণ। তবে দু'একজন আছেন যাঁরা দুর্বুদ্ধির অনলে নিজেরাও জ্বললেন, আমাকেও জ্বালালেন।

সুনীল ঘোষ এই শেষোক্ত দলের।

সম্প্রতি হিমালয়ের কিছু ছবি এঁকে বাইরে প্রভূত সুনাম এবং ঘরে প্রচুর বদনাম কিনেছেন তিনি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-অর্জনের নাম করে যে পরিমাণ টাকা তিনি নগাধিরাজ-চরণে উৎসর্গ করেছেন আমার সুবুদ্ধিপরায়ণ বন্ধুরা সে টাকার ছিটেফোঁটা পেলেও গৃহিণীর জন্যে জড়োয়া গয়না এবং খানদানী বেনারসী কিনে পৌরুষের পরাকাষ্ঠা দেখাতেন।

এই সুনীল ঘোষ সেদিন আবার এলেন; এবং এসেই তাঁর দুর্বুদ্ধির ঝাঁপিটি যথারীতি খুললেন,—খবর শুনেছেন ?

অবাক হয়ে বললুম,—কোন্ খবর ?

—মণিপুরের।

—কেন ? কী হয়েছে ?

—না, হয়নি কিছু।

—তবে ?

—শুনলুম, এ-বছর মণিপুরী রাস খুব নাকি জমবে। রাস দেখতে ত্রিপুরীরাই শুধু নয়, হাজার হাজার নাগাও আসবে ইম্ফলে।

—আসুক না! কী করবো তাই বলে ?

—কিছুই করবো না। শুধু যাবো একবার।

—যাবেন ?

—হ্যাঁ। মণিপুরে তো বটেই; ত্রিপুরা এবং নাগাল্যাণ্ডেও।

—অর্থাৎ, হিমালয়-ভ্রমণে আবার ?

—ঠিক হিমালয়ে নয়, তার তিন সঙ্গী ভ্রমণে।

—তিন সঙ্গী ?

—ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড।

বাস। সেদিন এই পর্যন্ত। টোপটি ফেলে স্থনীল ঘোষ সরে পড়লেন। আর আমি তাঁরই দেওয়া আমার ঘরে টাঙানো হিমালয়ের ছবিটির দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলাম। হিমালয়ের এইরকম সঙ্গী আরও কত আছে, রীতিমত গবেষণা শুরু করলাম তা নিয়ে।

শেষ অবধি অনেক সঙ্গীর হদিস মিলল; কিন্তু বন্ধুবরের ফেলা 'টোপ'-এর গুণে 'তিন সঙ্গী' ত্রিপুরা, মণিপুর ও নাগাল্যাণ্ডের কথা ভোলা গেল না কিছুতেই। এদিকে বর্ষা পেরিয়ে শরৎ এল। মণিপুরের কুঞ্জরাস-উৎসব পেরিয়ে গেল দেখতে দেখতে। তা যাক। ঠিক করলুম, এবার এই ১৩৭৭-এর পূজোর ছুটিতে 'সঙ্গী'দের দেখে আসি। স্থনীল ঘোষকে সঙ্গে নিয়েই যাই।

কিন্তু স্থনীল শেষ মুহূর্তে বেঁকে দাঁড়ালেন। কুলু-মানালী হয়ে রোহ্‌টাং যাবেন, ছবি আঁকবেন গিরিসংকটে বসে, এই অজুহাতে হিমালয়ের ভিন্নপথ ধরলেন।

নিরুপায় হয়ে 'তিন সঙ্গী'র স্বপ্নটিকে আমি একাই আঁকড়ে ধরলাম। স্ত্রী অঞ্জলিকে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়লাম ত্রিপুরার পথে।

কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয় ত্রিপুরা। আকাশ-পথে শ ছ'য়েক মাইল। কিন্তু স্থলপথে ফরাক্কা, গৌহাটি, লামডিং এবং ধর্মনগর হয়ে গেলে দূরত্ব দাঁড়ায় এর ৭ গুণ, সময় লাগে ৭০ গুণ এবং পরিশ্রম হয় ৭০০ গুণ। এছাড়া খরচ-খরচার দিক দিয়েও সাশ্রয় হয় না কিছু। বরং স্থলপথের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকেও যে পরিমাণ গাঁটের কড়ি খরচ করতে হয়, বিমানের যাত্রীদের তুলনায় তা বেশি।

তাই শেষ অবধি কোনোরকম দ্বিরুক্তি না করেই বিমানে ত্রিপুরা

যাওয়া ঠিক করলাম। বিজয়া দশমীর দিন ভোরবেলা দমদম থেকে উড়লাম আকাশে।

হোক শরৎকাল, সেদিন আকাশ প্রসন্ন ছিল না তেমন। খণ্ড খণ্ড ঘন কালো মেঘ তার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।

সেই মেঘ পেরিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটলাম আমরা। ভারত পেরিয়ে পাকিস্তানের (এখনকার বাংলাদেশের) আকাশ ধরে এগোলাম।

দেখতে দেখতে মেঘ কেটে গেল। আকাশ পরিষ্কার হল। ঊর্ধ্বে, আশে-পাশে গাঢ়-নীল একখানি চাঁদোয়া যেন ঘিরে ধরল আমাদের।

প্রায় পৌঁছে গেছি। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা বেশি দূর নয় এখান থেকে। আমাদের বিমানখানি ঠিক সময়ে যদি যায় তো বড় জোর কুড়ি মিনিটের পথ।

কিন্তু যাবে কি ? পথ কি ফুরোবে ?

বিমানের মতিগতি খারাপ। এতক্ষণ বাম্প করতে করতে এগোচ্ছিল। আকাশ মেঘলা ছিল বলেই থেকে থেকে যেন ওপর-নীচে দোল খাচ্ছিল।

এবারে দোলন কিছুটা কমল। মেঘ কেটে যেতেই নীচে—অনেক নীচে স্পষ্ট চোখে পড়ল পদ্মা।

—হ্যাখছেন নি ?—আমার ঠিক পাশেই সহযাত্রীটি মন্তব্য করলেন,—পদ্মা হ্যাখছেন ?

বললুম,—হ্যাঁ। একবার নয়, অনেকবার।

—পাকিস্তানে হ্যাশ বুঝি ?

—হুঁ।

—কুন্‌খানে ?

—কুমিল্লায়।

—তইলে (তবে) হাচাহাচাই (সত্যিসত্যি) হ্যাখছেন তাইনরে (পদ্মাকে)। ইস্টিমারে চাইপ্যা (চেপে) চাঁন্দ্‌পুর থেইক্যা (থেকে) গোয়ালনন্দ গেছেন ?

—তা গেছি। গোয়ালনন্দের ইলিশের স্বাদ ভুলতে পারি নি আজও।

—কে ভুলছে? আমি? হায় কপাল!...

গোয়ালনন্দের ইলিশ আর বাউনবইড়ার মাডা (ঘোল)

যে ভুলে, হে্রে (তাকে) কয় পাডা (পাঁঠা)।

—আপনার দেশও বুঝি ওদিকেই?

—হ মশয়, হ। বুঝলেন না অতক্ষণে?

—কোথায় দেশ আপনার?

—বাউনবইড়া। যিখানের (যেখানকার) মাডা (ঘোল) একবার খাইলে (খেলে) কইল্‌জা (কলিজা) ঠাণ্ডা অক্করে (একেবারে)।

সায় দিলাম সঙ্গে সঙ্গে,—যা' বলেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাঠা আমিও খেয়েছি কয়েকবার।

—খাইছেন ত? সহযাত্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, খাইলে বোঝবেন, মাডার রঙ্‌ আর ওই যে দূরে ছাখতাছেন কীর্তিনাশা পদ্মারে, তেনার রঙ্‌ একঐ।

কথার অবসরে পদ্মার দিকে তাকালাম একবার। অপরূপ—আশ্চর্য এক দৃশ্য চোখে পড়ল। মনে হল, নীচের ঘন সবুজ গালিচার মাঝখানে কে যেন এক ফালি গৈরিক উত্তরীয় বিছিয়ে দিয়েছে। সরস-সতেজ কৃষিভূমির উপর রসবতী মমতাময়ীর আসনটি পেতে দিয়েছে কে যেন।

—হাঁ, পদ্মা মমতাময়ী,—লোকে বলে,—আবার এই পদ্মাই ভৈরবী-ভয়ঙ্করী কীর্তিনাশা। মর্জি বিগড়োল তো সাক্ষাৎ রাক্ষসী সে, উগ্রচণ্ডী সর্বনাশী। রাজা-উজীর, চাষী-মজ্‌দুর, মঞ্জিল-মক্তব গিলে গিলে ভীষণা।

তবে এখন যে পদ্মাকে দেখছি, মনে হয়, আদৌ ভীষণা নয় সে; মমতাময়ী বরং। তার বুকে, আশে-পাশে জীবনের মিছিল। নৌকো

ভাসছে যত্রতত্র। মাছ ধরছে বোধ হয় জেলেরা।...পদ্মার দু'পাশে কত শত ঘর!...গাছ-গাছালির ভিড়ে সব চোখে পড়ছে না। ঠিক।... মনে হচ্ছে, মহীরুহদের সমারোহে পদ্মার দু'টি পাশই ঈষৎ কালো। ...ওদিকে আবার চর চোখে পড়ছে নদীর বুকে; গাছপালাবিহীন, বালুকাধূসর, নিঃসঙ্গ এক এক ফালি মরুভূমির মতো যেন।

—দেখলেন? এতক্ষণে প্রায় ছাড়িয়ে এসেছি পদ্মাকে। সহযাত্রীটিও শুরু করছেন,—পদ্মারে আচমকা দেখলে বাউনবইড়ার মাডার কথা মনে অয় (হয়) না?

বললাম,—হাঁ, হয়। আরও অনেক কথাই মনে হয়।

—হ, কইছেন।—সহযাত্রী খুব খুশি এবার।

এদিকে আমিও খুশি হয়ে উঠি দেখতে দেখতে। সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ জমাই।

ভদ্রলোকের নাম কালাচাঁদ দত্ত। আগরতলায় থাকেন। কাজ করেন কী একটা সরকারী অফিসে।

—আচ্ছা কালাচাঁদবাবু,—একবার শুধালাম,—পাকিস্তানে আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?

—আছে! সরাসরি জবাব দেন কালাচাঁদবাবু,—খুব আছে।

—দেখা-সাক্ষাৎ হয়?

—হয়।

—কী করে? ভিসা-পাশপোর্ট তো সব বন্ধ!

—আরে দূর মশয়, পাশপোর্ট! কামালউদ্দিন মিঞারে কে আটকায়?

—কামালউদ্দিন? কে তিনি?

—আমার বন্ধু মশয়। এক লগে বাউনবইড়ার আনন্দ ইস্কুলে পড়তাম।

—কামালউদ্দিন প্রায়ই আসেন বুঝি?

—হ, আইয়ে (আসে)। বর্ডার দিয়া স্নুরুৎ কইরা (করে)

গইল্যা (গলে) যায়। এই ত, হেইদিনও (সেদিনও) আইছিল। বাউনবইড়ার মাডা, সফরী কলা আর কিছু মাছ আনছিল লগে (সঙ্গে)।

—আপনি বুঝি বর্ডারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ?

—হ, আছিলাম ; কিছু লেংড়া আম আর শন্-পাপ্ড়ী লইয়া বান্দরের লাখান (বাঁদরের মতো) বইয়া আছিলাম (বসেছিলাম)। কামালউদ্দিন আইল ; মামলত ঠাণ্ডা কইরা (কাজ হাসিল করে) ফিরতও (ফেরত) গেল।

—আপনার আত্মীয়-স্বজনরাও বুঝি এমনি করেই যায়-আসে ?

—আরে দূর মশয় ! আত্মীয় আপনি কা'রে কন ? কামালউদ্দিন কি আমার পর ?

সেদিন কালাচাঁদবাবুর কথার জবাব দিতে পারি নি। অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ওঁর মুখের দিকে।

উনি সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন,—কী মশয়, টাক ধইরা চাইয়া রইছেন (এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন) দেখি ?

কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম এবার। এমন সময় এয়ার-হোস্টেস্ ব্রেক-ফাস্ট্ দিয়ে গেল।

কালাচাঁদবাবু ফোড়ন কাটলেন,—দিদিমণিগ এই মুচকি হাসি আর পুচকি খানায় আমার মশয় প্যাট (পেট) ভরে না।

বললুম,—কেন মশাই। ব্রেক-ফাস্ট্ তো ভালই দিয়েছে। আপেল, কলা, স্যাণ্ডউইচ্……কালাচাঁদবাবু বাধা দিলেন,—রাখেন মশয় সেণ্ডউইচ্। বিলাতী কায়দা ছাড়েন। বাউনবইড়ার মাডার লগে সফরী কলা আর মুড়ির ব্রেক-ফাস্ট্ খাইছেন ? বলতে যাচ্ছিলাম,— হ্যাঁ, খেয়েছি। কিন্তু তার আগেই বাধা পড়ল। কালাচাঁদবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন,—ওই যে, দ্যাখেন। নিচে আপনেগ কুমিল্লা।

দেখলাম। অবাক বিস্ময়ে তাকালাম জন্মভূমি কুমিল্লার দিকে।

সব বোঝা গেল না ঠিক। তবে শহর কুমিল্লার অতিকায়

দীঘিগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ল। দেখলাম,—ধর্মসাগর, নান্নুয়ার দীঘি, রাণীর দীঘি।

খুব ছোটবেলার কথা মনে এলো—

রাণীর দীঘির পাড়ে ভিক্টোরিয়া কলেজ। দাদা ঐ কলেজে পড়ত। আমি কতদিন হেঁটে হেঁটে যেতাম 'দাদার কলেজ' দেখতে। ভেতরে যেতাম না কখনও, সাহস হ'ত না; দূরে দাঁড়িয়ে দেখতাম। ...আর একদিন। নান্নুয়ার দীঘি এপার-ওপার করল দাদা। আমি দীঘির তীর ধরে প্রচণ্ড উৎসাহে ছুটলাম। দাদাকে তালিম দিলাম।

সেই দীঘিগুলো কত কাছে এখন! আবার কত দূরে!...যেতে চাইলেও যাওয়া যাবে না আর। ভিসা-পাশপোর্ট মিলবে না। দেশভাগ হয়েছে। এক দেশ কেটে দুই হয়েছে। আমার স্বদেশ এখন আমারই কাছে বিদেশ।

—কী মশয়? আবার যে টাক ধইরা (এক দৃষ্টিতে) চাইয়া রইলেন?—কালাচাঁদবাবু তাড়া দেন হঠাৎ,—ব্রেক-ফাস্ট্ খাইবেন না?

বললাম—হ্যাঁ, খাবো।

এদিকে ব্রেক-ফাস্ট্ খেতে না খেতেই বিমানে লাল আলো জ্বলল। 'যাত্রীরা সব কোমরে বেল্ট্ বাঁধন'—নির্দেশ এলো।

বুঝলাম, আগরতলা আর দূরে নয়। 'ল্যাণ্ডিং'-এর তোড়জোড় চলছে।

আটটা নাগাদ 'ল্যাণ্ডিং'। সিটি অফিসে পৌঁছুতে বেলা প্রায় ন'টা।

'এয়ার ওয়েজ'-এর গাড়িতে চেপেই 'সিটি'র দিকে চললাম।

অনেকটা পথ। প্রায় আট মাইল। যেতে যেতে ত্রিপুরার ঢেউ-খেলানো প্রান্তর চোখে পড়ে।

দেখি, লাল মাটি চারিদিকে। এখানে-সেখানে 'টিলা' অর্থাৎ খুদে পাহাড়।

ঐ 'টিলা'দের গা-ঘেঁষে চলি কখনও। কখনও চলি প্রায়-সমতল পথ ধরে। চলতে কষ্ট নেই। পীচঢালা বাঁধানো পথ ; এঁকেবেঁকে চললো, রাজধানী আগরতলার দিকে।

আগরতলা শহরটি ছড়ানো, খোলামেলা। কেমন একটা গ্রাম-গ্রাম ভাব আছে তার যত্রতত্র—সিটি অফিসে যাবার পথে লক্ষ্য করলাম

এদিকে অফিস পৌঁছে দারুণ ব্যস্ত কালাচাঁদবাবু। তাড়াতাড়ি একটা রিক্সা ডেকে এনে বললেন,—আইচ্ছা, আয়ি তইলে (আসি তবে)।

বললাম,—হ্যাঁ, আসুন। আবার দেখা হবে।

কালাচাঁদবাবু বললেন,—হ, অইব (হবে)। আমার বাড়িতে আইয়েন (বাড়িতে আসবেন), অইব। আইতে (আসতে) দুঃখ নাই, মটর স্টেণ্ড্ রুড্-এ (মোটর স্ট্যাণ্ড্ রোড্-এ) কারোরে (কাউকে) জিগাইয়েন (শুধোবেন), মানকচু মুইখ্যা (মানকচু মুখী) কালাচান্দের বাড়ি— ; দেইখ্‌থেন (দেখবেন), সুজা (সোজা) অক্করে (একেবারে) বাড়ি দেখাইয়া দিব।

শুধালাম,—মানকচু মুইখ্যা ? মানে ?

—বুঝলেন না ?—হেসে আকুল কালাচাঁদবাবু,—আমার বাড়ির সামনে মানকচুর বাগান আছে। বাউনবইড়ার কচু মশয়। রাজাকচু। কামালউদ্দিন মিঞা দিছিল (দিয়েছিল)। হেশে (শেষে)—

আরও কত কী যেন বলছিলেন কালাচাঁদবাবু। কিন্তু তার শেষের কথাগুলো শোনা গেল না। রিক্সা চলতে শুরু করায় শহরের কোলাহলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এদিকে আমাদেরও হারিয়ে যাবার দাখিল।

যাবো কলেজ-টিলা। উঠবো বি. টি. কলেজের অধ্যক্ষ আমার

ছোটমামা গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কোয়ার্টারে। কিন্তু চিনি না কিছুই। সিটি অফিসেও কেউ আসেন নি।

অগত্যা রিক্সাই ভরসা। চালককে বললাম,—কলেজ-টিলা।

সে তৈরি হয়ে ছিল। নির্দেশ পেতেই মালপত্তরগুলো উঠিয়ে গাড়ি ছাড়ল।

ক্রীং ক্রীং! ক্রীং ক্রীং—

সাইকেল-রিক্সা এগিয়ে চলল দ্রুত। আগরতলার রাজপথ ধরে ছুটল।

পথ কর্মব্যস্ত। গাড়িঘোড়া নেই তেমন; কিন্তু মানুষ শত শত।

পথের দু'ধারে সারি-বাঁধা দোকান। সাদা-রঙের একতলা বাড়ি ওগুলো। সব একরকম দেখতে।

প্রতিটি বাড়ির সামনেই বারান্দা আছে এককালি। আর আছে সারি সারি স্তম্ভ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সব বুঝি পরিকল্পনামাফিক গড়ে উঠেছে।

পরিকল্পনার কথাটা কিন্তু ঠিক। শুনেছি, ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য রাজধানীকে মনের মতো করে গড়তে চেয়েছিলেন। অন্ততঃ চৌমোহনী এলাকার দোকানপাটগুলো দেখতে একরকম হোক, শ্রী-ছাঁদ থাক ওদের মধ্যে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছে।

মহারাজার ইচ্ছে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। ষোল আনার মধ্যে চার আনা হলেও সফল হয়েছে,—সেদিন আগরতলার পথ ধরে যেতে যেতে মনে হল।

কিন্তু পথ কতটুকু আর! চৌমোহনী কত আর বড়!

দেখতে না দেখতেই রাজপথ পেরিয়ে সরু একটি শাখাপথ ধরল রিক্সা। উত্তর দিক বরাবর এগোল।

এবারে পথ নিরিবিলি। রিক্সা কদাচিৎ চোখে পড়ছে। পথচারীর সংখ্যাও কমে আসছে ক্রমেই।

পথের দু'ধারে ঘরবাড়িগুলো ছাড়া-ছাড়া। বেশির ভাগই ফলবাগিচা আর ঝোপ-ঝাড়ে আচ্ছন্ন।

ঝোপগুলো জায়গায় জায়গায় খবরদারি করছে যেন। পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। রিক্সাওয়ালার পছন্দ নয় এসব। ফাঁকা রাস্তায় বারবার ক্রীং ক্রীং করে আশে-পাশের ঝোপগুলোকেই যেন সে সরতে বলছে।

সেদিন খানিকদূর অবধি চলল এই রকম। রিক্সা তারপর এসে একটা চড়াইয়ের সামনে দাঁড়াল।

বেশি উঁচু নয় চড়াইটা। বড় জোর ফুট চল্লিশেক।

রিক্সাওয়ালা বললে, কলেজ-টিলার এইখান থেকেই শুরু। পথটা খাড়া বলে এইখানে আমাদের একটু নামতে হবে।

নামলাম। রিক্সাওয়ালা মালপত্তরসমেত যানটিকে টেনে টেনে ওপরে তুলল।

ওপরে উঠে সামান্য আর একটু পথ; পীচঢালা বাঁধানো। তারপরেই বি. টি. কলেজ।

কলেজ-কোয়ার্টারে পৌঁছুবার মিনিট কয়েক বাদেই ছোটমামা গোপালবাবু এলেন। আমাদের পেয়ে উৎসাহে আনন্দে মেতে উঠলেন একেবারে। আগরতলায় একলা থাকেন তিনি। বলতে গেলে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। কিন্তু উৎসাহে ঘাটতি নেই তবু; প্রিয়জনকে পেয়ে ঠিক গৃহীর মতই আত্মহারা।

বললাম,- চিঠি দিয়েছিলাম। পান নি?

গোপালবাবু অবাক;—দিয়েছিলে বুঝি? কই! না, পাইনি তো!

—টেলিগ্রাম?

- না, পাইনি।

—আশ্চর্য।

গোপালবাবু সায় দিলেন সঙ্গে সঙ্গে,—আশ্চর্য! এখানকার

পোস্ট্-অফিস এইরকম। একটি জিনিস ঠিক সময়ে দেয় না। দেবে কাজ শেষ হলে। অথচ কলেজ-টিলার ওপরেই অফিস!

কথাটা ঠিক। অধ্যক্ষের কোয়ার্টার থেকে পোস্ট্-অফিসটি স্পষ্ট চোখে পড়ে। তার একপাশে কাঁচা সড়ক। এঁকেবেঁকে চলে গেছে আগরতলার প্রতিবেশী-পল্লী যোগেন্দ্রনগরের দিকে।

যোগেন্দ্রনগরের বেশির ভাগই কলেজ-টিলার চেয়ে বেশি উঁচুতে। তাই কলেজ-এলাকা থেকে ও অঞ্চলটাকে স্পষ্ট পাহাড়ীয়া মনে হয়।

অথচ ঠিক পাহাড় নয়, প্রায়-পাহাড। উঁচু ঢিবির মতো অনেকটা।

কলেজ-টিলাও ঠিক তাই।

আগরতলা এম. বি বি. কলেজ, বি. টি. কলেজ, হস্টেল, খেলার মাঠ—সব এই টিলার ওপর।

বি. টি. কলেজের অধ্যক্ষের কোয়ার্টারটি টিলার একপ্রান্তে। তার একদিকে বেশ খানিকটা নীচে এক হ্রদ। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন স্তম্ভিত হংসবলাকার মতো পুব-পশ্চিম-বরাবর পাখা মেলল। প্রশস্ত হয়ে উঠে ছড়িয়ে পড়ল টিলা-এলাকার অনেকটা দূর অবধি।

কোয়ার্টারের অন্যদিকে দেয়ালের বাইরে সেই কাঁচা সড়কটা; যা নাকি পোস্ট্-অফিসের গা-ছুঁয়ে যোগেন্দ্রনগরের দিকে গেল।

—যাবে নাকি ওদিকে?—আগরতলা পৌঁছুবার পরদিনই সাত-সকালে তাল তুললেন গোপালবাবু,—যোগেন্দ্রনগর যাবে?

বললাম,—বেশ, চলুন।

চললাম। পায়ে হেঁটেই।

উঁচুনীচু এবড়ো-খেবড়ো পথ। বাঁক ফিরতে ফিরতে শহরতলীর দিকে গেছে।

পথের দু'ধারে ছাড়া ছাড়া একটা দু'টো ঘরবাড়ি আর জলজঙ্গল। নানা জাতের গাছ এখানে-সেখানে। আমবাগান কোথাও, কোথাও বাঁশঝাড়। ঠিক সামনেই কলাগাছের ঝোপ থেকে একটি গোসাপ ছুটে গেল। অদূরে অসংখ্য সুপুরি গাছ। অরণ্য-সভায় ঝাণ্ডা উঁচিয়ে যেন।

গোপালবাবু গল্প শুরু করলেন—এসব জায়গায় পনের-বিশ বছর আগেও হাতি আসতো; বুনো হাতি। সন্ধ্যে হলেই টিন বাজাত এদিককার লোকেরা। আগুন জ্বেলে, হৈ-হুল্লোড় করে জানোয়ারদের খেদাত।

শুধালাম,—আজকাল আর মহাপ্রভুরা আসেন না?

গোপালবাবু জবাব দিলেন,—না, আর আসেন না। মানুষের তাড়া খেয়ে সব এখন দূরের জঙ্গলে উদ্বাস্তু।

বললাম,—তাড়া মানে তো পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষ-উদ্বাস্তুদের লাঠি-ঝাটা?

গোপালবাবু সায় দিলেন,—হ্যাঁ, অনেকটা তাই। দেশ ভাগ হবার পর উদ্বাস্তুরা সব এল। এদিককার বনজঙ্গল কেটে বসত গড়ল। আর বনের যারা বাসিন্দা তারা হয় প্রাণভয়ে ছুটে পালাল, আর না হয় পালাতে গিয়ে মরল।

—অবিশ্যি শুধুমাত্র উদ্বাস্তুরাই যে ওদের উৎখাত করেছে, তা নয়;—একটু থেমে আবার শুরু করলেন গোপালবাবু,—ওস্তাদ শিকারীদেরও বহুদিন থেকেই নজর ছিল ওদের দিকে। এমনকি শোনা যায়, একবার এক শিকারী ওদের একটিকে ঘায়েল করতে গিয়ে নিজেই নাকি শিকার হয়েছিলেন।

শুধালাম,—নিজে শিকার হয়েছিলেন? কী রকম?

গোপালবাবু বললেন,—রকম-সকম সব কি ছাই জানি! তবে শুনেছি অনেক কিছু।

—কী শুনেছেন?

—শিকারীটি খুব নাকি ওস্তাদ ছিলেন। সামচী-ভুটানে, আসামে আর নেপালের তরাই-এ অনেকগুলো জংলী হাতিকে বাগে এনেছিলেন নাকি।···ঘুরতে ঘুরতে একবার এখানে এলেন ভদ্রলোক। ত্রিপুরার মহারাজার অতিথি হয়ে এলেন। এই যোগেন্দ্রনগরে জংলী হাতির খুব উৎপাত চলছে তখন। বিশেষ করে একটা মাদা হাতি সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।···মহারাজা বললেন,—দেওদার সিং! (হ্যা, বলতে ভুলে গেছি, শিকারীকে এই নামেই সবাই জানত) তুমি একটু না দেখলে তো আর চলে না। জংলা হাতি কবে রাজবাড়িতে ঢুকবে!···দেওদার সিং বললেন,—হাতি কোথায় জনাব। ও তো বাচ্চী লড়কী। কলা-বাগিচার নিশানা পেয়ে বেহুঁস হল। বদমাসী শুরু করল্‌ খামোখা।··· মহারাজা বললেন,—ও যে বাচ্চা হাতি, তা তুমি কেমন করে জানলে? দেওদার সিং বললেন,—কেমন করে আবার। ওর খুব-সুরতী পায়ের দাগ দেখে। দাগ আমি আগেই দেখে নিলম হুজুর। এখানকার লোক এসে আমাকে বলতে নিজে গিয়ে সব কুছ্‌ সমঝে নিলম। মহারাজা বললেন,—বেশ! কাজে লেগে যাও তবে। বাচ্চাকে সাচ্চার মত একটি শিক্ষা দাও। আমি লোকজন দিচ্ছি।··· দেওদার সিং বললে,—হুজুর! ঘাবড়াইয়ে মৎ! লোকজনের কুছ্‌ জরুরৎ নেহি। আমি একেলা ওকে শায়েস্তা করবে।···মহারাজা দেওদার সিং-এর কথা শুনে অবাক,—বলো কী! একেলা?··· দেওদার সিং আবার বললেন, জী হুজুর।···যেমন কথা তেমন কাজ। দেওদার সিং বন্দুক কাঁধে নিয়ে এখানে এলেন। ওৎ পেতে বসে রইলেন শিকারের সন্ধানে। কিন্তু শিকার আর আসে না। দিন যায়, সন্ধ্যে হয়, রাত গড়ায়; বাচ্চী লড়কীর সঙ্গে দেওদারজীর মোলাকাত হয় না আর।···অবশেষে তিন দিনের দিন সন্ধ্যেবেলা ভদ্রলোক অবাক। হঠাৎ দেখেন কালোমত একটা পাহাড় যেন, দাঁত উঁচিয়ে তার দিকে তেড়ে আসছে।···কিন্তু এ তো সেই বাচ্চী লড়কী নয়!

জোয়ান-জবরদস্ত জল্লাদ বরং—দেওদার সিং স্তম্ভিত হলেন প্রথমটায়। কিন্তু পর-মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বন্দুকের ট্রিগার টিপলেন। প্রথম গুলিটা জল্লাদের মাথায় লাগল। দ্বিতীয়টা লাগল পায়ে। কিন্তু তবু দমল না সে। বীর-বিক্রমে এগোতে লাগল।…এবারে মরিয়া হয়ে আর একটা গুলি ছুঁড়লেন দেওদার সিং; এবং এতেই কাজ হল। গুলিটা গিয়ে বুকে লাগতেই ও পড়ে গেল।…সব শুনে মহারাজা খুব খুশি। অথচ দেওদার সিং এর চোখে ঘুম নেই। বারবার তিনি একই কথা বলেন,— জল্লাদ খতম, লেকিন উনকা দোস্ত বাচ্চী আছে। বদলা নেবার ফিকির খুঁজছে ঠিক।…মহারাজা বললেন,—তবে হুঁসিয়ার!…দেওদার সিং সেই একই জবাব দিলেন, —ঘাবড়াইয়ে মৎ! আসলে মহারাজা ঘাবড়ান নি; ঘাবড়েছিলেন বরং দেওদার সিং,—আমার জীপ-ড্রাইভার দ্বিজেন্দ্রর কাছ থেকে শুনেছি। ও তখন রাজবাড়িতে কাজ করত।…হ্যাঁ, যা বলছিলাম,— একটু থেমে আবার শুরু করেন গোপালবাবু,—হাতিটাকে মারবার পর থেকে দেওদার সিং এদিকে আর একা আসতেন না। অন্য দুই বন্দুকধারী প্রহরী সঙ্গে না নিয়ে ভুলেও ঢুকতেন না জঙ্গলে!…কিন্তু একদিন। ভর সন্ধ্যেবেলা। হঠাৎ কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল! প্রহরীদের মাঝখান থেকে ছোঁ মেরে কে যেন উঠিয়ে নিল দেওদার সিংকে।…কেউ বাধা দিতে পারল না। কেউ টেরও পেল না, কোথায় গেল দেওদারজী।…অবশেষে টের পাওয়া গেল পরদিন দুপুর বেলা। …থলেতে করে লোক কিমা আনে যেমন করে, হুবহু ঠিক তেমন করেই ওর থেঁতলে এবং গুঁড়িয়ে যাওয়া দেহটা বস্তায় পুরে রাজ-বাড়িতে আনা হল।…মহারাজা নাকি কেঁদে ফেলেছিলেন সেদিন। চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিলেন, বাচ্চী লড়কী বদলা নিল।

—এই যোগেন্দ্রনগরে। বুঝলে?—গল্প শেষ করার মুহূর্তে এক কুঁড়েঘরের ধার দিয়ে যেতে যেতে গোপালবাবু বললেন,—এখানেই এত বড় কাণ্ড ঘটেছিল একদিন।

কুঁড়েঘরে কিসের যেন ফিসফিসিনি চলছে তখন। আশে-পাশের লোকজনের কথা শুনে মনে হচ্ছে, কেউ মারা গেছে।

—আহা! বুইড়া (বুড়ো) জবর (খুব) ভালা মানুষ আছিল;—কে যেন বলল।

—বাপ মরল যখন, বুইড়া তখন আমারে এক কুড়ি সফ্‌রী (মর্তমান) কলা দিছিল,—সায় দিল আর একজন।

এদিকে একটি কিশোরী এগিয়ে গিয়ে বলল,—তেনার বাগান থিক্যা (থেকে) কুল-বড়ই পাড়ছি কত! কিছু কন নাই।

—কইব ক্যান্‌?—কে যেন জবাব দিল,—বুইড়া কি আর আমাগো মত কিপ্‌টা (কৃপণ) আছিল! তবে হ…

আরও কত কী যেন বলছিল সে। কিন্তু তার শেষের কথাগুলো শোনা গেল না। আমরা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছি। ছোট্ট এক ডোবার গা-ঘেঁষে চলছি। ওখানে বাসন মাজছিল দু'টি বৌ। বুড়োকে নিয়েই কথাবার্তা বলছিল।

—কী অইছিল বুইড়ার? - ওদের একজন বললে,—টুক কইরা মইরা গেলগা দেখি?

—মরত না?—জবাব দিল অন্যজন,—চাইর (চার) কুড়ি বয়েস অইছিল তেনার। অখন-তখন বুক ধড়ফড় করত!

—আমারও যে বুকটা ধড়ফড় করে গো! অখন-তখন করে।

—তুমিও একদিন টুক কইরা মইরা যাইবা গা।

—অ্যা!

কথা শুনতে শুনতে এগিয়ে যাই। গ্রামের সাদাসিধে মানুষগুলোর সহজ সরল উক্তি মনকে স্পর্শ করে।

এতক্ষণে অনেকটা এগিয়েছি আমরা। যোগেন্দ্রনগর স্কুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। ভোরের মিঠে হাওয়া গায়ে লাগছে এসে। পুব-দিগন্তে সুপুরী-বনের আড়ালে সূর্য উঁকিঝুঁকি মারছে।

গোপালবাবু বললেন,—এবার ফেরা যাক। সাড়ে সাতটা নাগাদ অধ্যাপক সরকার আসবেন।

ফিরে দেখি, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অধ্যাপক এসে গেছেন। প্রতীক্ষা করছেন অধ্যক্ষের জন্যে।

গোপালবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন,—অধ্যাপক কৃষ্ণমোহন সরকার, আমাদের কেমিস্ট্রির হেড্। আর এই হল আমার ভাগ্‌নে। বৌমাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন।

—এসেছেন! বেশ করেছেন!—উল্লসিত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণমোহনবাবু—কিন্তু কী আর দেখবেন এদিকে! 'আহা মরি' কিছু তো নেই।

বললুম,—থাকা-না-থাকা নিয়ে ভাবিনে। কিন্তু আপাততঃ দেখছি যা, শুনছি তার চেয়েও বেশি।

—কী শুনলেন?

—হাতির গল্প শুনছিলুম এতক্ষণ। আগে এসব অঞ্চলে খুব নাকি উৎপাত ছিল ওদের?

—উৎপাত কি মশাই! এটা তখন ওদেরই রাজ্য ছিল। কতবার বেঁচে গিয়েছি ওদের কবল থেকে! একবার তো⋯

গোপালবাবু উসকে দিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই পাটক্ষেতের গল্পটা বলুন।

—বলছি,—কৃষ্ণমোহনবাবু থামলেন একটু। অঞ্জলি এসে বসতেই ওর সঙ্গে পরিচয়ের পালাটা সেরে নিয়ে নতুন করে শুরু করলেন,—একবার তো অল্পের জন্যে প্রাণে বাঁচি মশাই।

শুধালাম,—কেন? পাগলা হাতির তাড়া-টাড়া খেয়েছিলেন?

কৃষ্ণমোহনবাবু বললেন,—তাড়া তো ছেলেখেলা মশাই। পাড়া খেয়েই ঠাণ্ডা হতুম আর একটু হলে। হাতি বাবাজী আমায় পিষে ফেলত!

বললাম,—নেহাৎই বেকায়দায় পড়েছিলেন তবে ? বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছিলেন ?

—বরাত ? বলে বরাত,—কৃষ্ণমোহনবাবু টেনে টেনে দম নিলেন বার ছু'য়েক। যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে এইমাত্র জেগে উঠেছেন, ঠিক এমনি একটা ভাব করে বললেন,—সে কাহিনী বিশ্বাস করবেন না আপনারা। হয়তো বা আজগুবি ভেবে উড়িয়ে দেবেন।

বললাম,—না না, তা কেন। আপনি শুরু করুন।

—অনেকদিন আগেকার কথা। বছর বিশেক হবে,—কৃষ্ণমোহনবাবু শুরু করলেন,—এইসব কোয়ার্টার আর হস্টেল তখনও হয় নি। দরমা দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট ঘরে আমরা থাকতুম। এদিকেই থাকতে হ'ত। কারণ, স্কুলের চাকরি। বনজঙ্গলের মধ্যে দূরে যাবার উপায় নেই। একদিন। সন্ধ্যে হয় হয়। ঘর থেকে সবে বেরিয়েছি। কী একটা কাজে সামনেকার মেঠো পথে পা দিয়েছি সবে। হঠাৎ মনে হল, ঝড় উঠেছে। মাঠের ঠিক পাশেই ঝোপঝাড়গুলো সাজ্যাতিকরকম তুলছে।· কিন্তু এ কেমনতরো ঝড়!—আমার সন্দেহ হল একবার,—ঝোপঝাড় তুলছে, অথচ মাঠে আভাসমাত্রও নেই তার। ব্যাপার কী?—ঠাওর করবো বলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি, একটি লোক, আমার দিকেই বিদ্যুৎবেগে ছুটছে। 'পালান। শীগ্‌গির পালান! হাতি!'—বলেই মুহূর্তের মধ্যে আমাকে পিছনে ফেলে সে এগিয়ে গেল। আমি কী করবো, কোথায় যাবো, কিছুই ঠিক করতে না পেরে দারুণভাবে আঁৎকে উঠলুম। একবার মনে হল, আমার পায়ের দুই পাতায় পেরেক ফুটিয়ে কেউ যেন মাটির সঙ্গে আটকে দিয়েছে; আমি অনেক চেষ্টা করছি পা তুলতে, কিন্তু কিছুতেই পারছি না। পরক্ষণেই আবার ভাবলুম,—যা হবার হবে। একবার শেষ চেষ্টা তো করি। উল্টো দিকে ফিরে পালাই। লোকটি যেদিকে গেল, অগত্যা সেদিকেই ছুটি না-হয়।···ওদিকে ঝোপঝাড়ের দোলন কমে এসেছে। কালো

পাহাড়ের মতো কী যেন একটা বেরিয়ে এসেছে বন থেকে।…আর দেরী করা চলে না। সে আসছে। সাক্ষাৎ মৃত্যু আমার থেকে আধ ফার্লংও দূরে নয়। উর্ধ্বশ্বাসে তো ছুটলুম। কিন্তু যাবো কোথায়! আমার দু'পাশে অনেকদূর অবধি পাটক্ষেত। কোমর-প্রমাণ জল সেখানে। অগত্যা পথ ছেড়ে সোজা ঐ ক্ষেতের মধ্যেই ঢুকলুম। কোমর অবধি জলে ডুবিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়ালুম কোনোমতে। কিন্তু দাঁড়াবার কি জো আছে! আমার ঠিক গা-ঘেঁষে কী যেন একটা ছুটে গেল। মনে হল সাপ।…এদিকে শত শত মশা ঘিরে ধরেছে। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাকমুখ দিয়ে ওরা ঢুকছে। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে আমার। কিন্তু কিছুই করতে পারছি না। সামান্য একটু নড়তে পারছি না পর্যন্ত। কারণ, একটু ভুলচুক হলেই সর্বনাশ। কালাপাহাড় সোজা এসে আমাকে পিষে ফেলবে।…ঐ লোকটি কোথায় গেল? আমি এরকমভাবে আর কতক্ষণ থাকবো?—সেই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে করতে আকাশ-পাতাল ভাবছিলুম; এমন সময় হঠাৎ মনে হল, কয়েক ফুট মাত্র দূরেই সাক্ষাৎ যমদূত। বীরদর্পে এগোচ্ছে। তার চলার দাপটে চারিদিক কেঁপে উঠছে যেন। আমার হৃৎপিণ্ডের ওপরে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। তবে হ্যাঁ, বীরটি পথের ওপর দিয়ে গেল, তাই রক্ষে।…কিন্তু কোথায় গেল?—ভাবতে থাকি।…এদিকে আর ভাবাও যাচ্ছে না যেন। আমার হাত, মুখ, মাথা ক্রমেই যেন ভারী হয়ে উঠছে। পা নাড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে, ভারী কিছু বোঝা ওখানে।… শরীর অবসন্ন হতে লাগল। মনে হল, মৃত্যু অবধারিত। …চোখ বুজলুম। মৃত্যুর চেহারাটা কী রকম, ভাবতে চেষ্টা করলুম একবার। এমন সময় হঠাৎ দূর থেকে, অনেকটা দূর থেকে যেন টিন-পেটানোর আওয়াজ ভেসে এল।…ভাবলুম, যাক! মানুষ টের পেয়েছে তবে। যমদূতকে তাড়া করেছে।…কিছুক্ষণের মধ্যেই সোরগোল চরমে উঠল। টিন-পেটানোর আওয়াজ কাছে এগোতে

লাগল ক্রমেই। শেষকালে আওয়াজটা যখন খুব কাছাকাছি এল, আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠে এলুম। হাতিকে যারা তাড়া করছিল, তাদের সামনে দাঁড়ালুম এসে। ওরা আমাকে দেখে অবাক। আমি মানুষ কী ভূত, তা ঠিক করতেই নাকি সময় লেগেছিল কা'রও কা'রও। কারণ, তখনও আমার চোখে-মুখে সর্বাঙ্গে অজস্র জোঁক ঝুলে আছে।

বললাম,—জোঁক ঝুলে আছে, আগে টের পান নি ?

কৃষ্ণমোহনবাবু বললেন,—কী করে পাবো! জোঁক কামড়ালে তো টের পাওয়া যায় না। আর তাছাড়া, আগেই বলেছি, জায়গাটা আধো-অন্ধকার ছিল।··তবে হ্যাঁ, হাত পা মাথা অস্বাভাবিক রকম ভারী হয়ে উঠছে দেখে কিছু একটা সন্দেহ হয়েছিল বৈকি!

বললাম,—কিন্তু ঐ লোকটি ? শেষ অবধি ওর কী হল ?

—ও বেচারী ছুটতে গিয়েই ভুল করেছিল। বিশেষ করে অতটা পথ. -কৃষ্ণমোহনবাবু বলতে লাগলেন,—হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ও! কাঁধের হাড় ভাঙ্গে।

—তারপর ?

—সারা জীবনের মতো পঙ্গু।

—কী কইলা ? পঙ্গু ? ক্যান্ ? ল্যাংড়া (খোঁড়া) কইতে পার না ? দ্যাশের বাষা (ভাষা) কইলে কি জাইত যায় ?—কোনোরকম ভূমিকা না করেই ঘরে ঢুকলেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। কালো কুচকুচে তাঁর গায়ের রঙ। ঠোঁট দুটো পান খেয়ে খেয়ে ঘোর লাল।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম আমরা। গোপালবাবু ওঁকে বসতে বলে সামনের চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন এবং তারপর আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন,—যাক, ভালোই হল। মেজর শম্ভু সাহার সঙ্গে আলাপ হল তোমাদের। উনি আবার কৃষ্ণমোহনবাবুর শিক্ষক। শিক্ষা-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার হবার আগে বীরবিক্রম কলেজে পড়াতেন। খুব সুনাম···

—রাখেন, রাখেন গুপালদা,—হঠাৎ বাধা দিলেন শম্ভুবাবু,—অত তুইললেন না। হেবে আবার ঘুমমুইর দিয়া (ছুম করে) পইড়া যামু (পড়ে যাব)। তারপর, কৃষ্ণমুহন! খুব যেন জমাইছ (জমিয়েছ)? পঙ্গু-টঙ্গু কীতান জানি (কী সব যেন) কইতাছিলা?

—হাতির গল্প হচ্ছিল,—কৃষ্ণমোহনবাবুর সবিনয় নিবেদন।

—আতি! যেন আকাশ থেকে পড়লেন শম্ভুবাবু,—তা আতির তুমি কী বুঝ হে ছুকরা? আতি দেখছি আমি।

—দেখেছেন? কী রকম? শম্ভুবাবুকে প্রথম-দর্শনেই আমি মুগ্ধ।

—রকম-সকম সুবিদার না বাইগ্‌না (ভাগ্নে),—উনিও এতক্ষণে আপন করে নিয়েছেন আমাকে। কৌটো খুলে গোটা দুয়েক পান মুখে পুরে শুরু করেছেন,—বওন্যা (বুনো) আতির পিডে (পিঠে) চাইপ্যা (চেপে) একবার আমি দ্যাশ-ভ্রমণ (দেশভ্রমণ) করছিলাম।

—দেশ-ভ্রমণ? বুনো হাতির পিঠে চেপে? বলেন কী?—অঞ্জলির জিজ্ঞাসায় উপচে-পড়া বিস্ময়।

শম্ভুবাবু থামেন নি তখনও। ছোপ-ধরা দাঁতের মাথায় খানিকটা চুন আঙুলে করে গুঁজে দিয়ে বলছেন,—হ মা। হাচা (সত্যি) কথাঐ কই।···একবার। মহারাজা বীরবিক্রম তখন বাইচ্যা (বেঁচে)। রাজবাড়ির কয়েকটা আতি ছাড়া আছে। জঙ্গলে কয়েক মাসের ছুডিতে (ছুটিতে) গ্যাছে হেরা (ওরা)। আমিও কী একটা কামে যেন্ জঙ্গলে গেছি। দেখি কী, গুটা আট দশ আতি এক জায়গায় বইয়া (বসে) প্রেমালাপ করতাছে। এই কাণ্ড দেইখ্যা শখ চাপল আমার। বাবলাম (ভাবলাম), পিডে (পিঠে) চাপি একটার। রাজবাড়ির আতি, আমার চিনা (চেনা)। কিছু করত না।··· চাপলামও একটার পিডে। সেব কইরা (জুৎ করে) উপরে উইঠ্যা ত বইলাম,—আতিটা করল কী, লগেলগেঐ (সঙ্গে সঙ্গেই) উইঠ্যা খাড়ৈল (দাঁড়াল)। চলতে আরম্ভ করল হেরপর (তারপর)।

হে-ও (সেও) যায়, অন্যডিও (অন্যগুলোও) পিছে পিছে আইয়ে। কিছুক্ষণ যাওনের পর হডাৎ (হঠাৎ) যেন খেইপ্যা (ক্ষেপে) গেল হে (সে)। তেরিবেত্তিরি (দুষ্টুমি) আরম্ভ করল।···ব্যাপার কী ?—চাইয়া দেখি, কিছু দূরে আর একটা আতি। তেনার পিডে (পিঠে) মাহুৎ।···চিনতে পারলাম। ঐটার পিডে চাইপ্যা-ই তো আমি আইছি।···কিন্তু মাহুৎ আসানুল্লা কী কয় ? চেঁচায় (চিৎকার করে) ক্যান্ বেডা (বেটা) ?···'কর্তা ! সাবধান ! বওন্যা হাতির পিডে উঠছেন !'—হে কইল।···আমি তখন আর নাই। বুঝলাম, ভুল করছি। পুষা (পোষা) আতির আড্ডায় বওন্যা দোস্ত্ আইছিল। ভুল কইরা হের পিডে চাপছি।

—তারপর ? বাঁচলেন কী করে ?—গল্পের মাঝখানে বাধা দিলাম আমি।

শম্ভুবাব বলতে লাগলেন,—নিজের চেষ্টায় কী আর বাঁচছি রে বাইগ্না ! ভগবান বাঁচাইছেন। বিরাট এক বটগাছের রূপ ধইরা তিনি আমারে কুলে (কোলে) তুইল্যা নিছেন। হ ! গাছ একটা সামনেঐ আছিল। হের ডালপালাও আছিল লাগালের (নাগালের) মইধ্যে। 'জয় ভগবান' কইয়া ত ডালে ঝুললাম। বওন্যাও ভগবানের দয়ায় বেশি কিছু আর করল না।

সেদিন আরও অনেক গল্প হয়েছিল শম্ভুবাবুর সঙ্গে। কলেজের রুটিন-সংক্রান্ত যে কাজে কৃষ্ণমোহনবাবুর আসা, তা নিয়ে সেদিন আর কিছু হয়নি। বরং কথা হয়েছিল, একদিন আমরা যদি চম্পকনগর যাই তো নতুন কিছু খোরাক পেতে পারি।

—চম্পকনগর ! বাঃ ! ভারী সুন্দর নাম তো !—অঞ্জলি নাম শুনেই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেল। ঠিক হল, দেরী নয় আর ; আজকেই আমরা ওখানে যাবো।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ভর-দুপুরে বেরোলাম। যাত্রী তিনজন। আমি, গোপালবাবু আর অঞ্জলি। আগরতলা-আসাম রোড্ ধরে বি. টি. কলেজের জীপ তীরবেগে ছুটল।

চমৎকার এই রোড্। আগাগোড়া ঝকঝকে তকতকে। এছাড়া, প্রশস্তও বেশ। গোটা তিনেক গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে।

শোনা যায়, ত্রিপুরার অনেক কিছুই নির্ভরশীল এই রোড্‌টির ওপর। এ-রাজ্যের রক্তবহা প্রধান নাড়ীর মতো এ। আসামের সঙ্গে রাজ্যটির যোগাযোগ প্রধানতঃ এ-ধরেই।

১৯৫২ সালের আগে ত্রিপুরার অন্য চেহারা। সারা রাজ্যে পাকা পথ আদৌ ছিল না। এমনকি কাঁচা পথ যা ছিল, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তা ৯০ মাইলও নয়।

এদিকে আগরতলা-আসাম রোড্‌ও এই সেদিন গড়ে উঠল। কাজেই পুরনো, বনেদী সব রোড্-এর দু-ধারে যেমন গাছপালা থাকে, এখানে তা প্রত্যাশা করা অনুচিত। আর বলতে কি, গাছপালা বিশেষ নেইও।

শুধুমাত্র চারাগাছ রয়েছে জায়গায় জায়গায়। দরমা, কঞ্চি অথবা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। ভাবলাম, এরাই হয়তো বড় হবে একদিন। মহীরুহ হবে। রৌদ্রদগ্ধ পথিকরা এসে এদের তলায় দাঁড়াবে। আর আমাদের মতো যারা ব্যস্তবাগীশ, পথ ধরে ছুটতে ছুটতে তারা বলবে,—বাঃ! ভারী সুন্দর তো!

সুন্দরদের এখনও অবিশ্যি চোখে পড়ে। পথের ঠিক লাগাও না হোক, খানিকটা দূরেই।

দু'পাশে অনেকদূর অবধি ধানক্ষেত। ঘন সবুজ চারিদিক। সন্তান-সম্ভবা নারীদের মতো ধানের শীষগুলো সামনের দিকে ঈষৎ নুয়ে-পড়া।

খানিকটা দূরে, পুব-দিগন্ত-বরাবর পাহাড়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, দীঘির ঢেউ যেন; কাঁপতে কাঁপতে খানিকদূর অবধি উঠে স্তম্ভিত হয়ে আছে।

গোপালবাবু জীপ-ড্রাইভার দ্বিজেন্দ্রকে বললেন,—আরও একটু আস্তে চালাও গাড়ি। একটু আস্তে।

দ্বিজেন্দ্র গাড়ির বেগ কমাল একবার। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তা বাড়িয়ে বাড়িয়ে এমন করল যে, একবার ভাবলাম, সময়মত ব্রেক না কষলে সামনের ঐ পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খাবে গাড়ি। মুহূর্তের মধ্যে চুরমার হবে।

কিন্তু না, পাহাড় এখনও কিছুটা দূরে। সমতল পথকে পেছনে ফেলে গাড়ি এখন চড়াই ধরে উঠছে। সামনেই চোখে পড়ছে বনজঙ্গল। দূর থেকে কালো মনে হয়েছিল যাদের, এখন দেখি, তারা ঘোর-সবুজ। গোপালবাবু বললেন,—এদিকে, এই চম্পক-নগরেই থাকে আমার বন্ধু।

শুধালাম,—বন্ধু? কে তিনি?

—ত্রিপুরারই একজন।

—এই জঙ্গলে থাকেন?

—হ্যাঁ। কোথায় আর যাবেন? বন-জঙ্গলের সঙ্গে ত্রিপুরীদের যে নাড়ীর যোগ।

এদিকে দেখতে দেখতে গাড়ি আরও খানিকটা উঠে আসে। পাহাড়ের গা-ঘেঁষা, সমতল উঠোন-মতো একটা জায়গায় দাঁড়ায়। গোপালবাবু বাঁ-দিকের কয়েকটা ঘরবাড়িকে দেখিয়ে বলেন,—এই হল চম্পকনগর বেসিক ট্রেনিং কলেজ। এখানে দীর্ঘদিন কাজ করেছি আমি।

বললাম,—শুধু কাজ করেন নি। যতদূর শুনেছি, এ একরকম আপনার হাতেই গড়া।

গোপালবাবু আপত্তি জানান,—না না। তা ঠিক নয়। বন্ধুর সাহায্য না পেলে কিছুই হ'ত না।

কে এই বন্ধু?—বারবার ভাবি। বেসিক ট্রেনিং কলেজের ফুলবাগিচায় ঘুরতে ঘুরতে বারবার একই প্রশ্ন মনে আসে।

ট্রেনিং কলেজটি চমৎকার। চারিদিকের স্তব্ধ পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে যেন তার ছাড়া-ছাড়া ঘরবাড়িগুলো।

একটি বাড়ি দেখে তো চোখ জুড়িয়ে গেল। বাড়িটি দেখতে অনেকটা শিকারীদের মাচার মতো। মই বেয়ে ওতে উঠতে হয়।

একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছি দেখে গোপালবাবু শুধোলেন,—কী দেখছ এত?

বললাম,—বাড়িটা।

—আমি ওতেই থাকতাম।

—অ্যা!

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই বাড়িটার দিকে। চারিদিকের শান্ত গম্ভীর পরিবেশ ক্রমেই যেন গাঢ় হতে থাকে। সামনের পাহাড়ের উপর দিয়ে এক ঝাক বলাকা উড়ে যায়। অদূরে একটা কাঠ-ঠোকরা আর্তনাদ করতে থাকে। ঘন আঁধারের মধ্যে সামান্য একটু আলো যেমন, এই ভীষণ নিঃস্তব্ধতার মধ্যে ঐ শব্দগুলোও তেমনি পরিবেশকে আরও থমথমে করে।

বাড়িটার একপাশে খাদ; পাহাড় সোজা খাড়া নেমে গেল খানিকটা দূর অবধি। অন্যপাশে গভীর জঙ্গল। মই বেয়ে উঠে ওর বারান্দায় দাঁড়ালে চারিদিকে শুধু চোখে পড়ে পাহাড় আর পাহাড়।

ঠিক সামনেই পাহাড়ের গা বেয়ে-বেয়ে বিরাট একটা সরীসৃপের মতো আগরতলা-আসাম রোড্ চলে গেল।

গোপালবাবু বললেন,—কিছুদিন আগেও এখানকার জঙ্গলে হিংস্র সব জন্তুরা ঘুরে বেড়াত।

শুধালাম,—এখন?

—আর নেই ওরা। তাড়া খেয়ে সব পালিয়েছে।

—হরিণ-টরিণ?

—আছে বোধ হয়। বন্ধুকে শুধোলে জানতে পারবে।

জানলাম। অবাক হলাম বন্ধুটিকে দেখে।

সে পথেই দাঁড়িয়েছিল ; খালি গায়ে, গামছা পরনে।

গোপালবাবুকে দেখে উচ্ছ্বসিত একেবারে। 'বন্ধু বন্ধু' বলে ঝড়ের বেগে ছুটে এল। জড়িয়ে ধরল তাঁকে।

গোপালবাবুও কম যান না। 'আনি কিচিং' (আমার বন্ধু), 'আনি কিচিং' বলে আলিঙ্গন করলেন লোকটিকে।

আমরা ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতবাক। মনে হল, আরণ্যক পটভূমিতে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য একটা নাটক দেখছি।

কিন্তু নাটক তখনও বুঝি বাকি ছিল। আলিঙ্গন একটু শিথিল হতেই বন্ধুটি বললে,—আনি নগ ফাইদি (আমার ঘরে এসো)।

গোপালবাবু আমাদের সঙ্গে বন্ধুটির পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন,—আনি জাইতি (আমার আত্মীয়)। চুংবাই থাঙ্গান (আমাদের সঙ্গে যাবে)।

বন্ধু খুব খুশি এ-প্রস্তাবে। আমাদের দিকে এগিয়ে এসে করজোড়ে বলল,—ফাইদি চুং থাংনা (চল আমরা যাই)।

চললাম। ট্রেনিং কলেজের চত্বর থেকে নেমে এলাম খানিকটা। আগরতলা-আসাম রোড্‌টি পেরিয়ে সরু আকাবাঁকা একটি পথ ধরে এগোলাম।

খানিকদূর এগোতেই বন্ধুর বাড়ি। জঙ্গলের মাঝখানে ঝকঝকে তকতকে কয়েকটা মাটির ঘর। এত সুন্দর করে নিকানো যে, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

কী নেই বন্ধুর বাড়িতে? ঠাকুর-ঘর থেকে শুরু করে ঢেঁকিশাল এবং গোয়াল-ঘর পর্যন্ত।

বন্ধু সঙ্গে করে নিয়ে সব দেখাল। তার স্ত্রী কোথা থেকে যেন বছর তিনেক বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে এল। বন্ধু নির্দেশ দিতেই সে প্রণাম করল আমাদের।

আমরা অপ্রস্তুত। এহেন একটি শিশুর উপর এই অত্যাচার ?—বলতেই গোপালবাবু বুঝিয়ে দিলেন,—না না। আপত্তি করো না। এই হল ত্রিপুরীদের নিয়ম। ওদের ঘরে মান্যগণ্য কোনো অতিথি এলে শিশুকে দিয়ে প্রণাম করায় ওরা। অতিথিকে অভ্যর্থনা জানায়।

বললাম,—ছাজুক বুরুই হাম (মেয়েটি সুন্দরী)।

বন্ধুর স্ত্রী খুব খুশি এ-কথায়। যা বললে, তার মানে দাঁড়ায়,—আমাদের নিজের মেয়ে নয়। ভাগ্‌নীর ঘরের নাতনী। পাশের বাড়ি থেকে নিয়ে এলাম।

গোপালবাবু বুঝিয়ে দিলেন,—হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমরা এলাম বলে আনা হল। বন্ধু আমার নিঃসন্তান।

—না না, ওকথা বলো না,—বন্ধুর আপত্তি,—সন্তান অনেক আছে আমার। এই তো, বাড়ির পিছনে। আশে-পাশে।

তা বটে। আছে বটে ওরা ; খানিকক্ষণের মধ্যেই মালুম হল। বন্ধু বাড়ির পিছনের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

—গোম্‌তী! গোম্‌তী!—বন্ধু চিৎকার করে ডাকতেই একটি হরিণ এগিয়ে এল প্রথমে। তারপর এল কয়েকটি রাজহাঁস।

বন্ধু বললে,—তাথুম বুতুই তুইঅ (হাঁস ডিম দেয়)। বছা খুম্পাইখা (ছানা ফোটায়)।

গোপালবাবু বললেন,—তাই বটে। বন্ধু ছানাদের বিক্রী করে না। ডিম নষ্ট করে না একটিও।

এতক্ষণে কথা বলতে বলতে খানিকদূর এগিয়ে এসেছি আমরা। অদ্ভুতদর্শন কিছু মোরগের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। বন্ধু বললে,—তমছানি বুইখুম্ তক্ষ (বুনো-মোরগের পালক আছে)। তক্‌মা বুতুই করঅ (মুরগীরা ডিমে তা দেয়)।

বলতে যাচ্ছিলাম,—বন্ধুর সংসারটি দেখছি ছোট নয় নেহাৎ।···

এমন সময় হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে উঠল,—আনি অক্ খুইঅ (আমার ক্ষিধে পেয়েছে)।

—কে? কে ওখানে?—বন্ধুকে শুধোই।

—মনাই (ময়না),—বন্ধু জবাব দেয়,—কক্ ছুকঙ্গ (কথা শিখতে পারে)।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়সড় এক খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি, অনেক পাখি সেখানে। ময়নাও আছে।

—জম্পাঐ! জম্পাঐ! বন্ধু এবার তারস্বরে চিৎকার শুরু করে; এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনেকার বনে মচ্ মচ্ শব্দ ওঠে একটা। মনে হয়, কে বা কা'রা যেন তর-তর করে ছুটে আসছে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এল ওরা। একটি ছাগল তার গোটা তিনেক বাচ্চাকে নিয়ে এসে বন্ধুর কাপড় চিবুতে লাগল।

বন্ধু সাবধানে কাপড়টি সরিয়ে নিয়ে বললো,—নুং আন থা হামিঅা অম্খা (আমার উপর রেগে আছ দেখছি)। আন থামচি তা কাদি (রাগ করো না)।

ভাবলাম,—ছি! ছি! রাগ অমনি করলেই হল। এই যে এত স্নেহ ঢেলে বিরাট এই সংসারটি পেতেছে বন্ধু, কা'র সাধ্যি এখানে এসে রাগ করে? পশুপক্ষী তো ছাড়, জড়প্রকৃতিও এমন একটি সহজ ও অমায়িক মানুষের কাছে বশ হয় বুঝি!

এদিকে পশুপক্ষীদের মহল দেখে বন্ধুর ঘরে ফিরি আবার। গল্পে মাতি। কথায় কথায় জুম-চাষ নিয়ে প্রশ্ন করি বন্ধুকে,—শুনেছি, ত্রিপুরীরা খুব নাকি জুমের ভক্ত?

বন্ধু আমার প্রশ্ন শুনে খিল খিল করে হাসে খানিকক্ষণ; শিশু হয়ে ওঠে। এবং তারপর হাসির বেগ খানিকটা কমলে যা জবাব দেয়, বাংলায় তা অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়,—জুমের ভক্ত কি গো! চাষ তো এক রকমই ছিল এদিকে। আর, সে হল জুম। এই ধরো না কেন, আমার কথা। আগে তো জুম-চাষই করতাম। কিন্তু

হালে, সরকারের এতে আপত্তি। ওঁরা বলেন, জুম মানে তো বনের খানিকটা করে জায়গায় আগুন লাগানো ; এবং তারপর সেই পোড়া বনের উপরে চাষ করা ?···বন পুড়িয়ে সার পেলাম ; অতএব ফসলও ভালো পাবো, এই আশায় বনকে নষ্ট করা ? ··আজ এখানে আর কাল সেখানে চাষ করে যাযাবর সাজা ?···না না, এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশি। ভালো ফসল এথেকে হয় না।·· তাই জুম ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে এখন। চাষবাস এখন চলছে নয়া নিয়মে।·· আগে জুমে যাবার সময় কত গল্প হ'ত আমাদের ! বিশেষ করে দুই বোনের সেই গল্পটা তো রোজই হ'ত।

আমি উসকে দিলাম,—গল্পটা শুনতে পারি ?

—নিশ্চয় পারেন,—বন্ধু বললেন,—দুই বোন ছিল। জুমে যেত তা'রা। একসঙ্গে চাষবাস করত। একদিন জুমে যেতেই ভীষণ বৃষ্টি। সেই সঙ্গে ঝড়। বোন দু'টি ভয় পেল খুব। কী করবে, কোথায় যাবে, কিছুই ঠিক করতে পারল না। এদিকে টং নেই ওদের। এমন কিছু একটা আশ্রয় নেই, যার উপরে উঠে ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে ওরা বাঁচতে পারে। বড় বোন তখন বললো,—এই মুহূর্তে কেউ যদি টং বানিয়ে দেয় আমাদের তো সে এমনকি সাপ হলেও আমি তাকে বিয়ে করবো।···দেবতা শুনলেন এই কথা। শুনেই মুহূর্তের মধ্যে একটি টং বানিয়ে দিলেন। দুই বোন টং দেখে তো খুব খুশি। তাড়াতাড়ি ওরা গিয়ে ওতে উঠল। ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাল কোনক্রমে। এদিকে বৃষ্টি একটু কমতেই বড় বোন অস্থির ; কে টং বানাল, জানা চাই। কারণ, প্রতিজ্ঞার কথাটা সে ভুলে যায় নি।··ছোট বোনকে তখন সে বললো,—তাঁকে ডাকো।···বোন তো অবাক।—কাকে ডাকবো আবার ?—সে বললে।·· বড় বোন জবাব দিলে,—যিনি, তোমার ভগ্নীপতি হবেন তাঁকে। এক্ষুণি তাঁকে ডেকে বলো, দয়া করে তিনি যেন খেতে আসেন এখানে।···ছোট বোন তাই বললো।· এদিকে

দেবতা করলেন কি, বিরাট এক সাপের রূপ ধরলেন। ফোঁস ফোঁস করতে করতে সারা বন কাঁপিয়ে এসে হাজির হলেন।···ছোট বোন সেই সাপকে দেখে ভয়েই জবুথবু। তাড়াতাড়ি সে গিয়ে আড়ালে লুকোল।···বড় বোন কিন্তু ভয় পেল না এতটুকু। কারণ, সে জানে, টং বানিয়েছেন স্বয়ং দেবতা; এবং এই সাপ দেবতা ছাড়া আর কেউ নন।···সে তখন সাপকে যত্ন করে খেতে দিল। মনে মনে তাঁকে স্বামী বলে বরণ করল।···স্বামী-দেবতা খেয়েদেয়ে খুব খুশী। ফোঁস ফোঁস করতে করতে বনে চলে গেল। বড় বোন খুব তৃপ্তির সঙ্গে উচ্ছিষ্ট খেল তাঁর। কিন্তু ছোট বোন রাগে, ঘৃণায় অস্থির একেবারে। সে উচ্ছিষ্ট তো খেলই না; উল্টে বাড়ি গিয়ে বাবার কাছে নালিশ করল। বাবা সব শুনে রাগে কাঁপতে লাগলেন। সেই সাপকে কী করে শাস্তি দেয়া যায়, দিনরাত শুধু তাই ভাবতে লাগলেন।··· অবশেষে একদিন। হঠাৎ করেই সুযোগ এল। সাপের বউ অর্থাৎ সেই বড় বোন কা'র যেন বাড়ি গিয়েছিল। সেই সুযোগে বাবা করলেন কী, তার ছোট মেয়েকে নিয়ে জুমে গেলেন। মেয়েকে বললেন,—ডাকো তাকে। সেই শয়তান সাপটাকে ডাকো।···ছোট বোন ডাকতেই যথারীতি ফোঁস ফোঁস শব্দ তুলে সাপ এসে হাজির হল।···বাবা ধারাল দা নিয়ে আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিলেন। সাপ আসা মাত্রই কোপ বসিয়ে দিলেন তিনি। তার মাথাটি দেহ থেকে আলাদা করে জলে ফেলে দিলেন।···এদিকে ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটল এক অঘটন! সাপের বউয়ের খোপা থেকে ছুরাং অর্থাৎ বেণী বাঁধবার জন্যে হাড়ে-গড়া শলাকাটি হঠাৎ পড়ে গেল। বউ বুঝল, নিশ্চয় কিছু একটা সর্বনাশ হয়েছে। তাই সে করল কী, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরল। ছোট বোনকে নিয়ে জুমে গিয়ে স্বামীকে ডাকতে লাগল। কিন্তু স্বামী আর আসে না। দুপুর গড়ায়, সন্ধ্যে পেরোয়, রাত হয়; স্বামীর দেখা মেলে না আর।···সে তখন কাঁদতে লাগল। আর সে কী কান্না। সারা বন কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে একটানা গোঙানি,

শুধু।···সেই কান্না শুনে তাদের পোষা কুকুরটি এল। বড় বোনের কাপড় কামড়ে ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল সেই জলের ধারে যেখানে নাকি বাবা সাপটিকে দু'টুকরো করে ফেলে দিয়েছিলেন।···এদিকে সাপের বউ সেখানে গিয়ে দেখল, এক খম্পুই ফুল। দেখেই চিনল সে। তার মনে পড়ল, এ ফুলটাই স্বামীর মাথায় সে দেখেছে।···তাড়াতাড়ি ওটা তুলে নিয়ে সে মাথায় রাখল এবং তারপরেই কান্না শুরু করল আবার। স্বামী এসে তাকে নিয়ে যাক, এই বলে কাঁদতে লাগল। এদিকে জলাশয়ে জল বেড়ে চলল ক্রমেই। দেবতার দয়ায় কানায় কানায় ওটা ভরে গেল। সাপের বউ জলে নামল এবার। সাপ ওরফে দেবতার সঙ্গে মিলে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

—দিন আমাদেরও সুখেই কাটছে,—সামনে রাখা খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে বন্ধুকে বললাম।

—হ্যাঁ, তাইতো! খেয়ালই করিনি এতক্ষণ;—গোপালবাবু বললেন,—বৌদিভাই কখন এসে যে এতসব রেখে গেছেন!

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, এতসবই বটে। মুড়ি মধু দুধ আর নারকেল থরে থরে সাজানো।

অঞ্জলি বললে,—কিছু কমিয়ে দিন। এত কখনও খাওয়া যায়?

বন্ধু কী যেন বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু তার আগেই গৃহিণী হাজির। দু' হাতে দু' খণ্ড বাঁশ।

বললাম,—না খেলে মারবেন নাকি?

গৃহিণী হাসতে হাসতে বললো,—হ্যাঁ।

বলেই বাঁশ দুটিকে রেখে বসল। দারুণ যত্নে কী যেন খুলতে লাগল ওগুলোর থেকে।

শুধালাম,—কী ওগুলো?

গোপালবাবু বুঝিয়ে দিলেন,—ওই তো আসল খাবার। ও তোমাদের খেতেই হবে।

—কেন ? কী আছে ওতে ?

—ভালো জিনিসই নিশ্চয়। বাঁশের দুই গাঁটের মধ্যে রেখে নরম আঁচে রোস্ট করা সুস্বাদু কোনো খাদ্য।

—মাংস-টাংস নয় তো ?

—না না। কখনও নয়। বন্ধু আমার নিরামিষাশী।

এতক্ষণে খাবারগুলো বের করা হয়েছে। দেখি, কুমড়োর ঘণ্ট একটিতে ; আর অন্যটিতে বেগুনের চচ্চড়ি। খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম। বন্ধুর স্ত্রী বিরাট দুটো কুমড়ো এনে বললেন,—নিতে হবে। গোপালবাবুর আপত্তি,—দু'টো নয়, একটা নিচ্ছি।

বন্ধু হা হা করে উঠলেন,—তা কখনও হয়। নিজের গাছের সবচেয়ে বড় দু'টি কুমড়ো তোমার জন্যে রেখেছি। এক মাস ধরে ভাবছি, তুমি আসবে।

—এক মাস।—শুধরে দিলেন গোপালবাবু,—ভুল হল বন্ধু। হপ্তা তিনেক আগেও আমি এসেছি। সফরী (মর্তমান) কলার ছরি নিয়ে গেছি তোমার বাগান থেকে।

—তা নিয়েছ, কিন্তু

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল বন্ধু। হঠাৎ বাধা পড়ে। অঞ্জলি লাফিয়ে ওঠে 'সাপ সাপ' বলে। আমিও ভীষণভাবে চমকে উঠি। উঠোনের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, বিরাট এক অজগর। ধীর মন্থর গতিতে এগোচ্ছে।

বন্ধু অভয় দিল,—না না। ভয়ের কিছু নেই। ও তো উদয়। কিছু বলবে না।

শুধোলাম,—পোষা বুঝি ?

—না, ঠিক পোষা নয়, তবে কিনা, পড়শী। খুব কাছেই থাকে। এই উঠোনের ওপর দিয়েই যায়-আসে।

গোপালবাবু সায় দিলেন,—তা বটে। উদয়কে আগেও কতবার দেখেছি!

—উদয়! বাঃ! ভারী সুন্দর নাম তো!—ভৈরব ভীষণ সরীসৃপটির চলন দেখতে দেখতে অঞ্জলি বললো।

বন্ধু এই তারিফ শুনে খুব খুশী। বললো,—সুন্দর! তা তো হতেই হবে! নামটা যে অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করা।

শুধোলাম,—ভেবেচিন্তে? কী রকম?

বন্ধু বললো,—বিয়ের পর আমরা ঠিক করলাম, ছেলে হলে নাম রাখবো উদয়। কিন্তু ছেলেপিলে তো আর হল না। এদিকে বৌ একদিন বললো,—হলেই বা কী এমন! এই তো; ছাখ না, পাশেই রয়েছে সিমুং খুড়ো। ছেলে তু'বেলা ওকে ঠ্যাঙায়। ওফ্! ছেলে তো নয়; যেন অজগর। পারলে বাপকেই গিলে খায়!···

বৌ যখন এসব বলছিল, তখন এই মহারাজ এদিক দিয়ে যাচ্ছেন। প্রায়ই যেতেন তিনি। আমরা খুব একটা ভ্রূক্ষেপ করতাম না! কিন্তু সেদিন কী যে হল; ফস করে বৌকে বললাম,—আচ্ছা! একে যদি উদয় বলে ডাকি? ··বৌ বললো, বেশ হয় তবে।· ব্যস! সেই থেকে উদয় নাম।

সেদিন অনেকক্ষণ ছিলাম বন্ধুর ব্যাড়তে। অঁনেক গল্প করেছিলাম। উঠতে উঠতে প্রায় সন্ধ্যে।

বন্ধু আর বন্ধুপত্নী গাড়ি অবধি এগিয়ে দিল। কুমড়ো তু'টোকে উঠিয়ে দিয়ে বারবার করে বললো,—আবার আসবে।

গাড়িতে উঠতে যাবো; দেখি, জম্পঐ হাজির; তার তিন তিনটে বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে।

দেখতে দেখতে গোম্‌তী মানে সেই হরিণটাও এল। আর এল কিছু বন-মোরগ ও রাজহাঁস। সবাই মিলে পরিবেশ এমন জমাট করে তুললো যে, একবার ভাবলাম, বিরাট এক পরিবারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ছেলেপুলে নিয়ে বিদায় জানাতে এসেছেন বন্ধু।

—আনি কিচিং (আমার বন্ধু) ! আসি তবে ;—গাড়ি ছাড়বার মুহূর্তে গোপালবাবু বললেন।

বন্ধু বললো না কিছু। আকুলভাবে হাত নাড়ল শুধু। বন্ধুপত্নী ছুটে এসে একবার দেখে গেল, কুমড়ো দু'টো ঠিক জায়গায় আছে কিনা।

এদিকে গাড়ি স্টার্ট নিতেই বন-মোরগদের মধ্যে চাঞ্চল্য। 'কক্কর কো' করে ডাকতে শুরু করেছে ওরা। রাজহাঁসগুলো আর্তনাদ করছে,—প্যাক প্যাক। প্যাক প্যাক।

ভাবলাম, যাক! ভালোই হল। বিদায়-সম্বর্ধনাটা দেখতে দেখতে মহিমময় হয়ে উঠল। পশুপক্ষী মানুষজন সবাই যোগ দিল সম্বর্ধনায়।

এদিকে দেখতে দেখতে গাড়ির গতি বাড়ে। অরণ্যের জমাট স্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে সে এগোয়।

সন্ধ্যা নামছে অরণ্যে। পাখিরা ঘরে ফিরছে। গাড়ির গর্জনকে চাপিয়ে কলকাকলি ভেসে আসছে ওদের। গোপালবাবু আবৃত্তি শুরু করলেন,

> তাহারে অন্তরে রাখি
> জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী
> সুখে-দুঃখে ধৈর্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
> প্রতিদিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
> সুখী করি সবজনে ;

শুধালাম,—হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ ? বন্ধুকে স্মরণ করে ?

গোপালবাবু জবাব দিলেন,—ঠিক ধরেছ। রবিবাবুর এ ক'টা লাইন ওর জীবনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ও মানুষটা আসলে দুঃখী। কিন্তু দুঃখের খবর কাউকে জানতে দেয় না। নীরবে সকলের আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখের জল মোছে। সব্বাইকে সুখী করে একা পথ চলে।

বললাম,—ঠিক বোঝা গেল না। ব্যাখ্যাটা মূল কবিতার চেয়েও কঠিন হয়ে উঠল।

—ওফ্! তাই বুঝি!—হো হো করে হেসে উঠলেন গোপালবাবু,—কী জানো, মানুষের বেদনাকে স্পর্শ করা চিরকালই কঠিন। বন্ধুকে ভালোবেসেছিলাম বলেই না জানতে পেরেছি ওকে। জেনেছি, ছেলেপুলে নেই বলে ওর কত কষ্ট।

—কষ্ট!—গোপালবাবুর কথা শুনে আমি অবাক,—কই! তার তো প্রমাণ পেলুম না কিছু।

—তোমরা পাও নি; কিন্তু আমি পেয়েছিলুম,—একটু থেমে গোপালবাবু শুরু করলেন আবার,—একদিন। চম্পকনগরে। বেসিক ট্রেনিং কলেজের কোয়ার্টারে বসে ওর কাছে গীতা ব্যাখ্যা করছি। ও হঠাৎ করল কী জানো? থর থর করে কাঁপতে লাগল। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বললো, বন্ধু! গীতা কোরাণ বাইবেল—কত কিছুই তো তুমি শোনাও! বুঝিয়ে দাও কী সুন্দর করে! আচ্ছা, বলতে পারো, কী পাপে মানুষের ছেলেপুলে হয় না? ···আমি পারলম না বলতে। বন্ধুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।···কিন্তু বন্ধু কি ধরা দেয়? ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ব্যস! এই একদিনই শুধু। এর আগে বা পরে আর কখনও এ-প্রশ্ন সে করে নি।

বললাম,—না-করুক। ও কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু আপনার।

গোপালবাবু জবাব দিলেন,—এতে কি সন্দেহ আছে?···বন্ধু না থাকলে চম্পকনগরে কে দেখত আমায়? ম্যালেরিয়ায় ধরল যখন, কে তখন সেবা করত?

—আপনার ম্যালেরিয়া হয়েছিল?—অবাক হয়ে শুধোই,—কই! জানতাম না তো!

—কী করে জানবো?—অঞ্জলির স্বগতোক্তি,—না জানালে কি জানা যায়?

গোপালবাবু স্বীকার করলেন,—তা বটে। তোমাদের জানাইনি বটে। ভাবলাম, কী হবে সবাইকে কষ্ট দিয়ে।

তার চেয়ে···

অঞ্জলি পূরণ করে দিল,—নীরবে সকলের আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছি। সব্‌বাইকে সুখী করে একা পথ চলি। কেমন? এই তো?

গোপালবাবুর আপত্তি,—না; এ নয়। বন্ধু তখন একা চলতে দেয় নি। সারাক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

অঞ্জলি বললে,—তখন থাকত। কিন্তু এখন?

—এখনও খবর নেয় সে। আসে মাঝে মাঝে। দুঃস্থ পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা 'অরফ্যানেজ' করার 'প্ল্যান' চলছে। বন্ধু স্বপ্ন দেখছে, বিরাট একটা শিবির গড়ে উঠবে। কত ছেলেমেয়ে থাকবে সেখানে! যাদের মা-বাপ নেই, কেউ নেই—তারা এসে সেখানে হাসবে নাচবে গাইবে। বন্ধু দেখাশুনো করবে তাদের। আমিও দেখবো।

বললাম,—এখন বুঝেছি, আপনাদের বন্ধুত্ব হল কী করে। আসলে দু'জনে আপনারা একই পথের পথিক।

গোপালবাবু জবাব দিলেন,—তা জানি নে। তবে এক রাত্তিরের কথা মনে আছে। তখন আমার দারুণ জ্বর। ম্যালেরিয়ায় ঠক ঠক করে কাঁপছি। অনেক দূর থেকে বুনো জন্তুর আর্তনাদ ভেসে আসছে। বারবার মনে হচ্ছে, যেন পাহাড়ের খাদ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছি। কেউ আমায় ধরছে না, কেউ দেখছে না। এমন সময় ভয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলুম হঠাৎ। বন্ধু আমার কাছেই বসেছিল। চিৎকার শুনে আরও কাছে এগিয়ে এল। শুধোল,—আনি কিচিং (আমার বন্ধু), কী হচ্ছে তোমার? খুব কষ্ট?···আমি চোখ মেলে তাকাতেই আবার ডাকল সে,—আনি কিচিং!···আমি সম্বিৎ ফিরে পেলুম যেন। মনে

হল, পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ছি না আর। ঘরেই শুয়ে আছি। কিন্তু আমার পাশে কে ও? নিশ্চয় সত্যিকারের কোনো বন্ধু আমার।···আমার বন্ধু, 'আনি কিচিং আনি কিচিং'—আমিও বলে উঠলুম ঠিক সেই মুহূর্তে।···হ্যাঁ, সেই থেকেই বন্ধুত্ব।

বললাম,—বন্ধুর তো শিক্ষাদীক্ষায়ও উৎসাহ। ট্রেনিং কলেজ গড়বার সময় আপনাকে সাহায্য করেছে।

গোপালবাবু জবাব দিলেন,—সাহায্য বলতে অ্যাকাডেমিক বা ফিনান্সিয়াল কিছু নয়। সে-সব কোত্থেকেই বা করবে ও! ওর সাহায্যটা ছিল 'মর‍্যাল' অর্থাৎ নৈতিক। হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসা নামক বস্তুটার আবাদ না করলে যা নাকি হাজার চেষ্টায়ও ফলানো যায় না। কলেজের 'এক্স্‌টেন্‌শান' হবার সময় ও কী করত, জানো? ···সন্ধ্যে-সকাল সুপুরি গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকত। কুলীকামিন্‌দের কাজে কোনো গলতি দেখলেই মাথা নাড়ত এমন করে যে, দেখলে হামেশাই আমার মনে হ'ত, ঝড় উঠেছে, সত্যিকারের কোনো সুপুরি গাছই দুলছে বুঝি।· অথচ কেউ ওকে ডাকেনি; কাজ করতে বলে নি।··একবার কী বিপদ! এক ওভারসীয়ারকে রং চুরি করতে দেখে হাতেনাতে ধরে ফেললে। আমার কাছে এসে নালিশ করলে। আমি 'স্টেপ' নিয়েছিলুম। কিন্তু নিলে কী হবে। সে ভদ্রলোক ভারতের অন্য আর একটি রাজ্যে অনেক উঁচুপদে কাজ করছেন এখন।

—'স্যার'।—কথা বলতে বলতে চমক ভাঙে হঠাৎ। জীপ-ড্রাইভার দ্বিজেন্দ্রের ডাক শুনে ফিরে তাকাই।

—স্যার!—গোপালবাবুকে শুধোল সে,--নরেন দত্তর আশ্রমে যাইবেন?

—হ্যাঁ, যাবো। গোপালবাবুর সংক্ষিপ্ত জবাব।

—যাইবেন তো আগে কইলে—বলতে বলতেই প্রচণ্ড এক ব্রেক কষে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সে বললো, সুৃবিধা অইত (সুবিধে হ'ত)।

বললাম,—অসুবিধেই বা কি! হঠাৎ ব্রেক কষায় কুমড়ো দু'টোর সঙ্গে একটু যা ঠোকাঠুকি।

গোপালবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—লাগল?

বললাম,—না না। কিছ্ছু না।

দ্বিজেন্দ্র বললে, সামনেই স্যার, আশ্রম।

গোপালবাবু বিরক্ত একটু,—তা তো বুঝতেই পাচ্ছি। ব্রেক কষার ধরন দেখেই বুঝেছি। তাড়াতাড়ি নামলাম গাড়ি থেকে। কিন্তু কোথায় আশ্রম? ঘুটঘুটে অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা। গোপালবাবু বললেন,—সাবধানে: খুব সাবধানে এগোও।

এগোলাম; অন্ধকারে পা টিপে টিপে। কাচের মত কালো পুরু পর্দা সরিয়ে যেন।

খানিকদূর এগোতে মনে হল, খুব কাছেই একটা ঘরে প্রদীপ জ্বলছে।

গোপালবাবু বললেন,—ঐ যে ঘরটা দেখছো, ওখানেই আছেন তিনি।

শুধালাম,—তিনি মানে?

—সাধক নরেন্দ্রনাথ। আশি বছরের এক তরুণ।

কেমন যেন রহস্যময় ঠেকল সব কিছু। মনে হল, ব্রহ্মচারী নয়, ভৈরব-ভীষণ কোনো কাপালিকের কাছে যাচ্ছি।

শব-সাধনা করছেন তিনি। গাঢ় গভীর এক ফালি আঁধারকে আলো নামক ছুরি দিয়ে কেটে কেটে গলিত শবদেহের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন।

কিন্তু কোথায় শবদেহ? কাপালিক কোথায়? এগিয়ে গিয়ে দেখি, অতি সাধারণ এক বৃদ্ধ: ধ্যানে বসেছেন।

আমরা ঘরে ঢুকলাম। বসলাম। ভ্রূক্ষেপই নেই তাঁর।

খানিকক্ষণ বাদে ধ্যান ভাঙল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের

দিকে চোখ পড়তেই বললেন,—গোপাল যে! কতক্ষণ এসেছ? এরা কা'রা?

গোপালবাবু পরিচয় করিয়ে দিতেই খুব খুশি তিনি। বললেন,—কী আনন্দ! কী আনন্দ!

পরক্ষণেই আবার বিমর্ষ একটু,—আহা! অনেকক্ষণ এসেছ! ডাকলে না কেন?

গোপালবাবু বললেন,—আপনি ধ্যান করছিলেন।

—ধ্যান?—হঠাৎ উত্তেজিত হলেন নরেন্দ্রনাথ,—কিসের ধ্যান? কা'র ধ্যান? ওরে পাগল, আমি এতক্ষণ তোদের কথাই ভাবছিলুম! মানুষের ধ্যান করছিলুম।

বললাম,—মানুষের?

—হ্যাঁ, তাছাড়া আবার কি!—পরিষ্কার জবাব দিলেন নরেন্দ্রনাথ,—এখন মানুষই যখন কাছে এলো আমার, কেন আমি ধ্যান করবো? কোন্ দুঃখে করবো?...কী জানিস, মানুষকে না পেলেই ঐরকম করি আমি। নিজের কাছ থেকে নিজে ছুটে পালাই।

বললাম,—তবে তো মানুষকে নিয়ে ঘর করা উচিত ছিল আপনার। নিজের কাছ থেকে তবে পালাবার দরকার হ'ত না।

নরেন্দ্রনাথ খুব খুশি। বললেন,—ঠিক বলেছিস। কিন্তু মানুষকে নিয়ে সত্যি কি ঘর করি আমরা? না কি ঘর করি ঐশ্বর্য, খ্যাতি, লোভ আর বাসনাকে নিয়ে?

জবাব দিলাম না কিছু। নরেন্দ্রনাথও খানিকক্ষণ কিছু বললেন না।

নীরবতা ভাঙলেন গোপালবাবু,—শেষেরটাই ঠিক বোধ হয়।

—তবে?—নরেন্দ্রনাথের পাল্টা প্রশ্ন এবার,—তবে খুব যে জ্ঞান দিচ্ছিলি রে ছোকরা?...ত্যাখ্, সংসার আমিও করি। এ-আশ্রমেও লোক থাকে। কিন্তু তাতে কী! ওরা কি সকলের হতে পেরেছে? আমি পেরেছি?...এই যে এত করে ওদের বলছি, ত্রিপুরার আদি-

বাসীদের দিকে তাকা, বনজঙ্গলে গিয়ে ওদের জন্যে কিছু কর্;—তা' ওরা কি এসব কথা শোনে? না কি জানে, কতরকম উপজাতি আছে ত্রিপুরায়!

শুধালাম,—কতরকম আছে?

—উনিশ রকম,—বলেই মগ সাই চাকমা গারো ছাইমাল হালাম গুরাং টিপেরা উচাই ইত্যাদি উপজাতির বিরাট এক ফিরিস্তি দিলেন নরেন্দ্রনাথ।

—উপজাতির মধ্যেও ভাগ আছে আবার,—নরেন্দ্রনাথ প্রদীপের সল্‌তেটা সামান্য একটু উস্‌কে দিয়ে শুরু করলেন,—এই ধর না কেন কুকীদের কথা, বালটে বেলাম ত ছালিয়া ফন—কত কা আছে ওদের মধ্যে। অবিশ্যি আজকের ত্রিপুরায় আদিবাসী বলতে উপজাতিদেরই শুধু বোঝায় না, তপশিলীদেরও বোঝায়। কারণ, দেশ ভাগ হবার পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার তপশিলী পরিবার ত্রিপুরায় এসেছে। যতদূর জানি, ত্রিপুরার তপশিলী জনসংখ্যা এখন এক লক্ষেরও বেশি।

—আর উপজাতি?—আমি প্রশ্ন করি,—নিশ্চয় তাদের সংখ্যা আরও বেশি?

—হ্যাঁ, বেশি তো বটেই!—নরেন্দ্রনাথের সব মুখস্থ যেন, চার লক্ষের কাছাকাছি এখন। কিন্তু শুধু সংখ্যা দিয়ে কি হবে? কী করেছি আমরা ওদের জন্য? কতটকু ভেবেছি?

গোপালবাবু বললেন, জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ তো ভালই চলছে। জুম-চাষে নির্ভরশীল আদিবাসীদের সমতলে চাষবাসের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। ছাত্রাবাস গড়ে উঠছে ওদের জন্যে। শ্রমিক-পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। কাঞ্চনপুর সাব্রুম ইত্যাদি কত জায়গায় উন্নয়ন ব্লক হচ্ছে।

—হ্যাঁ, হচ্ছে হচ্ছে আর হচ্ছে! নরেন্দ্রনাথ রীতিমত বিরক্ত এবার,—ওরে গাধা, সত্যি যদি কিছু হবে তো ওরা খেতে পায় না

কেন? রোগে শোকে অভাবে অভিযোগে অমন হাহাকার করে কেন?

গোপালবাবু জবাব দিলেন না। আমরাও চুপ।

একটু জিরিয়ে নিয়ে নরেন্দ্রনাথই শুরু করলেন আবার, কেন করে জানিস? আমরা ওদের ভালোবাসি না বলে। ওদের কল্যাণের জন্যে যা করা দরকার, তার প্রায় কিছুই করি না বলে। আজ তোরা যখন এলি, আমি তখন ওদেরই ধ্যান করছিলুম রে! ভাবছিলুম, এক্ষুণি, একেবারে এই মুহূর্তেই কী করা যায় ওদের জন্যে।

হঠাৎ হর্ন বেজে উঠল। মনে হল, দ্বিজেন্দ্রের তাড়া; এই মুহূর্তে আর কিছু হোক না হোক, আমাদের অন্ততঃ উঠতে হবে।

উঠলাম। নরেন্দ্রনাথ খানিকদূর অবধি এগিয়ে দিলেন। বারবার বললেন, তুঃখ থেকে গেল। রাত করে এলি। আশ্রম দেখতে পেলি না।

বললাম,—তাতে কী! আপনাকে তো দেখলাম।

নরেন্দ্রনাথ হা-হা করে উঠলেন,—এই ছাখ! ভণ্ডামি শুরু করল আবার।

..

ভণ্ডামিই বটে!—সেদিন আগরতলা যেতে যেতে ভাবি, নরেন্দ্রনাথ নিজেই একটা ভণ্ড নন তো? ওঁকে দেখে আর ওঁর কথা শুনে এমন সন্দেহও তো উঁকি দিয়েছিল আমার মনে! অথচ কী বলতে কি বললাম ওঁকে। গোপালবাবু আমার মনের কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন বোধ করি। হঠাৎ বললেন, বড় খাঁটি মানুষ এই নরেন্দ্রনাথ। পূর্ব-পাকিস্তানের আবদুচ্ছে হেডমাস্টার ছিলেন একসময়। দেশ ভাগ হলে ত্রিপুরায় আসেন। আর আমিও মন একটু ভার হলেই ওঁর কাছে আসি।

কিন্তু হায় রে মানুষের মন! নদীরও চলার পথ থাকে একটা;

স্রোতের থাকে, বায়ুর থাকে ; কিন্তু মন কখন্ যে কোন্ পথ ধরে চলবে তা কি কেউ জানি ? যদি জানতাম, তবে পরদিন এত উৎসাহ নিয়ে কসবায় বর্ডার দেখতে গিয়ে হঠাৎ এত বিষণ্ণ হবো কেন ?

ঘটনাটা খুলেই বলি :—

পরদিন। সকালে। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত নিয়ে কথা উঠল।

গোপালবাবু বললেন,—যাও। দেখে এসো একবার। কসবা ঘুরে এসো।

বললাম,—কসবা মানে, কমলাসাগর তো ?

—হ্যাঁ।

—কতবার গেছি ওখানে, দেশ ভাগ হবার আগে। আপনার সঙ্গেও গেছি।

—তা গেছ। কিন্তু সে-যাওয়া আর এ-যাওয়ায় তফাৎ আছে।

—হ্যাঁ, তা তো আছেই। এ হল অন্য ভূমিতে দাঁড়িয়ে জন্ম-ভূমিকে দেখা।

—এবং পুরনোকে নতুন করে পাওয়া, বলেই আবৃত্তি শুরু করলেন গোপালবাবু,

তোমায় নতুন করে পাবো বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ
আমার ভালোবাসার ধন।

—নতুন করে পাবো বলে,—সেদিনই কসবা যেতে যেতে গান ধরে অঞ্জলি। গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলে। হাওড়া নদীর ওপর গড়ে-তোলা সেতুটা পেরিয়ে উদয়পুর রোড্ ধরে এগোয়।

কসবা-পর্বে আমাদের সঙ্গী ঝণ্টু আর পম্পু।

ঝণ্টু ফিজিক্স্-এ অনার্স নিয়ে বীরবিক্রম কলেজে পড়ে। থাকে গোপালবাবুর কাছে। আর পম্পু ওরই বন্ধু ; হায়ার-সেকেণ্ডারী দেবে।

গল্পে মশগুল ওরা। স্ট্যাম্প-কালেক্শান নিয়ে কথা বলছে।

ঝণ্টু বলছিল,—ভুটানের স্ট্যাম্প খুব সুন্দর। পেলে কা'রও সঙ্গে এক্স্চেঞ্জ করি।

পম্পুর জবাব,—করে লাভ নেই। কারণ, সে স্ট্যাম্প তো ব্যবহার করে না ওরা। 'ফরেন এক্স্চেঞ্জ' আর্ন করবে বলে প্রিন্ট করে। আসলে ভারতের যে স্ট্যাম্প, ভুটানেরও তাই।

অবাক হলাম। বছর ষোল বয়সের একটি ছেলে এতো জানে!

কিন্তু তবু বললাম না কিছু। বাইরের দিকে তাকালাম। সামনে, আশে-পাশে ঢেউ-খেলানো প্রান্তর দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

সবুজ—ঘন সবুজ চারিদিক। এক ঘর জিনিসপত্তরের ওপর কলাপাতা রঙের একটা গালিচা বিছানো যেন।

এছাড়া, জিনিসপত্তরও অনেক। গালিচা ফুটো করে উঁকিঝুঁকি মারছে।

চা-বাগান কোথাও ; কোথাও কমলা-বন।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি। ঝণ্টু আর পম্পুর কথাবার্তাও মাঝে মাঝে শুনছি।

মনে হল, প্রসঙ্গ বদল হয়েছে ওদের। সাহিত্য নিয়ে কথা চলছে।

পম্পু বললে—আমি যদি নোবেল কমিটির বিচারক হতুম তো এরিথ ম্যারিয়াকে পুরস্কার দিতে বলতুম। ঝণ্টু জবাব দিলে,—কেন? 'অল্ কোয়ায়েট · ' লিখেছেন বলে?

—নিশ্চয়!—পম্পু উচ্ছ্বসিত একেবারে,—সেদিন কি হয়েছিল, জানো? 'অল্ কোয়ায়েট···' পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছিল আমার।·· খেয়াল করিনি ; বাবার সামনে যেতেই শুধো-লেন,—কী রে? চোখে জল কেন? খানিক আগেই বকেছি বলে? ···হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, সেদিন কী একটা ব্যাপারে বাবা খুব বকেছিলেন।···চোখ মুছতে মুছতে তো বললুম,—কই! জল আবার

কোথায় ?···এদিকে খানিকক্ষণ বাদেই দেখি কি, পেল্লাই এক চকোলেট আমার টেবিলে। বাবা রেখেছেন, ছেলেকে খুশি করবেন বলে।

ঝণ্টু বললে,—বাঃ! ভারি মজা তো! এক কাজ করো তবে। রোজ একবার করে 'অল্ কোয়ায়েট ···' পড়। একটা করে চকোলেট বাঁধা।

পম্পু বললে,—রোজ পড়লে কি আর চোখে জল আসবে?

ভাবলুম,—ঠিক বলেছে ছেলেটা। এই যে দৃশ্য আমার চোখের সামনে, একেও রোজ দেখলে কি আর এতটা ভালো লাগবে?

এতক্ষণে বাঁক ফিরেছে গাড়ি। উত্তর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিমমুখো হয়েছে।

পথ এখন আর ঝকঝকে নয়; জীর্ণ, এবড়ো-খেবড়ো বরং। মনে হল এক সময় হয়তো বা জেল্লা ছিল ওতে, বাহারও ছিল। কিন্তু এখন সব কিছু খুইয়ে কুষ্ঠ-রুগীর দগদগে ঘায়ের চেহারা ধরেছে।

পীচ উঠে গেছে তার জায়গায় জায়গায়। ছোটবড় গর্ত ভেটকীর মুখের মতো হাঁ-করে আছে। ঘাস এখানে-সেখানে। সবত্র রাশি রাশি ধুলো আর ঝরা-পাতা।

বোঝা গেল, এ-পথ পরিত্যক্ত এখন। এ-দিয়ে এখন কেউ বড় একটা যায়-আসে না।

কে যাবে? বর্ডার নাম শুনলেই ভয় পায় সাধারণ লোক। ভাবে, এই বুঝি সীমান্তের ওপার থেকে এক ঝাঁক বুলেট এসে তার হৃৎপিণ্ডটা ঝাঁঝরা করে দেবে।

কিন্তু না। মাভৈঃ! কোনো ভয় নেই এদিকে। কসবার বর্ডারে আজ অবধি গুলি চলে নি। পার্বত্য ত্রিপুরার এদিককার পাহাড়গুলোতে কৃষ্ণচূড়া, জবা, শিমুল ইত্যাদি রাঙা ফুল অনেক ঝরেছে; কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কোনো আঘাত থেকে রাঙা রক্ত কোনোদিন ঝরে নি।

এ-অঞ্চল শান্ত নিরুপদ্রব চিরকাল। পথ চলতে চলতে শান্তির

স্পর্শ পাচ্ছি। যে উপত্যকাটি ধরে এখন চলেছি, ভর-দুপুরেও মনে হচ্ছে, সেখানে মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা।

উপত্যকার দু'পাশে পাহাড়গুলো উঁচু নয় মোটে; কিন্তু মন-কেমন-করা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যাই একটু। ঘুরে আসি। ওদের যে কোনো একটার চূড়ায় উঠি।

পারবো উঠতে। আইস-এক্স, জাঙ্গল্-বুট, দড়ি, মই কিছুই লাগবে না। বারবার শিবির বদল করে ধীরেসুস্থে এগোতে হবে না। ড্রাইভার দ্বিজেন্দ্র যদি অনুমতি দেয় তো এই জীপটাকেই প্রথম ও শেষ শিবির করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যে-কোনো একটা চূড়া জয় করে ফিরতে পারি।

এদিকে গো গো গো গো গো—ঝুপ—গো গো। চলতে চলতে আবার গর্তে পড়ল গাড়ি; আবার উঠল। যা দেখছি, একটু থেমে শৃঙ্গ-বিজয়ের অনুমতি দেয়া তো দূরের কথা, দ্বিজেন্দ্রের গাড়ি-চালাবার উৎসাহ ক্রমেই যেন বাড়ছে; এবং বিশেষ করে জুৎসই গর্ত দেখলেই গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে সে।

—দিক বাড়িয়ে,—নিরুপায় হয়ে শেষকালে ঠিক করলাম,—যা হবার তা হবে।

এদিকে ঝণ্টু ও পম্পুর কথাবার্তা কানে আসছে।

ঝণ্টু বলছে,—তেনজিং কিন্তু সত্যিকারের অভিযাত্রী নন। এভারেস্ট জয় করেই অভিযান ছেড়ে দিলেন।

পম্পু বললে,—ঠিক ঠিক। অভিযাত্রী হলেন হিলারী। এভারেস্টে উঠেই থামলেন না। গেলেন দক্ষিণ-মেরুতে।

ঝণ্টু বললে,—জানো, আমার কাছে দক্ষিণ-মেরুর একটা ছবি আছে। রাশিয়ার এক পেন-ফ্রেণ্ড-এর কাছ থেকে পেয়েছি।

—পেয়েছ!—পম্পু যেন বিস্মিত,—দেবে আমায় দেখতে?

—দিতে পারি,—বললে ঝণ্টু,—তুমি যদি আমায় ভুটানের স্ট্যাম্প দাও!

পম্পু মুরুব্বির মতো বললে,—আবার ভুটান ? এতক্ষণ কী বললুম তবে ?

ঝণ্টু কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আবার একটা ঝাঁকুনি। গাড়ি এক গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠল। ঠ্যাঙ-ভাঙা পাগলা কুকুরের মত কোঁ-কোঁ করতে করতে ছুটলো।

এখন পীচের নামগন্ধও নেই পথে। জায়গায় জায়গায় লাল মাটি আর সুড়কির চিহ্ন। পথের ওপরেই ঘন ঘাস কোথাও. আশ পাশ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়া লতাপাতা।

ভিজে পাটের গন্ধ ভেসে আসছে দূর থেকে। মনে হচ্ছে, পাট-চাষীরা ধারেকাছেই আছে।

হ্যাঁ, ঐ তো একজন। পথের ঠিক পাশেই শোলার একটি আটি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে কী যেন দেখছে।

ওকে পাশ কাটিয়ে তর তর করে নেমে এলাম আমরা। একটি নালার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

এখানে সেতু দুটি। একটি গড়ে উঠছে। আর একটি ভেঙে পড়ছে। অর্থাৎ কিনা, কাজের নয় কোনোটিই।

দ্বিজেন্দ্র বললে,—ভাঙাডার (ভাঙাটার) ডবর (উপর) দিয়াঐ (দিয়েই) যামু।

—যাবে ?—অঞ্জলি রীতিমত আতঙ্কিত। ঝণ্টুও।

দ্বিজেন্দ্রের ভ্রূক্ষেপ নেই।—ঘাবড়ান ক্যান ?—সে বললে,—পটল 'প্লাক'-করা অত সুজা না।

বলেই নালার পাড় ধরে গাড়িটাকে সোজা নামিয়ে দিল সে। ভাঙা, জরাজীর্ণ সেই কাঠের সেতুটার উপর উঠল।

সঙ্গে সঙ্গেই মচমচ, খটখট চারিদিকে। সেতুটার হাড়-পাঁজরা-গুলোর আর্তনাদ শোনা গেল যেন। কোনোক্রমে সেটা পেরোতেই খাড়া পাড় আবার। জলে কাদায় ভীষণ পিছল চারিদিক।

দ্বিজেন্দ্র সেই দুর্গম পাড় ধরেই গাড়ি চালাল। যেন চাবুক মারতে মারতে অবাধ্য কোনো পশুকে খেদাল খানিকক্ষণ।

ক্ষমতা আছে দ্বিজেন্দ্রর। পাড় বেয়ে বেয়ে গাড়িটাকে উপরে তুলল শেষ অবধি। আবার এগোল।

খানিকদূর এগোতেই কসবা বা কমলাসাগর। বিরাট এক দীঘির সামনে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দ্বিজেন্দ্র বললো—আইয়া পড়ছি।

তাড়াতাড়ি জীপ থেকে নামলাম। কমলাসাগরের তীরে এসে দাঁড়ালাম।

চোখ জুড়িয়ে গেল।

টলটল করছে দীঘির জল। দীঘির ধারগুলোতে পদ্ম ফুটে আছে রাশি রাশি। কয়েকটা বক পাড়ে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে।

পাড়গুলো অনেকটা উঁচু, খাড়া। পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) রেল-লাইন চলে গেল পশ্চিম-পাড়ের গা-ঘেঁষে।

সামনেই কসবা স্টেশন। তার মাথার দিকটা দেখতে পাচ্ছি। একটু দূরেই 'সিগন্যাল' দেখছি স্পষ্ট।

হঠাৎ গুম্‌-গুম্‌ শব্দ উঠল একটা।

ঝণ্টু বললে,—ট্রেন আসছে।

এল। খানিক বাদেই আমরা স্পষ্ট দেখলাম, কমলাসাগরের তীর ঘেঁষে হুস্‌-হুস্‌ করতে করতে চলে গেল।

ঝণ্টু বললে,—ইস! ট্রেনটায় উঠতে পারতুম যদি।

পম্পু জানতে চাইল,—কেন? উঠলে কী হ'ত?

—মা-বাবার কাছে যেতুম। বেশি দূরে তো নয়; এখান থেকে মাইল পনেরো দূরেই থাকেন ওঁরা। পাঁচ বছর ওদের দেখিনি।

ঝণ্টুর কথা শুনে মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। ভাবলাম—তা হবে। ভারত-পাকিস্তান লড়াই বছর পাঁচেক আগেই হয়েছিল। সেই থেকে দু'দেশের মধ্যে আসা-যাওয়া বন্ধ।···ঝণ্টু বর্ডার পেরিয়ে সে-সময় ভারতে আসে। দারুণ বেআইনী কাজ করে। অতএব

লুকিয়ে পাকিস্তানে গেলেও এখন আর রেহাই নেই। পুলিশ ওকে দেখলেই গারদে পুরবে।···কী সুন্দর আইন! কী বিচিত্র ব্যবস্থা!

সেই থেকে মনটা ভারী হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে থাকলাম কমলাসাগরের সান-বাঁধানো ঘাটে। অঞ্জলিকে বললাম,—গান ধরো।···তোমায় নতুন করে পাবো বলে······

অঞ্জলি গাইল। একের পর এক অনেকগুলো গান।

তারপর কসবা কালীবাড়ির দিকে এগোলাম। চড়াই এক পথ ধরে বেশ খানিকটা উঠে এলাম।

কালীবাড়ির পরিবেশ শান্ত, স্তব্ধ। ভক্ত নেই, জন-সমাগম নেই। থমথম করছে চারিদিক।

মন্দিরের পাশেই মিলিটারী। ছাউনি ফেলেছে, সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। কালী-মন্দিরের গা-ঘেঁষা উঁচু-মতো একটা জায়গায় সঙীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন।

দাঁড়াবার জায়গাটা সুরক্ষিত। পাহাড় খুঁড়ে ট্রেঞ্চ করা।

ট্রেঞ্চ-এর বাইরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাঁশের খুঁটি। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে জায়গাটাকে মজবুত করার আয়োজন।

ভালো লাগল না। দেব-মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টার বদলে যদি মিলিটারী বুটের আওয়াজ কানে আসে তো কারই বা ভালো লাগে!

ওদিকে ঝণ্টু তাড়া দিচ্ছে,—চলুন। ফেরা যাক। দেরী হলে দ্বিজেন্দ্র আবার রাগ করবে।

ভাবলাম, দ্বিজেন্দ্রের নয়, ঝণ্টুর খাতিরেই ফিরতে হবে এবার। কারণ, এখনই আবার যদি কোনো ট্রেন আসে, কসবা হয়ে যদি এগিয়ে যায়, ঝণ্টু আবার হয়তো বলবে, ইস্! ট্রেনটায় উঠতে পারতুম যদি! ঝণ্টু বলবে, আর আমি মনে মনে অভিশাপ দেবো অপরিণামদর্শী লোভী ও ভণ্ড কিছু রাজনীতিবিদকে।···কাজ নেই। তার চেয়ে আগে-ভাগে সরে পড়ি।

তাই ঝণ্টুকে বললাম,—হ্যাঁ, চলো।

সেদিন আগরতলা ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে।

অথচ কতটুকু আর পথ! বড় জোর তিরিশ মাইল।

পথ খারাপ। তাই ফিরতে দেরী। ফিরে দেখি, গোপালবাবু শ্রীঅরবিন্দ পড়ছেন। পাশেই কে যেন বসে। শুনছেন একমনে।

গোপালবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন,—নাম বললেই চিনবে। আমাদের ক্ষীরোদদা। এখানকার গান্ধী-আশ্রমের সেক্রেটারী। তোমাদের কথা আগেই ওঁকে বলেছি।

ক্ষীরোদদা আমাদের দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার করে বললেন,—বসুন। বসুন।

বসলাম। প্রতি-নমস্কার জানিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকালাম তাঁর দিকে।

ভদ্রলোকের চেহারা যেমন, পোশাক-আশাকও তেমনি অদ্ভুত।

চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে, কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যে-কোন মুহূর্তে। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ্। পুরু ঠোঁট। ভাবলেশহীন, নির্বিকার নিরাসক্ত চেহারা।

পরনে খদ্দরের মোটা ধুতি আর হলদে রঙের পাঞ্জাবী। ময়লা হতে হতে পাঞ্জাবীটা ঠিক যেন চটের থলের চেহারা ধরেছে। হলদে বলে চিনতে কষ্ট হয়।

পরিচয় হতেই ক্ষীরোদদা বললেন,—শুনেছি আপনাদের কথা।

বললাম,—আমরাও শুনেছি। অনেক শুনেছি। ঘরে-বাইরে সর্বত্র। ত্রিপুরার জন্যে অনেক কিছু করেছেন আপনি।

—কিছুই করিনি,—ক্ষীরোদদার দৃঢ় প্রতিবাদ,—যা শুনেছেন, সব ভুল। মিথ্যে। কিছু করলে দেশের এই অবস্থা হয়?

শুধালাম,—এদিকেও গণ্ডগোল নাকি? এই—হাঙ্গামা-টাঙ্গামা?

ক্ষীরোদদা বললেন,—হোক না! হলে তো ভালোই। তরুণ বিপ্লবীরা যদি এসে আমাদের খুন করে তো বুঝবো, চরম পুরস্কার পেয়েছি।

বললাম,—ঠিক বোঝা গেল না। কী বলতে চান আপনি?

—আমি বলতে চাই,—ক্ষীরোদদার চোখ দিয়ে আগুন ঝরল যেন,—আমরা গান্ধীবাদীরা ভণ্ডামি করেছি এতকাল। গান্ধীজীর ছবি সামনে রেখে নিজেরা যখন চুরি-জোচ্চুরি আর ভোগে মগ্ন, দেশের লোককে তখন বলেছি, ত্যাগ করো।···ত্যাগ এই এতদিন ধরে ওরা করেছে। কিন্তু আর নয়; এবার ওরা ধরে ফেলেছে আমাদের।

বিস্মিত হলাম। অকৃতদার, প্রবীণ-পরিণত কোনো গান্ধীবাদীর কথা শুনছি? না কি তাঁর মুখ দিয়ে অন্য কেউ কথা বলছেন?

এদিকে ক্ষীরোদদা তখনও থামেন নি; বলে চলেছেন,—গান্ধীজীকে গড্‌সে খুন করেনি; করেছে তাঁর কিছু চ্যালা। গান্ধী-টুপি মাথায় দিয়ে দেশকে শোষণ করতে করতে ওরা শ্লোগান তুলেছে, জয়! গণতন্ত্রের জয়! বাণী দিয়েছে,—জয়! কৃষাণ-মজদুরের জয়!···অথচ কাজের কাজ কিছুই করেনি। কাজ···

গোপালবাবু বাধা দিলেন এইখানে,—ক্ষীরোদদা। আপনি যে তরুণ বিপ্লবীর মতো কথা বলছেন!

—হ্যাঁ, বলছি-ই তো!—ক্ষীরোদদার স্পষ্ট জবাব,—কিন্তু কী অন্যায়টা বলছি, দেখিয়ে দিন।

দেখাতে কেউই পারলাম না। অগত্যা অন্য প্রসঙ্গ তুললাম। ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে কথা উঠতেই ক্ষীরোদদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। সে-জন্যই এসেছিলাম। গোপালদার কাছে ইতিহাসের কিছু মশলা রইল; দেখবেন, যদি কাজে লাগাতে পারেন। উনি বলছিলেন, এগুলো খুব নাকি দরকার আপনার। ভ্রমণ-কাহিনী লিখবেন নাকি।

বললাম,—হ্যাঁ, ইচ্ছে তো আছে।

ক্ষীরোদদা অভয় দিলেন,—তাহলেই হবে। কিন্তু দেখবেন, ফাঁকি না হয় যেন! ভ্রমণ-কাহিনীর নামে রোম্যান্স্ না হয়!

আশ্চর্য! অদ্ভুত তো লোকটি!—ক্ষীরোদদা চলে যেতেই ভাবতে বসি। এবং তারপর কখন একসময় হুমড়ি খেয়ে পড়ি তাঁরই দেয়া মশলাগুলোর ওপর।

পড়ে ভালোই হয়েছিল। পরদিন 'চতুর্দশ দেবতা বাড়ি' দেখতে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হয়নি। রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়েও বুঝতে অসুবিধে হয়নি কিছু।

চতুর্দশ দেবতার মন্দির আগরতলা শহর থেকে খানিকটা দূরে। মন্দিরটিও 'আহা মরি' কিছু নয়। তবে বিগ্রহের মধ্যে কিছু অভিনবত্ব আছে বৈকি! সত্যি চোদ্দ রকম দেবতা আছেন সেখানে। আছেন (১) হর (শিব), (২) উমা (দুর্গা), (৩) হরি (বিষ্ণু), (৪) মা (লক্ষ্মী), (৫) বাণী (সরস্বতী), (৬) কুমার (কার্তিক), (৭) গণপতি (গণেশ), (৮) বিধু (চন্দ্র), (৯) ব্রহ্মা, (১০) অবধি (সমুদ্র ও জলের দেবতা), (১১) গঙ্গা, (১২) শেখি (অগ্নি), (১৩) কাম এবং (১৪) হিমাদ্রি (হিমালয়) পর্যন্ত।

বিগ্রহদের প্রতিটিই অপূর্ব। পূজারী একজন বুঝিয়ে দিলেন, আট রকম পবিত্র ও মূল্যবান-ধাতু মিলিয়ে-মিশিয়ে এরা তৈরী।

শুধিয়েছিলাম,—যেমন ?

পূজারী উদাহরণ দিতে গিয়ে আটটি ধাতুরই ফিরিস্তি দিয়েছিলেন, গুনে গুনে বলেছিলেন,—সোনা, রূপো, সীসে, টিন, তামা, লোহা, এন্টিমনি এবং দস্তা।

—কে গড়েছেন এই মন্দির ?

—ত্রিলোচন! সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন পূজারী।

—ত্রিলোচন!—মুহূর্তে অন্যমনস্ক হই যেন। ক্ষীরোদদার কাছে

থেকে পাওয়া মশলাগুলোকে চোখের সামনে ভাসতে দেখি।···হ্যাঁ, পেয়েছি। ত্রিলোচন ছিলেন ত্রিপুরের পুত্র। এ-রাজ্যের ত্রিপুরা নাম ত্রিলোচনের পিতারই দেয়া। আগে এর নাম ছিল কিরাট দেশ। কিংবদন্তী বলে, এ-দেশের রাজারা চন্দ্রবংশীয় দ্রুহ্যর (Druhya) বংশধর। দ্রুহ্যর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন বভ্রু। প্রবাদ আছে, মহর্ষি কপিল যথোচিত উৎসব করে তাঁকে মহারাজা উপাধি দিয়েছিলেন। সেই থেকে বভ্রুর পরবর্তী শাসকরা সকলেই মহারাজা। তবে এঁদের মধ্যে আবার স্বতন্ত্র তাঁর পঞ্চদশ উত্তরপুরুষ প্রতসেন। লোকে বলে, তিনি নাকি অযোধ্যার রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। বভ্রুর আর এক উত্তরপুরুষ মহারাজা দৈত্যও কম যান না। কিংবদন্তী তো তাঁর কথায় সহস্রমুখ। তিনি নাকি ধনুর্বিদ্যা শেখেন দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামার কাছ থেকে। পূর্ব-পুরুষদের হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে রাজ্যকে সুরক্ষিত করার কৃতিত্বও তাঁরই। আবার তারই বংশধর ত্রিপুর; যিনি নাকি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন। ত্রিপুরের পুত্র ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন।···সেই ত্রিলোচন? তিনি গড়েছেন এই চতুর্দশ দেবতার মন্দির?···অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে তাকাই। আলো-ঝলমল অতি বাস্তব বর্তমান থেকে মহাভারতের অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য জগতে অভিসার করি যেন।

—কর্তা! পূজারীর ডাক শুনে চমক ভাঙ্গে। চতুর্দশ মন্দিরের বিশেষ একটা জায়গা দেখিয়ে তিনি বলেন,—কর্তা, দেখুন একটু। এই যে, এইখানে। অনেক নরবলি হ'ত এক সময়।

এগিয়ে গিয়ে জায়গাটার উপর ঝুঁকে পড়ে বললাম,—নরবলি হ'ত? এইখানে? বিশ্বাস হয় না কিন্তু।

—হ্যাঁ কর্তা, হ'ত! শতে শতে,—পূজারীর কণ্ঠস্বরে গভীর প্রত্যয়,—কী জানেন, এক সময় মুঘলরা ত্রিপুরা আক্রমণ করেছে বারবার। প্রচণ্ড লড়াই করেছে। কিন্তু জিততে পারেনি। যুদ্ধে

হেরে গিয়ে ত্রিপুরীদের হাতে বন্দী হয়েছে। তারপর সারি বেঁধে এসেছে এইখানে—এই মন্দিরে।···

চতুর্দশ দেবতার কাছে বলি হয়েছে একে একে। পূজারী আগে থাকতেই খাঁড়া নিয়ে প্রস্তুত থাকতেন। দেবতা প্রসন্ন হবেন ভেবে ভক্তরাও জড়ো হতেন ঠিক। নরবলি দেখতেন।

—দেখতেন? সত্যি?—পূজারীকে নয়, নিজের মনকেই প্রশ্ন করলাম এবার। ক্ষীরোদদার দেয়া ইতিহাসের উপকরণগুলো মনে মনে তল্লাস করলাম।···একবার মনে হল, ঠিক; ঠিক কথাই বলেছেন পূজারী। তবে শুধু মুঘলরা নয়, গৌড়ের মুসলমান সৈন্যরাও বলি হয়েছে কত সময়। ত্রিপুরার সঙ্গে গৌড়ের শাহেনশাহর সংঘাত বেঁধেছে। মুসলমান সৈন্যরা সারি-বাঁধা পিঁপড়ের মতো এগিয়েছে ত্রিপুরার বন-জঙ্গল ধরে। আর এই চতুর্দশ দেবতা মন্দিরের পুরোহিত বলেছেন,—এগোক। আর একটু এগোক ওরা। তারপরেই কাঠ-গড়া মেরামত করবো। 'খাঁড়ায় শান দেবো।··

একবার উল্টো ঘটনাও ঘটেছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের পর প্রগাঢ় শান্তি নামার মতো ঘটনা। সেবার ত্রিপুরার এক যুবরাজ রত্ন ফা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল গৌড়েরই দরবারে। গৌড়ের রাজা তো যুবরাজকে দেখে খুব খুশি। বললেন, —কুছ্ পরোয়া নেই।' আমি আছি।···তা থাকলেন তিনি। রত্ন ফা'কে সাহায্য করলেন ত্রিপুরার সিংহাসনে বসতে। আর এই দেব-মন্দিরের পুরোহিত বললেন,—খাঁড়া এখন তবে অন্য কাজে লাগবে। যা দিয়ে নরবলি হ'ত, তা দিয়েই পশুবলি হবে এখন। আনন্দোৎসব হবে।

—কর্তা! পূজারীর ডাক শুনে চমকে উঠি আবার। স্তব্ধ বিস্ময়ে চারিদিকে তাকাই।

—কর্তা! ভোগ হবে এখন। দেবতার আহার হবে। পূজারী গম্ভীর কণ্ঠে জানান।

বললাম,—বেশ তো! ফেরা যাক তবে।

সেদিন ফেরবার পথে ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদ দেখলাম; আগরতলা শহরের একেবারে মাঝখানে। 'উজ্জয়ন্ত প্যালেস' এর নাম। রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এটি গড়েছিলেন। কিন্তু এ কী? রাজধানীর চরম দারিদ্র্যের মাঝখানে মূর্তিমান এত বড় ঐশ্বর্য? প্রায় আধ বর্গমাইল জায়গা জোড়া চোখ-ঝলসানো রাজ-মহল? তার সামনেই বিরাট দু'টি দীঘি। মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেল রাজমহলের সিংহদ্বার অবধি। পথের দু'ধারে ফুলবাগিচা আবার! কত রকম বাহারি ফুলের জেল্লা!

রাধাকিশোর অত্যাচারী ছিলেন না তো? প্রজাদের শোষণ করে এই ইমারৎ গড়েননি তো তিনি? এই দীঘি লক্ষ ত্রিপুরীর চোখের জলের সাক্ষী বলেই এত স্বচ্ছ আর টলটলে নয় তো?

কে জানে! তবে রাধাকিশোরের পূর্বসূরী বীরচন্দ্র মাণিক্য প্রজানুরঞ্জক ও সুন্দরের উপাসক ছিলেন। ত্রিপুরায় নবযুগের সূচনা হল তাঁরই সময় থেকে বলতে গেলে। তিনি দাসত্বপ্রথা উঠিয়ে দিলেন। শাসনকার্যে পাশ্চাত্য রীতি প্রবর্তন করলেন; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে মর্যাদা দিলেন।

অথচ রবীন্দ্রনাথ তখনও বিশ্বকবি হন নি। তখন সবেমাত্র 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হয়েছে। তরুণ কবির আনন্দ ও বিষাদের অস্ফুট, মৃদু কিছু গুঞ্জরণ আভাসিত হয়েছে ওতে।...

বীরচন্দ্র ওই 'ভগ্নহৃদয়' পড়েই খুশি। শুধু খুশি বললে ভুল হয়; মুগ্ধ, আত্মহারা একেবারে। তিনি ওর মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন। চিরকালের সত্যেরও স্পর্শ পেলেন বুঝি।

বীরচন্দ্র তখন ঠিক এইরকমই কিছু একটা খুঁজছিলেন। কারণ, তাঁরও হৃদয় তখন ভগ্ন। কিছুদিন মাত্র আগে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভানুমতী পরলোকগমন করেছেন। সাধ্বী মহিষীর

তিরোধানে মহারাজের কাছে দুনিয়াটা বিরাট এক ফাঁকি বলে বোধ হচ্ছে। এমন সময়—ঠিক এমন সময় 'ভগ্নহৃদয়' হাতে এল বীরচন্দ্রের। দুঃখের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে সান্ত্বনা যেন মূর্তিমান দীপশিখা হয়ে দেখা দিল।

বীরচন্দ্র তাঁর এক মন্ত্রীকে পাঠালেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। নির্দেশ দিলেন কবিকে বলতে যে, 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে তিনি মুগ্ধ। কবি যে ভবিষ্যতে খুব বড় হবেন, এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তাঁর।

মন্ত্রী যথাসময়ে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাধাকিশোর? তাঁর কাছেও কি বার্তা এসেছিল কিছু? সৌন্দর্যদৃষ্টি তিনি লাভ করেছিলেন পুরুষানুক্রমে?

জানি না। বিরাট-বিপুল এই রাজপ্রাসাদে আজ আর কোনো প্রমাণ নেই তার। আজ চারিদিক স্তব্ধ, নিঝুম। হাতিশাল খাঁ খাঁ করছে। ঘোড়াশালে রাস্তার কিছু কুকুর বাসা বেঁধেছে। অতি-সুন্দর হাওয়া-ঘরের পিরামিড আকারের ছাদটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। দোতলা প্রাসাদটাকে মনে হচ্ছে, রূপকথার দেশের ঘুমন্ত কোনো রাজপুরী। শুধুমাত্র সোনার কাঠি ছোঁয়াবার অপেক্ষা। আবার জাগবে সব। চারতলা গম্বুজটার চূড়ায় প্রহরী উঠবে। ভীমকায় রাজরক্ষীরা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করবে। দৌবারিক ঘণ্টা বাজাবে। সিংহদ্বারের দিকে একে একে এগিয়ে যাবে হাতির মিছিল। মাহুত এগিয়ে গিয়ে মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বলবে,—জনাব। ফরমাইয়ে।

কিন্তু কোথায় জনাব? আমাদের সাড়া পেয়ে জনাবের নিঝুমপুরী থেকে কয়েকটা পায়রা উড়ে গেল। দু'টো দাঁড়কাক একটানা কা-কা শব্দ করে যেন বলতে লাগল,—যা যা এখনই।

ভাবলাম,—সত্যিই তো! যাই না কেন? কী এত দেখছি? যারা গেছে তারা ভালোর জন্যই গেছে। প্রজাদের দুঃখ দিয়ে ইমারৎ গড়ে সুখী হবার দিন যে আর নেই।

নেই। নেই। নেই।···আকাশ-বাতাস যেন একসঙ্গে কথা কইল সেদিন। বিরাট দীঘির জলে রাজপ্রাসাদের প্রতিবিম্ব কাঁপতে কাঁপতে যেন ঠিক আমার দিকে এগিয়ে এল।

ঠিক করলাম,—আর নয়। এবার পালিয়ে বাঁচি এখান থেকে। ঘরে ফিরি।

কিন্তু ফিরবো কোথায়? কোথায় পালাবো? নীড়মহল দেখতে গিয়েও ঠিক এই একই উপদ্রব।

অথচ কত কষ্ট করে গেছি সেখানে! আগরতলা থেকে পাক্কা ৩৩ মাইল পথ জীপে পাড়ি দিয়েছি। রুদ্রসাগর নামক বিরাট দীঘিটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি শরতের এক অপরাহ্নে। দীঘির মাঝখানে নীড়মহল। নৌকোয় চেপে রুদ্রসাগর পেরিয়ে ওখানে যেতে হয়।

গেলাম। ভাঙা নৌকোয় জল বাড়তে লাগল যত, নীড়মহলও ততই সামনে এগিয়ে এল।

কিন্তু এ কেমনতরো মহল? পাতালপুরী থেকে হঠাৎ উঠে-আসা আজগুবি কিছু? এই আছে, এই নেই—এমনিতরো কিছু ভোজবাজী? পাতালপুরীর রাজকন্যে আছেন বুঝি ওখানে? পড়ন্ত সূর্যালোকে হীরের কাঁকই দিয়ে চুল আচড়াবার সময় আয়নায় মুখ দেখবেন বুঝি তিনি? দেখেই প্রাসাদটিকে নিয়ে ঝুপ করে আবার জলের অতলে তলিয়ে যাবেন?

কই! গেলেন না তো! নীড়মহল গিয়ে দেখি, রাজকন্যে নেই, রাজমহিষী নেই; অন্য কিছু আছে।

—মহারাজ! একটা আয়না কিনে দেবেন?—কবে কোন্ এক রাজমহিষী নাকি বলেছিলেন।

—আয়না! মহারাজ অবাক,—অনেক তো আয়না আছে রাজপ্রাসাদে?

—ওগুলো ছোট, আরও বড় চাই।

—বেশ! বড়ই হবে,—বলে মহারাজ কী যেন ভাবলেন একবার। পারিষদদের ডেকে নির্দেশ দিলেন,—মহল গড়ো। রাজা-রাণীর নীড়। হ্রদের মাঝখানে হবে সেটা। নীড়মহলে দাঁড়িয়ে রাণী যেন হ্রদের জলে মুখ দেখতে পান। বড়সড় আয়না না হলে বেচারীর নাকি আর চলছে না।

পারিষদরা বললেন,—তথাস্তু!

ব্যস। গড়ে উঠল বিরাট মহল। জলসা-ঘর বসল। দূর-দূরান্তর থেকে নর্তকীরা এল। সারা রাত ধরে কত রোশনাই হল।

মহারাজ এইবার তাঁর মহিষীকে শুধোলেন,—খুশী?

মহিষী বললেন,—হ্যাঁ।

—আয়নায় মুখ দেখা যাচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—বেশ বড় গোছের হয়েছে আয়নাটা?

—হ্যাঁ, বলেই মহিষী মহারাজের বুকের উপর লুটিয়ে পড়লেন, এত সুখ আমার! এত তৃপ্তি! ইচ্ছে করে, সারা রাত এই হ্রদের বুকে ঘুরে বেড়াই।

মহারাজ বললেন, ·বেশ তো!

এদিকে মহিষী ভয় পেয়েছেন,—বিপদ-আপদ হয় যদি?

—বিপদ-আপদ? 'হা হা' করে হেসে উঠলেন মহারাজ। মহিষীকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—আমি থাকতে?

মহিষী বললেন,—ঠিক। ঠিক কথা। বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন তিনিও।

হা হা। হা হা।··আজও যেন শুনতে পাচ্ছি সেই হাসি। আমাদের সাড়া পেয়ে দু'টো পায়রা হঠাৎ ঠিক ঐরকম শব্দ করে হ্রদের উপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

—মহারাজ! একটা আয়না কিনে দেবেন?···

রুদ্রসাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে নীড়মহলে। ঢেউ কথা কইছে যেন।

—মহারাজ! একটা আয়না কিনে দেবেন?

দমকা হাওয়া নীড়মহলকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুটছে। হাওয়া কথা কইছে।

—মহারাজ! একটা আয়না কিনে দেবেন?

আমরা সিঁড়ি বেয়ে নামছি। আমাদের চলার শব্দে ঐ একই কথা।

ভাবলাম, এখানেও আর নয়। পালিয়ে বাঁচি এই অভিশপ্ত নীড়মহল থেকে।

নীড়মহলের পর বনমহল। পরদিন আরণ্যক ত্রিপুরার পাহাড়ীয়া পথ ধরে দিব্যাভিসার। গোমতী নদীর উৎস দেখবো বলে ডম্বুর যাত্রা।

এ-পথ দুর্গম, আকাবাঁকা। ভীষণ চড়াই-উৎরাই এদিকে। পাশেই হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে-থাকা মহীরুহদের মিছিল।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। পার্বত্য ত্রিপুরার এক একটি গিরিশ্রেণীকে অবলীলাক্রমে ডিঙিয়ে যাই।

ধর্মনগর আর কয়লাশহর যেতেও ডিঙোতে হয় ওদের। তবে সব মিলিয়ে আজ যখন ঐ গিরিশ্রেণীর কথা ভাবি, তখন পাহাড়পুরী ত্রিপুরার অখণ্ড এক ছবিই ভেসে ওঠে আমার সামনে।

আমি দেখতে পাই, ছ'টি প্রধান গিরিশ্রেণী রক্তবাহী ছ'টি শিরার মতো এ-রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেল। শিরাগুলোর বাঁদিক একটু স্ফীত। অর্থাৎ কিনা, পশ্চিম থেকে পুবে ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠল ওরা।

একটানা উঠল না। গিরিশ্রেণীদের একটি অন্যটি থেকে উল্লেখযোগ্য দূরত্বে। অন্ততঃ দশ থেকে পনেরো মাইলের বিরহ আদ্যিকাল থেকে ওরা ভোগ করছে।

পশ্চিমদিক থেকে এগোলে গুরুত্বপূর্ণ যে পর্বতশ্রেণীটি প্রথমেই অভ্যর্থনা করবে আপনাকে, ত্রিপুরার লোকেরা তাকে বলে আঠারোমুরা। এর সর্বোচ্চ শিখর জারিমুরা দেড় হাজার ফুট উঁচু।

জারিমুরা পেরিয়ে খানিক দূর এগোন; ঢেউ-খেলানো লাংতরাই গিরিশ্রেণী। প্রায় ষোল শ ফুট উঁচু ফেংপুইকে শিরোভূষণ করে আজও সে রহস্যময়।

লাংতরাই-এর পর শাখান্‌ত্‌লং। প্রথম-দর্শনেই বুঝবেন, আগে যাদের পেরিয়ে এলেন, তাদের তুলনায় অনেক উঁচু সে; অনেক উদ্ধত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আড়াই হাজার ফুট উঁচু শখনকে নিয়ে সে মেঘলোক ছুঁই ছুঁই করছে।

শাখান্‌ত্‌লং-এর পর জাম্পঐ। এর খুব উঁচু অংশগুলো পেরোতে হয়তো বা একটু-আধটু শীত লাগবে আপনার। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বেট্‌লিং শিবকে দেখে মনে হবে, ত্রিপুরার পার্বত্য নামটি সাথক।

হ্যাঁ, সার্থক তো বটেই। আলবাৎ সার্থক;—ডম্বুর যেতে যেতে সেদিন ভাবি,—পশ্চিম-সীমান্তে রাজধানী আগরতলাকে মাঝখানে রেখে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর উঁচু-নীচু, ঢেউ-খেলানো কিছু জায়গা বাদ দিলে এবং উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-সীমান্তের সরু এক ফালি নীচু অঞ্চলকে হিসেবের মধ্যে না আনলে গোটা রাজ্যটিকেই 'পার্বত্য' আখ্যা দেয়া চলে।

কী পাহাড়, কী পাহাড় এই রাজ্যে! কত যে পাহাড়ীয়া খরস্রোতা! ডম্বুর যেতে, বিলোনিয়া কয়লাশহর ধর্মনগর খোয়াই ও উদয়পুর যেতে কত যে অপরূপাকে কল্‌কল্ খল্‌খল করে ছুটে যেতে দেখি!

খোয়াই ছুটছে কোথাও; কোথাও বা দোলাই। জুরির জারিজুরি কোথাও; কোথাও আবার মুহরীর মোহজাল। খেয়ালী ফেণী কোথাও; কোথাও বা ক্ষ্যাপা মনু। ভৈরবী গোমতী কোথাও, কোথাও বা রহস্যময়ী লঙ্গৈ।

ছুটছে ওরা। সবাই ছুটছে। নাচতে নাচতে, দুলতে দুলতে কেউ চলেছে মেঘনায়; কেউ বা বঙ্গোপসাগরে।

ডম্বুর যেতে ওদেরই কী একটাকে যেন পেরিয়ে এলাম হঠাৎ। আশে-পাশের বন-জঙ্গলের দিকে তাকালাম।

চোখ জুড়িয়ে গেল। দেখি, পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাঁশ-বন। নীচু অঞ্চলগুলোতে ঘন ঘাস। চারিদিক ঘন সবুজ। শান্ত স্তব্ধ বনমহল। জমাট বরফের মতো শান্তিকে কেটে কেটে আমরাই শুধু এগোচ্ছি। আমাদের জীপটা গর্জন করছে অবিরাম। মার-খাওয়া হিংস্র কোনো জানোয়ার গোঙাচ্ছে যেন।

ডম্বুর পৌঁছে দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস ফেলে জানোয়ারটা দাঁড়িয়ে গেল। রূপকথার কোনো ঘুমন্ত রাজপুরীকে ডিঙিয়ে এসে হাঁপ ছাড়ল যেন।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামলাম। খানিকটা এগোতেই ডম্বুর জলপ্রপাত : গোমতী নদীর উৎস।

নদী এখানে এসে ঝাঁপ দিল। পাহাড় বেয়ে চলতে চলতে এক লাফে খানিকটা নীচে নামল।

গর্জন শুনতে পাচ্ছি নদীর। মত্ত মাতঙ্গিনীর মতো ভৈরব-উল্লাসে ছুটছে। নিজের চারিদিকে মেঘজাল রচনা করে ঘোর-গর্জনে লুটিয়ে পড়ছে রুদ্রচণ্ডী।

এখানে এসে একসঙ্গে অনেকটা পড়ছে সে। তাই মেঘবরণ জলের কুচি সহজেই তার ওড়না হয়েছে।

আশে-পাশের বনপবত রাজনর্তকীর নাচন দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে-যাওয়া দর্শকের মতো সহজেই তার সাক্ষী হয়েছে।

একটু দূরেই হ্রদমতো একটা জায়গা। লোকে এ-জায়গাটাকে বলে তীর্থমুখ। বলে, এ-থেকেই গোমতী বেরিয়ে এল।

প্রতি বছর উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির দিনে শত শত লোক আসে এখানে; হ্রদে স্নান করে।

থাকবার কষ্ট খুব। কিন্তু তাতে কী! নৌকোয় থাকে কেউ;

কেউ বা তীর্থমুখের পাশেই অস্থায়ী ঘর বাঁধে। উৎসাহে-আনন্দে, প্রার্থনায়-তর্পণে মুখরিত করে বনভূমি।

তবে বিপদ-আপদও হয় এক একসময়। দুর্ঘটনা হিংস্র নেকড়ের মতো আড়াল থেকে এসে নিরীহ অসহায় মানুষের টুঁটি চেপে ধরে।

এই তো, সেদিন—

গোপালবাবু বলেছিলেন,—এই সেদিন। কুঞ্জবনের বিধবা সুভদ্রা, ভম্বুর গেল পুণ্যি করতে। তীর্থমুখে স্নান করতে।···স্নান সে করল। কিন্তু ঘরে ফিরল দু'টির মধ্যে একটি ফুসফুস নিয়ে।···একমাত্র মেয়েটিকে তীর্থমুখে বিসর্জন দিল সে।···শুনেছি, স্নানের সময় কীএকটা ব্যাপারে নাকি দুই দল ভক্তের মধ্যে বচসা। বচসা থেকে মারামারি। ভক্তদের ছোটাছুটি। কে কা'র আগে পালাবে, তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি রীতিমত। সুভদ্রার পাঁচ বছরের মেয়ে ছন্দারিসা। ভিড়ের মধ্যে টাল সামলাতে পারল না। পড়ে গেল। ভক্তরা ছুটল তার ওপর দিয়ে। একে তীর্থমুখের সংলগ্ন কাদামাটি, তায় আবার ওপর থেকে চাপ। অতএব, বেশিক্ষণ সময় লাগল না। তীর্থমুখের কাছেই জীবন্ত সমাধি হল ছন্দারিসার। না, সুভদ্রা ছাড়া কেউ চেষ্টা করেনি ওকে বাঁচাতে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু সুভদ্রাই বা পারবে কেন? হাজার লোকের ভিড় ঠেলে এগোন কি সোজা কথা?··· দু'টির মধ্যে একটি ফুসফুস নিয়ে সুভদ্রা ঘরে ফিরল। সবাই বললো, —দুঃখ করো না। যা'র জিনিস তিনি হাত পেতে নিয়েছেন। তুমি দিয়ে ধন্য। আবার দিলে কোথায়?—না তীর্থমুখে। কখন দিলে? —না মকর-সংক্রান্তির পুণ্যদিনে। স্বর্গ তো হাতের একেবারে মুঠোয় এল গো, তোমার।··'এলো'?—সুভদ্রা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়,—কিন্তু ছন্দারিসা! তাকে ছেড়ে স্বর্গে যেতেও যে আমার দুঃখু হয় গো!

গল্পটার এই অবধি বলে গোপালবাবু মন্তব্য করেছিলেন,— সুভদ্রাকে দেখে আর এই সব শুনে আমার কী মনে হয়েছিল

জানো ?…মনে হয়েছিল, ত্রিপুরার পটভূমিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক। জয়সিংহ বলছে,

মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহু যত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দির বাহিরে
অনাদরে,… ……

গল্প আর এই উদ্ধৃতি শুনে ভাবলাম, তাই বটে। সত্যকে তাড়িয়ে দেয়াই বটে। তা না হলে পাঁচ বছরের একরত্তি এক শিশু এত-গুলো লোকের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মরে ? কেউ দেখেও দেখে না ? বাঁচাবার চেষ্টা করে না ?

মনটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। গোমতীর ভৈরব-উল্লাসকে আর্তনাদ বলে মনে হল হঠাৎ।

ওদিকে জীপ-ড্রাইভার দ্বিজেন্দ্র তাড়া দিচ্ছে,—ছাখলেন ত ? চলেন এলা (এবার চলুন)।

অঞ্জলি বললে,—কী নাকি হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট হচ্ছে এদিকে ? ওটা না দেখেই ?

দ্বিজেন্দ্র জবাব দেয়,—কী ছাখবেন ? ইল্‌টিরিক সুএচে (সুইচে) বুতাম টিপলে কুট্‌স কইরা বাতি জ্বলে, ছাখেন নাই ? এই তাইনও (ইনিও) অক্করে (একেবারে) হেইরকম (সেইরকম)।

দ্বিজেন্দ্রর সরল ব্যাখ্যা মেনে নিলাম অগত্যা। ডম্বুরকে পেছনে ফেলে এগোলাম।

গোমতীর আর্তনাদ ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল। আরণ্যক ত্রিপুরার রাজসূয় অভ্যর্থনা শুরু হল আবার।

সেদিন ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। অনেকখানি পথ। ডম্বুর থেকে আগরতলা একশো মাইলেরও বেশি। তাই সময় নিল ফিরতে।

ফিরে দেখি, সুদর্শন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক ভদ্রলোক। আমাদেরই সঙ্গে দেখা করবেন বলে বসে।

গোপালবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোকের নাম শক্তিপদ চক্রবর্তী। ত্রিপুরার শিক্ষা-বিভাগে কাজ করেন। ডেপুটি ডিরেক্টার। সমাজকল্যাণ শাখার ভারপ্রাপ্ত।

পরিচয় হতেই লাফিয়ে উঠলেন শক্তিপদবাবু,—দেখুন দেখি কাণ্ড! আপনাদেরই জন্যে সাতটা থেকে বসে। সেই কবে এসেছেন! অথচ গোপালদা কিছুই বলেন নি। কী অন্যায়, বলুন তো?

বললাম,—সুযোগ পান নি বলবার। সারাক্ষণ আমাদের নিয়ে ঘুরছেন কিনা!

—ঘুরছেন, তা'ও শুনেছি;—শক্তিবাবু বলতে লাগলেন,—ড্রাইভার দ্বিজেন্দ্র সব বলেছে। কাল দেখা ওর সঙ্গে। আপনাদের সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রর কী অভিমত, জানেন তো?

কইলকাতার থিক্যা (থেকে) আইছে। খালি আকামে (অকাজে) ঘুরে।

বললাম,—তা ঠিক। কম তো আর ঘুরছি না। আর তা ছাড়া, ধকলটাও ওর ওপর দিয়েই যাচ্ছে।

শক্তিবাবু বললেন,—এবার থেকে ধকল আমিও 'শেয়ার' করবো না হয়। সাধ্যমত ঘুরবো আপনাদের সঙ্গে।

অবাক হয়ে বললাম,—আপনি?

—হ্যাঁ, আমি।

—সময় পাবেন?

—করে নিতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা; আপনাদের 'নেক্স্ট প্রোগ্রাম' কী?

—উদয়পুর।

—কবে?

—কাল।

—কখন ?

—দুপুরের দিকে। এই ধরুন, দু'টো নাগাদ।

—ব্যস্। ঠিক রইল। আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।

অবাক হলাম। প্রথম আলাপেই এমন সহৃদয়তা জীবনে খুব কম লোকের কাছে পেয়েছি।

কিন্তু থাক সে-কথা ; উদয়পুরের কথা বলি।

পরদিন। ভর-দুপুরে বেরোলাম। শক্তিবাবু সঙ্গে থেকে সব বুঝিয়ে দিলেন।

—এই হল গোকুলপুর,—আগরতলা ছাড়িয়ে খানিকদূর আসতেই তিনি শুরু করেন,—

অনেক উদ্বাস্তু আছে এখানে। জায়গাটা এখন দ্রুত বাড়ছে।

—বাড়ছে ?—শক্তিবাবুর কথা শুনে আশে-পাশে তাকাই। না-শহর না-গ্রাম শ্রীহীন দরিদ্র একটি এলাকা চোখে পড়ে।

গোকুলপুরে দাঁড়াইনি আমরা। ছুটেছি। ছোট্ট কোনো স্টেশনের ওপর দিয়ে হু হু করে যাওয়া মেইল-ট্রেনের মতো।

গোকুলপুর পেরিয়ে আবার সেই ঢেউ-খেলানো প্রান্তর। সেই কৃষিক্ষেত্র।

না, আরণ্যক ত্রিপুরার কোনো চিহ্ন এদিকে নেই। পাহাড়-পর্বতও নেই-ই বলতে গেলে। এদিককার চেহারা অনেকটা প্রতিবেশী জেলা কুমিল্লা বা ময়মনসিংহের মতো।

—এই যে, সামনেই বিশালগড় ;—এতক্ষণে আরও খানিকটা এগিয়েছি ; শক্তিবাবু শুরু করেছেন,—চেহারার দিক থেকে নয়, গুণের দিক থেকে এ সার্থকনামা।

শুধালাম,—কী রকম ?

শক্তিবাবু বুঝিয়ে দিলেন,—হৃদয় বিশাল আর কী। স্বাধীনতা

আন্দোলনে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছে। আসলে উদয়পুর ছিল ঘাঁটি। বিপ্লবীরা অসুবিধে বুঝলেই পালাতেন ওখান থেকে। বিশালগড়ে আশ্রয় নিতেন। এখানকার লোকেরা জীবন বিপন্ন করেছে কত সময়। সর্বনাশের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছে। একবার—

শক্তিবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। অকথ্য কিছু গালিগালাজ কানে এলো। দেখি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছু তরুণ। আমাদের তাক করেই ওগুলো ছুঁড়ছে।

এদিকে দ্বিজেন্দ্র গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। মেইল-ট্রেন নয়, রকেটের বেগে ছুটছে জীপ।

শুধালাম,—ব্যাপার কী, দ্বিজেন্দ্র ?

—চান্দা (চাঁদা) চায় ; কালীপূজার চান্দা,—দ্বিজেন্দ্র ব্যাখ্যা করে,—গাড়ি থামাইতে কইছিল। আমি হুনি (শুনি) নাই।

—শোন নি, বেশ করেছ। প্রথমে শক্তিবাবু এবং তারপরে আমি বাহবা দিলাম দ্বিজেন্দ্রকে।

এদিকে শক্তিবাবু থামেননি তখনও। একটু পরেই শুরু করেছেন, —অথচ একবার এই বিশালগড়েরই এক তরুণ নিজের জীবন দিয়ে এক বিপ্লবীকে বাঁচিয়েছিল। বিপ্লবী খেয়াল করেন নি, বুনো হাতি পিছু নিয়েছিল তাঁর। তরুণটি দেখতে পেয়ে তীর-ধনুক নিয়ে ছুটল। বিষাক্ত তীর দিয়ে ঘায়েলও করল হাতিকে। তবে নিজে ঘায়েল হবার পর।

এতক্ষণে বিশালগড় ছাড়িয়ে এসেছি আমরা। প্রায়-শহর গোছের এলাকাটা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি।

খানিকদূর এগোতেই ছোট ছোট টিলা। পথ কখনও ওদের গা-ঘেঁষে, কখনও গা-বেয়ে, আবার কখনও বা গা-চিরে চলে গেছে।

অবাক বিস্ময়ে দেখি। চেরা গা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে যেন। পথের দু'পাশে ত্রিপুরার লাল মাটি চোখে পড়ছে।

খানিকদূর চলল এইরকম। তারপর ঘন সবুজ একটা প্রান্তর পেরিয়ে গাড়ি এল চড়িলাম নামে এক জায়গায়।

—চড়িলাম! বাঃ! ভারী সুন্দর নাম তো!—অঞ্জলি বলেছিল।

—হ্যাঁ নামটা সুন্দর,—বলেছিলেন শক্তিবাবু,—কিন্তু কে যে এই নাম রাখল, জানি না। জায়গাটায় আসতে খুব একটা চড়াই পড়ে কি? পাহাড় বেয়ে উঠতে হয় কি খুব একটা?

বললাম,—মোটেও না।

এদিকে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসি খানিকটা। চড়িলামকে পিছনে ফেলে ছুটি।

এদিককার পথ ভালো। ছুটতে কষ্ট নেই।

—এই হল বিশ্রামগঞ্জ। এদিককার বাজার এলাকা,—খানিকক্ষণ বাদেই শক্তিবাবু শুরু করেন আবার। আর একটি প্রায়-শহরকে দেখিয়ে বলেন,—এখানকার হাটে হাতি বিক্রি হ'ত একসময়। দূর-দূরান্তর থেকে খদ্দেররা আসতো। একবার পশ্চিম থেকে এলেন এক ব্যবসায়ী। শোনপুরের মেলায় হাতির পাইকার তিনি। এখানে এসে হাট থেকে একদিন সব হাতিই কিনলেন। এদিকে সেদিনই হাটে এসেছিলেন কোথাকার এক বাবু। ভদ্রলোক দেখলেন, হাট খালি। এক পাইকার সব হাতি কিনে নিয়ে গেছে।—কী? এত বড় অপমান? খালি হাতে ফিরবো?—বাবু রাগে গর্জাতে লাগলেন। স্থানীয়রা পরামর্শ দিল,—এক কাজ করুন কর্তা। পাইকারকে ধরুন, হাতি মিলবে। বাবু সঙ্গে সঙ্গেই দেখা করলেন পাইকারের সঙ্গে। হাতি কিনবেন, একথা বললেন। কিন্তু পাইকার কড়া লোক। সোজা জানিয়ে দিলেন,—খুচরো বিক্রি নেই। হাতি মোট বত্রিশটা, বিক্রি যদি করি তো সবগুলো একসঙ্গেই করবো।...বাবুও দমবার পাত্র নন। ফস করে বলে বসলেন,—বেশ সবগুলোই কিনবো। কত দাম?...পাইকার অন্যায়রকম একটা দাম হাকলেন। বাবু জেদী লোক। বললেন,—বেশ। তাই দেবো।...কিন্তু অত

টাকা তো সঙ্গে নেই!···অগত্যা পাইকারকে সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরলেন তিনি। বত্রিশটা হাতিকে নিয়ে মিছিল করে ঘরে গেলেন। ···শোনা যায়, হাতির দাম দিতে গিয়ে ঘরবাড়ি বিক্রি করতে হয় তাঁকে। আর বত্রিশটি রত্নকে খাওয়াতে গিয়ে নিজেকে উপোস করে কাশীবাসী হতে হয়।

শক্তিবাবুর গল্প শুনে অবাক হই। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যেন। ভেবে পাই না,—সত্যি, এমন যুগও ছিল?

এদিকে খেয়ালই নেই, এতক্ষণে আরও অনেকটা এগিয়েছি। উদয়পুর পৌঁছে গেছি প্রায়। গাড়ি বিরাট এক দীঘির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—এই হল অমর সাগর। শক্তিবাবু বলতে লাগলেন—এত বিরাট দীঘি সারা ভারতে কম আছে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে দীঘিটির দিকে তাকাই। বারবার ভাবি, শুধ কম কেন, আর একটিও আছে কি এমন?

দীঘি তো নয়, সত্যি সাগর যেন। এপার-ওপার দেখা যায় না। মানুষ গড়েছে, না আপনার থেকেই হয়েছে, বোঝা যায় না।

সত্যি এমন যুগও ছিল? দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাত মানুষ, শখ করে সাগর বানাত?

আর সাগর কি উদয়পুরে একটা? জগন্নাথ দীঘি, মহাদেব দীঘি, কালীবাড়ির দীঘি—সাগর ছাড়া এদেরই বা কী বলবো?

অমরসাগরের পর জগন্নাথ আর মহাদেবকে দেখে এগোলাম। শহর উদয়পুরের পথ ধরলাম।

ঘিঞ্জি অপ্রশস্ত পথ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, আশে-পাশের ঘরবাড়ি আর দোকানপাটগুলো দু'দিক থেকে তার গলা টিপে ধরেছে।

এদিকে দোকানপাটের চেহারাও 'আহা মরি' কিছু নয়। সবই যেন কাজ-চলা গোছের। দায়-সারা গোছের।

ঘরবাড়ির বেশির ভাগই জীর্ণ, জবুথবু। অমরসাগর বা মহাদেব দীঘির পাশে শামুকের এক একটি খোলের মতো যেন।

খুব সাবধানে এগোই। গাড়ি খুব ধীরে ধীরে চলে।

জনাকীর্ণ পথ। পায়ে হাঁটা লোকের মিছিল সর্বত্র। সাইকেল ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন নেই বললেই চলে।

এদিককার লোকের যাতায়াতের খুব কষ্ট। রেল নেই, বিমান নেই, লঞ্চ নেই, স্টিমার নেই—সবাই তাকিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সের মতো খুদে খুদে কয়েকটি বাসের দিকে।

এদিকে বাক্সগুলির ভুঁড়ি বোঝাই হতে হতে আধমণী কৈলাস। ছাদ উঁচু হতে হতে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং।

হঠাৎ আমাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল একটি। মনে হল, ঠিক মৌচাক যেন। সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে এবং মাথায় মানুষ নামক মৌমাছিদের ভিড়।

সাধারণের মৌমাছি হওয়া ছাড়া উপায় নেই এদিকে। অসাধারণরা ট্যাক্সী করেন। 'শেয়ার'-এ আগরতলা যান-আসেন।

—যাইবেন কই অখন? কালীবাড়ি?—দ্বিজেন্দ্রর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠি। ফিরে তাকাই ওর দিকে।

শক্তিবাবু আমাদের সকলের হয়ে জবাব দেন,—হ্যাঁ, কালী-বাড়িতেই চলো।

চললাম। মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাড়ি এসে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি একটি জায়গায় দাঁড়াল।

সামনেই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। খানিকটা উঁচু এক টিলার উপর।

এই ত্রিপুরেশ্বরী? মনে পড়ল, কত শুনেছি এঁর কথা! কত লোককে বলতে শুনেছি, দেবী ত্রিপুরেশ্বরী জাগ্রতা।

ভক্তের বাঞ্ছাপূরণে অদ্বিতীয়া।

কিন্তু সত্যি কি তাই?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিসর্জন ও মুকুট নাটকে যে ত্রিপুরেশ্বরীর কথা

বলেছেন, তিনি কি এই?—সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠি। মন্দির-চত্বরে প্রবেশ করার মুখে শক্তিবাবুকে শুধোই।

—না, রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরেশ্বরী ইনি নন;—শক্তিবাবু বুঝিয়ে দেন,—রবীন্দ্রনাথ আসলে লিখেছেন ভুবনেশ্বরীর কথা। গোমতীর তীরে যে ভুবনেশ্বরী মন্দির, তার কথা।

বললাম,—তা বটে। গোমতীর উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের নাটকে আছে বটে।

—আছে মানে?—শক্তিবাবু ব্যাখ্যা শুরু করলেন,—বিসর্জন নাটকে জয়সিংহের সেই বর্ণনা মনে নেই? সেই যে, ভিখারিণী অপর্ণাকে সে বলছে,

দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত—কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।

বললাম,—ঠিক ঠিক। তবে বিসর্জন নাটকের আসল কথাটা কিন্তু ত্রিপুররাজ গোবিন্দমাণিক্য প্রকাশ করেছেন। সেই যে, তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি,—জানিয়াছি, দেবতার নামে,

মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ।

শক্তিবাবু যোগ করলেন,—জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালবাসা দিয়ে।

—কাম সারছে!- দ্বিজেন্দ্র হঠাৎ ছন্দপতন ঘটাল,- কাইব্য (কাব্য) করলে আসল জিনিস আর দেখন লাগত না। যাইতে যাইতেঐ (যেতে যেতেই) বলি শেষ।

—বলি?—অঞ্জলি আঁৎকে উঠল ভীষণভাবে, এ মন্দিরে এখনও এসব হয়?

—ক্যান্ অইব (হবে) না? দ্বিজেন্দ্রর চোখ দু'টি কাপালিকের মতো চকচক করে, রুজঐ (রোজই) অয় (হয়)! এই ধরেন,

গুড়া (গোটা) দশেক পাডা (পাঁঠা) আর উগলা (একটা) কি দুইলা (দুটো) মইষ (মোষ)।

—না না, বলি আমরা দেখবো না,—অঞ্জলির প্রবল আপত্তি।

শক্তিবাবু অভয় দিলেন,—বেশ তো! দেখবেন না। আর তা'ছাড়া, কা'রই বা ভালো লাগে ওসব দেখতে!

বললাম,—অনেকেরই লাগে। এই যেমন, দ্বিজেন্দ্রর।

—হ। কইছেন!—দ্বিজেন্দ্র খুব খুশি,—যাই আমি; বলি দেইখ্যা আইগা,—বলেই সে ছুটল।

শক্তিবাবু বললেন, দেখেছেন কাণ্ড! রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, ঠিক তার উল্টো আয়োজন!

শুধালাম,—সরকার থেকেও নাকি বলি বরাদ্দ এ মন্দিরে?

শক্তিবাবু জবাব দিলেন,—হ্যা। তবে বলি সবচেয়ে বেশি হয় কালীপুজোর দিনে। মন্দির রক্তে ভেসে যায় তখন। কাঠগড়া থেকে আলাদা নালা কেটে রক্ত সরাবার পথ করতে হয়।

বললাম,—আপাততঃ কাঠগড়ার দিকটা এড়িয়ে অন্য পথে গেলে হয় না?

শক্তিবাবু বললেন,—তাই যাচ্ছি। কালীবাড়ির দীঘির দিকে যাচ্ছি এখন। বলি-পর্ব চুকলে মন্দিরে ফিরবো।

অঞ্জলি দারুণ খুশি এ-প্রস্তাবে। শুধোল,—দীঘিটা সামনেই বুঝি?

—হ্যাঁ, একেবারে সামনে,—বলতে বলতে শক্তিবাবু আমাদের নিয়ে হাজির হলেন সান-বাধানো বিরাট এক দীঘির ঘাটে।

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামলাম। দীঘির জলের খুব কাছে এসে দাঁড়ালাম।

দেখি, অনেক লোক সেখানে। ভিড় করে কী যেন দেখছে।

—কী?—শক্তিবাবুকে শুধোতেই দেখিয়ে দিলেন,—ওই যে! দেখুন না।

দেখলাম। অবাক হলাম দেখে। অতিকায় সব কচ্ছপ। ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে। আর ঘাটের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে-থাকা উৎসাহীরা খাবার ছুঁড়ে দিচ্ছে ওদের।

পড়তে না পড়তেই খাবার লোপাট। কচ্ছপরা কিলবিল করে নাচতে নাচতে এগোচ্ছে একটু। গলা বের করে খাবারগুলো মুখে পুরছে।

একটি কচ্ছপ তো বেপরোয়া। থপ্ থপ্ করতে করতে দিব্যি উঠে এলো। জনৈক দর্শকের হাত থেকে খাবার নিয়ে ঝুপ্ করে জলে নামল আবার।

শক্তিবাবু বললেন,—ওরা সেয়ানা। সব টের পায়, বোঝে। বিকেল হলেই ঠিক এই ঘাটের আশ-পাশটিতে এসে উঁকির্ঝুঁকি মারে। দর্শকরা আসবে, খাবার দেবে, এ যেন ওদের জানা।

শুধালাম,—কেউ ওদের কিছু বলে না ?

—কে বলবে ? —শক্তিবাবু জানান,—সবাই বরং ভক্তিশ্রদ্ধা করে। ভালোবাসে রীতিমত। ওদের কেউ মরলে সমাধি দেয়। কালীবাড়ির পাশেই সমারোহ করে পুঁতে রাখে। এখানে কচ্ছপ মারা নিষেধ।

—নিষেধ ?···কী যেন বলতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বাধা পড়ে। একটি ছেলে কচ্ছপদের দিকে তাকিয়ে কা'কে যেন ডাকতে শুরু করে, —বঙ্কু, অ বঙ্কু, আয় না !

শুধালাম,—বঙ্কু কে ?

শক্তিবাবু জবাব দিলেন,—কচ্ছপদেরই কেউ।

—বঙ্কু, অ বঙ্কু, আয় না !—ছেলেটি ডেকে চলেছে ওদিকে। এবং খানিক বাদেই আশ্চর্য ! বঙ্কু উঠে এলো। ছেলেটির হাত থেকে খাবার খেলো দিব্যি।

—রাঙাদাদু, অ রাঙাদাদু, কেমন আছ গো ?—এতক্ষণে আর একটি লালচে মতো কচ্ছপ উঠে এসেছে। ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে তার পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

বেশ লাগছিল দেখতে। এমন সময় হঠাৎ প্রবলবেগে বাজনা বেজে উঠল। একমাত্র ওই ছেলেটি ছাড়া সবাই ছুটল কালীমন্দিরের দিকে।

বুঝলাম, বলি শুরু হচ্ছে এইবার। দর্শকরা ভিড় করছে।

কিন্তু একই জায়গায় মানুষের এ-কী বিপরীত পরিচয়? বলি দেখে নাচছে কেউ, কেউ আবার 'রাঙাদাত্থ'র পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে? জীব মরে গেলে দুঃখে-বেদনায় সমাধি দিচ্ছে যারা, তারাই আবার জীবের গর্দান কেটে উল্লাসে নাচছে? মানুষের কোন পরিচয়টা সত্যি?

ভাবি আকাশ-পাতাল। বাজনা শুনি।

সামনেই কালীবাড়ির দীঘি। সন্ধ্যা নামছে। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে দীঘির জল।

কয়েকটা হাঁস প্যাক-প্যাক করতে করতে দীঘি থেকে উঠে গেল। একটা কুকুর ঘাটে নেমে চুক-চুক করে জল খেলো খানিক। দীঘির ওপার থেকে পাখির ডাক ভেসে এলো,—'বউ কথা কও'।

ভাবলাম,—এই ঘাটে আরও খানিকক্ষণ বসি। ত্রিপুরেশ্বরীকে প্রণাম করি এখান থেকেই।

এমন সময় বাজনা থামল। শক্তিবাবু তাড়া দিলেন,—নিন; চলুন এবার, মন্দির দেখি।

চললাম। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে এগোলাম মন্দিরের দিকে। মন্দিরের গর্ভগৃহটি অনেকটা প্যাগোডার মতো। আর নাটমন্দিরটিকে দেখলে সাবেকী আমলের কোনো কাছারিবাড়ি বলে ভ্রম হয়।

সামনেই সারি সারি দোকান। ভোগের জন্য মিষ্টি কেনা হল ওদের একটি থেকে। দ্বিজেন্দ্র এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল।

খুব খুশি সে। বলি দেখে আনন্দে আত্মহারা।

বললে,—আহা! যদি দেখতেন স্যার, মইষটার কাউন্বানি

(কাতরানো)! এক কুপে (কোপে) অক্করে (একেবারে) ঠাণ্ডা।

বললাম,—তুমি দেখেছ তো ?

—হ।

—তাহলেই হল।

—পাডা (পাঁঠা) বলি দেইখ্যা সুখ নাই স্যার। মইষ দেইখ্যা সুখ।

—তা হবে, বলতে বলতে সুখী মানুষটিকে নিয়ে নাটমন্দিরে পৌঁছুই। দেখি, এখানে-সেখানে চাপ চাপ রক্ত। মন্দিরের জীর্ণ দেহে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধের আমেজ। শুনেছি, বহুকালের পুরনো এই মন্দির। আজ থেকে ৪৫০ বছর আগে মহারাজা ধন্য মাণিক্য এটি গড়েছিলেন। এ হল হিন্দুদের ৫১টি পীঠের অন্যতম। যুগ যুগ ধরে অনেক রক্তের সাক্ষী এ।

রক্ত আর রক্ত। ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

সেদিন ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির থেকে বেরোবার মুখে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির ফোঁটাকে হঠাৎ একবার রক্ত বলে মনে হল আমার। নালা বেয়ে নেমে-চলা বৃষ্টির জলকে মনে হল ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে-আসা রক্ত।

পথের মাঝে মাঝে জল জমে আছে। ভাবলাম, চাপ চাপ রক্ত বুঝি।

কিন্তু তবু, সবই কি রক্ত ?

ক্লান্তিহরা মিঠে বাতাস আসছে কোত্থেকে! সামনেকার বুড়ো অশ্বত্থকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাতাস কথা কইছে যেন,—কেমন আছো গো ?

পথের একপাশে কুঁজো সুপুরি গাছ একটা। বাতাসের ঠিক একই প্রশ্ন তার কাছে,—কেমন আছো গো ?

একটা শীর্ণ অথর্ব মাধবীলতা আমাদের পথ আগলে। তারও কাছে বাতাসের জিজ্ঞাসা,—কেমন আছো?

খুব ভালো।—সেদিন বাড়ি ফিরে সন্ন্যাসী নরেন দত্তকে দেখলাম। কুশলপ্রশ্ন করতেই যেন সকলের হয়ে জবাব দিলেন তিনি,—খুব ভালো।

এই শেষ দেখা তাঁর সঙ্গে। সেদিনই আশ্রমের কাজে তিনি যেন কোথায় চলে গেলেন।

এদিকে, চলছি বটে আমরাও। আজ এখানে, কাল সেখানে।

কাল উদয়পুর, আজ ডনকুটি।

আজও শক্তিবাবু সঙ্গী আমাদের। ত্রিপুরার অরণ্যপথ ধরে চলার সময় আমাদের গাইড।

যেতে যেতে অনেক কথা বললেন তিনি। ত্রিপুর-অরণ্যের স্বর্ণযুগ নিয়ে অনেক আক্ষেপ করলেন।

—আহা! কী ছিল, আর কী হয়েছে!—কখনও বা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শক্তিবাবু। আবার কখনও স্বর্ণযুগের ফিরিস্তি দিলেন।

তাঁর দেওয়া ফিরিস্তি এবং সে-যুগের প্রবীণ প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে শোনা ইতিবৃত্তগুলো জড়ো করলে, আরণ্যক ত্রিপুরার যে ছবি আজ দেখতে পাই, তা অনেকটা এইরকম।—

একদিন ত্রিপুরার তিন-চতুর্থাংশ জুড়েই ছিল ঘন-গভীর জঙ্গল। সেখানে একবার ঢুকলে বেরোবার পথ পেত না কেউ। শাল, জাম আর জারুলের হাতছানিতে সাড়া দিতে গিয়ে কুই, কাঞ্চন, কবই অথবা কনক, কুমিরা, কাজিকারার কুহকে জড়িয়ে পড়ত। এদিকে আমলকি, আগর ও আওয়ালরা রহস্যের মায়াজাল বুনতো; সিদা, মেদা, খেমতা, চেগারশি ও চালতারা ভর-দুপুরে পুষে রাখতো গা-ছমছমে অন্ধকার। গর্জন, গামাইর বা গণ্ডরই রাজত্ব করতো

কোথাও; কোথাও আবার চামল, চাম্পা বা চালমুগ্রা আসর জমাতো। এছাড়া শিমুল কোথাও, কোথাও সুন্ধি;—আম কোথাও, কোথাও চামল;—রঙ্গি কোথাও, কোথাও রিতা ত্রিপুরার অরণ্যকে দুর্গম, দুর্ভেদ্য ও চির-সবুজ করে রেখেছিল।…এক বাঁশই ছিল কত রকমের! মুলি, পারওয়া, মিত্তিঙ্গা, কল্যাই, ডলু, রূপাই, পুচা—এবং আরও কত কি! এছাড়া গভীর জঙ্গলে গালা, সুন্ধি, জালি ইত্যাদি কত জাতের যে বেত ছিল।

—গেল, সব গেল ধীরে ধীরে,—উনকুটি যেতে যেতে শক্তিবাবু দুঃখ করেছিলেন,—জুম চাষের নাম করে আদিবাসীরা বনে আগুন দিল, আর ওদিকে উদ্বাস্তুরা এসে কেটে কেটে সাফ করল সব।

বলেছিলাম,—কোথায় আর সাফ করেছে?

বিরাট এক শাল অরণ্যের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন। অদূরেই চোখে পড়ছিল কিছু শিমুল আর গর্জন। ওদের দেখিয়ে শক্তিবাবুকে বলেছিলাম,—কোথায আর সাফ করেছে? ঐ তো দিব্যি আছে ওরা।

শক্তিবাবু আক্ষেপ করছিলেন,—আছে। তবে আগের তুলনায় এটা না থাকারই সামিল। আগে এসব জঙ্গলে ঢুকতে দিনের বেলায়ও আলো জ্বালাতে হ'ত। ভর-দুপুরেও গা ছমছম করত। আগে

সেদিন আরও কত কি যেন বলেছিলেন শক্তিবাবু। আগেকার কত কথা সব। সেগুলো আজ আর মনে নেই। আজ শুধু মনে পড়ে, দীর্ঘ বিরাট অরণ্যপথ একটা। ঘণ্টা পাঁচেক ধরে ছায়াছবির মতো আমার সামনে এলো আর সরে গেল।

অবশেষে উনকুটি পৌঁছুলাম যখন, সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলান দিয়েছে। আশে-পাশের গাছগুলোর শান্ত-স্নিগ্ধ ছায়া আলম্বিত হয়েছে চারিদিকে।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি। উঁচু, ঢিবিমতো একটা জায়গায় উঠি।

এই হল উনকুটি তীর্থ। এখানে পাথরের গায়ে গায়ে আশ্চর্য সব দেবদেবীর মূর্তি। সেই কবে, কোন্ যুগে নাকি খোদাই করা!

কোনো কোনো মূর্তি এমন কি বৌদ্ধ আমলের। উনকুটির বিষ্ণু-মূর্তিটিকে দেখে তো ভ্রমই হয়েছিল। ভেবেছিলাম, বিষ্ণু নয়; বুদ্ধমূর্তি এটি। শ্রমণরা অতি যত্নে পাহাড় কেটে কেটে এ গড়েছেন।

গল্প শোনা যায় আজও, এক সময় দূর-দুরান্তর থেকে শিল্পী আসতো এখানে। দূর-দুর্গম অরণ্যপথ অক্লেশে পাড়ি দিত। একবার এক শিল্পী পথ হারাল। অরণ্যে দিক্‌ভ্রম হল তার।… শিল্পী উন্মাদের মতো ঘুরছে। কী করবে, কোথায় যাবে, কিছুই ঠাওর করতে পারছে না; এমন সময় হঠাৎ দেখে, এক কাঠুরিয়া ধীরে ধীরে তারই দিকে এগোচ্ছে।

—কে গো তুমি?—কাঠুরিয়া শিল্পীকে শুধোল,—পথিক বুঝি? অরণ্যে পথ হারিয়েছ?

শিল্পী বললো,—হ্যাঁ।

—যাবে কোথায়?

—উনকুটি।

—কেন?

—মূর্তি গড়তে।

—আসছো কোত্থেকে?

—সারনাথ।

—ওফ্! তবে তো অনেক দূর!

—হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কী!

—কষ্ট। আহা! অনেক কষ্ট করেছ তুমি। নাও, চলো এবার। উনকুটির পথ দেখাচ্ছি।

—তুমিও বুঝি ওদিকেই যাবে?

—হ্যাঁ, আমিও।

ব্যস্। কাঠুরিয়া চলে, শিল্পীও এগোয়। দেখতে দেখতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় ওরা। উনকুটি পৌঁছয়।

শিল্পী খুব খুশি এবার। কাঠুরিয়াকে বললো,—আহা! অনেক করলে তুমি! কত কয়ে আমায় পথ দেখালে!

কাঠুরিয়া কোনো জবাব দিল না। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল একেবারে সামনেই, এক পাথরের গায়ে।

শিল্পী এগিয়ে গিয়ে দেখল, পাথর তো নয়, দেবমূর্তি একটি। অতি অপরূপ এক বিষ্ণুমূর্তি। দেখতে অনেকটা যেন গৌতমবুদ্ধেরই মতো।

—ঠাকুর! ঠাকুর!—সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করে পাথরের গায়ে লুটিয়ে পড়ল সেই শিল্পী।

শোনা যায়, এরপর থেকে ওই কাঠুরিয়াকে আরও অনেকেই নাকি দেখেছে। বনের পথে একা একা ঘুরে বেড়ান তিনি। ভক্তকে পথ দেখান।

বিশ্বাস হয় না। এমন কি উনকুটির দেবদেবীদের সামনে দাঁড়িয়েও এ-কাহিনী অদ্ভুত ও অবাস্তব মনে হয়।

এদিকে সন্ধ্যে নামে। চারিদিক থেকে গাঢ় গভীর একটা বিষণ্নতা আমাদের ঘিরে ধরে। দ্বিজেন্দ্র তাড়া দেয়,—নেন, চলেন এলা (এবার)। যাইতে যাইতে বারোটা বাজব অনে।

তা বাজল। বারোটা না হোক, আগরতলা পৌঁছুতে এগারোটা বেজে গেল।

পৌঁছে দেখি, গোপালবাবু বাইবেল পড়ে শোনাচ্ছেন ঝণ্টুকে। ব্যাখ্যা করছেন।

আমরা আসতেই সুসংবাদ দিলেন,—নাও। তৈরি হও এবার। মণিপুর এবং নাগাল্যাণ্ড যাচ্ছি।

শুধালাম,—আপনিও?

—হ্যাঁ। কোহিমা পিস সেণ্টার-এর ডিরেক্টার ডঃ আরাম বিশেষ করে লিখেছেন।

মনে পড়ল, আমরা আগরতলা আসতেই ডঃ আরাম-এর কাছে চিঠি দিয়েছিলেন গোপালবাবু। সদলবলে যেতে চান, একথা জানিয়ে পুরনো বন্ধুকে লিখেছিলেন।

বন্ধুটি দেখছি, কর্মিতকর্মা। চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছেন।

বললাম,—কিন্তু মণিপুর? কোথায় উঠবেন ওখানে?

গোপালবাবু ভরসা দিলেন,—কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। ডঃ আরাম-এর লোকজন ওখানেও আছে।

ব্যস্। বিদায়ের বাঁশী বেজে উঠল। পরদিনই ইম্ফলের টিকিট 'বুক' করবো বলে দ্বিজেন্দ্রকে নিয়ে 'এয়ার অফিস'-এ ছুটলাম। সঙ্গে গেলেন গোপালবাবুর এক সহকর্মী অধ্যাপক সুধীর সাহা। ভদ্রলোকের মণিপুর ও নাগাল্যাণ্ড ট্যুর-এ আমাদের সহযাত্রী হবার কথা।

এদিকে টিকিট কাটতে গিয়ে বিপদ। 'এয়ার অফিস'-এ নামবো, ঠিক এমন সময় দ্বিজেন্দ্রর অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন,—স্যার, কই যাইবেন?

বললাম,—ইম্ফল।

—আকামে (অকাজে)?

—না, তা ঠিক নয়, বেড়াতে।

—ঐ হইল। আকামে ক্যান্ যে আপনেরা একপ্লেনে উডেন (ওঠেন)?

—কেন? কী হয়েছে উঠলে?

—এস্‌কিডেণ্ট্ ত রুজই অয়। আইজ ইডা (এটা), কাইল হিডা (সেটা) বাইঙ্গা (ভেঙ্গে) পড়ে!

হেসে উঠলাম। দ্বিজেন্দ্রকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম,—না না,

ওসব কিছু নয়। অ্যাকৃসিডেন্ট্ যখন হবার তখন তোমার এই জীপ-গাড়িতেও হতে পারে।

—না স্যার, ইতান (এসব) কইয়েন না,—দ্বিজেন্দ্রর প্রবল আপত্তি,—গাড়ি স্যার মাডির (মাটির) উপর দিয়া যায়; এরুপ্লেন যায় আশমান দিয়া। গাড়ি কইরা যাওনের (যাবার) সময় বিপদ-আপদ কিছু অইলেও (হলেও) মরণের আগে উগলা-দুইলা (একটা-দুটো) কথা কওন যায়। মাডির (মাটির) নীচে টেকা (টাকা) রাখছি, পুষ্কনির (পুকুরের) ধারে সুনা (সোনা) রাখছি,—ইতান (এসব) কইয়া মরণ যায়। কিন্তু এরুপ্লেন? এস্‌কিডেন্ট্ অইলে (হলে) টেকা-পুইসার কথাডাও কওনের জু (জো) থাকে না।

দ্বিজেন্দ্রর কথা শুনে কী একটা কৌতূহল হল আমার। শুধালাম,—তুমি বুঝি অনেক টাকা-পয়সা জমিয়েছ?

—অনেক না স্যার,—দ্বিজেন্দ্র বিনয়ে কাঁচুমাচু,—তিনশ তেরো টেকা চল্লিশ পুইসা। মাডির নীচে রাখছি।

ইম্ফলের 'প্যাসেজ' সহজে মিলল না। দিন পাঁচেক অপেক্ষা করতে হল।

এ একদিক থেকে শাপে বর। গোপালবাবু কলেজের কাজকর্ম সারার সুযোগ পেলেন। আর আমরাও ত্রিপুরার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হলাম আর একটু।

পরদিন। সারথি দ্বিজেন্দ্রকে নিয়ে নয় আর, হাঁটা-পথে বেরোলাম আগরতলা দেখতে।

শহরটার হালচাল একটু অদ্ভুত। গাড়ি-ঘোড়া নেই-ই বলতে গেলে। রাজপথগুলো যেন আড্ডার খাসমহল।

ভর-সন্ধ্যেয়ও ছেলেছোকরারা মাঝপথে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। আর জমেছেও দিব্যি। কোথাও চার, কোথাও পাঁচ, আবার কোথাও ছ-সাত জনের মনোরম এক একটি আসর।

কত গল্প সেখানে। কত সব সুখ-দুঃখের কথা। একটি আসর থেকে ঢাকাই কথাবার্তা কানে এল। দুই বন্ধুতে ভাব-বিনিময় চলছে।

—নন্দার বিয়ায় গেছিলি ?

—গেছিলাম না হালা চামচিকার নাতি !

—কী পিন্দা (পরে) গেছিলি ?

—হলদ সিলকটের (হলদে রঙের সিল্কের) পাঞ্জাবী পিন্দা গেছিলাম। বাপে নাগরাই (জুতো) কিন্যা (কিনে) দিছিল, হেই নাগরাই ভি পিন্‌ছিলাম (পরেছিলাম)। আর হালা, বিড়ি হাঙ্গাইয়া (বিড়ি ধরিয়ে) গেছিলাম।

—নন্দা হালায় পটল (বশে এলো) ?

—নন্দা ত নন্দা, নন্দার হাউডী (শাশুড়ী) ইস্তক (পর্যন্ত) আমারে দেইখ্যা (দেখে) পইটা গেছে।

বুঝলাম। নন্দা নামক পাড়ার একটি মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে এই হৃদয়বিদারী রসালাপ। পাড়ার মস্তানদের মধ্যে কেউ কেউ নিমন্ত্রিত হয়েছিল। ওদেরই একজন নেমন্তন্ন-বাড়িতে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল, এবং প্রসঙ্গতঃ গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে নিজের অপরূপ সাজ-পোশাকের সামান্য একটু ফিরিস্তিও দিল।

অন্য এক জায়গায় দেখি, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে জমাট আলোচনা। ময়মনসিংহের কথাবার্তা কানে আসছে।

—ফাদার আর মাদার আগরতলা থাকবাইন (থাকবেন)। আমি থাকবাম (থাকবো) কইলকাত্তা।

—ক্যান্ ? চাকরীর ধান্ধায় ?

—হ।

—কইলকাত্তায় উঠবাইন (উঠবেন) কই ?

—মউশার (মেশো) কাছে।

—হেষে (শেষে) মউশা না হাছৈন (ঝাটা) দিয়া খেদায় ?

—না ; তাইন (তিনি) লুক (লোক) ভালা (ভালো)। গেলে যত্নআত্তি পাইবাম (পাবো)।

দেখতে দেখতে, কত কী কথা শুনতে শুনতে এগিয়ে চলি।

ইচ্ছে না থাকলেও শুনতে হয় কথা। কারণ, পথে যারা গল্প জমিয়েছে, গোটা পৃথিবীকে আপন ধরে নিয়েছে তারা। আশে-পাশেই যে লোকজন আছে, শুনতে পাচ্ছে তাদের কথা, তা নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা নেই।

অবিশ্যি লোকজন বলতে, প্রায় সবাই পূর্ববঙ্গের। অতএব, মাথাব্যথা আদৌ কিছু থাকলেও সকলের মধ্যে কোথাও আবার একটা মিল আছে। ঢাকাই বলি, অথবা বলি ময়মনসিংহী বা কুমিল্যাই, সবাই একই দুঃখে দুঃখী। দেশভাগের পর সবাই আগরতলা এসেছে।

হ্যাঁ, দেশভাগের বেদনাকে নতুন করে অনুভব করি সেদিন। গোটা পূর্ববঙ্গকে যেন আগরতলার পথে পথে খুঁজে পাই।

এক মিষ্টির দোকানে ঢুকতেই বরিশালের কথাবার্তা শোনা গেল। জনৈক প্রবীণ এক নবীনকে শুধোচ্ছেন,—বজলু, অরে অ বজলা! আমাগ বরিশালের বর্তবুলির কচু খাইছ ?

—না, খাই নাই।

—খাবা ক্যান্ ? ছাইভর্তা এই সন্দেশ খাবা !

মিনিট খানিক চুপচাপ। পরক্ষণেই নতুন প্রশ্ন,—ঝালকাঠির দুধ-দৈ খাইছ ?

—না, খাই নাই।

—খাবা ক্যান্ ? ছাইভর্তা এই ক্ষীর খাবা।

আবার চুপচাপ ! আবার নতুন প্রশ্ন। বরিশালের খাবার-দাবার নিয়ে বিরাট-বিস্তৃত আলোচনা। নবীনের কাছে প্রবীণের কত সস্নেহ উপদেশ।

সেদিন দোকান থেকে বেরিয়ে রাজপথে পড়ি আবার। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি।

না, চলতে কষ্ট নেই আগরতলায়। রাজপথ ওখানে পথ-চারীদেরই জন্যে। যেমন খুশি চলুন; জোরে, ধীরে, হেলে-দুলে, খোশগল্প করতে করতে। কেউ আপনাকে কিছু বলবে না।

আমরা ধীরে চলেছি কিছু অসুবিধে আছে বলে নয়, রাজধানীকে রয়ে-বসে চেখে চেখে দেখবো বলে।

কিন্তু এ কেমনতরো রাজধানী? দোকানপাটের জেল্লা নেই, উঁচু ঘরবাড়ি নেই, চোখ-ঝলসানো ম্যানস্যান নেই এবং এমন কি গাড়িঘোড়াও প্রায় নেই।

ভারতের অন্য সব রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে এর যেন কোনো তুলনাই চলে না।

তবে আগরতলার ঐশ্বর্য বুঝি বাইরে নয়, ভেতরে। সেদিন নতুন করে তার প্রমাণ পেলাম।

খানিকদূর হেঁটে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে গেছি। হঠাৎ দেখা কালাচাঁদবাবুর সঙ্গে। ঠাকুর-প্রণাম সেরে উঠতেই চোখাচোখি।

—চিনলেন নি?—স্মিতমুখে আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর কুশল-প্রশ্ন।

বললাম,—হ্যাঁ, খুব চিনেছি। কালাচাঁদবাবু না?

—হ, কইছেন।

—আগরতলা আসতে বিমানে আলাপ আপনার সঙ্গে। এরই মধ্যে ভুলে যাবো?

—ভুলেন নাই। দয়া কইরা (করে) মনে রাখছেন। সুখ পাইলাম শুইন্যা (শুনে)।

—আপনিও তো মনে রেখেছেন দিব্যি!

—রাখুম (রাখবো) না? ভুইল্যা যামু (ভুলে যাবো)? ক্যান্?...জানেন মশয়, সহজে কুনু জিনিস আমি ভুলি না। এই

ত, পন্নাম করলাম অতক্ষণ; ঠাকুররে কী কইলাম কন ত?—বলেই একটু থামলেন কালাচাঁদবাবু। এক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে শুরু করলেন,—কইলাম, জয় বাংলা!…আর কইলাম, ঠাকুর! অনেক ত দুঃখু দিছ। এলা (এখন) তুই বাংলারে সুখ দেও। আমরা দুধমাছ খাইয়া বাঁচি। আর হেরাও (ওরাও) বাঁচুক।… বুঝছেন নি মশয়? ভুলি নাই। ভুললে পুব-বাংলার কথা মনে আইব ক্যান্?

সেদিন কালাচাঁদবাবুর কথা শুনে অবাক হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাই ওঁর দিকে।

উনি তখনও থামেন নি। বলে চলেছেন, কী কইছিলাম হেইদিন মনে আছে ত?—

গোয়ালনন্দের ইলিশ আর বাউনবইড়ার মাডা (ঘোল)
যে ভুলে, হেরে (তাকে) কয় পাডা (পাঁঠা)।

বললাম,—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

—তবে?—রীতিমত কৈফিয়ৎ তলব করলেন কালাচাঁদবাবু,—গেলেন না দেখি আমার বাড়ি? গেলে কইলাম (কিন্তু) মজার জিনিস খাওয়ামু (খাওয়াবো)। গোয়ালনন্দের লুনা ইলিশ মশয়! কামালউদ্দিন মিঞা পাডাইছে (পাঠিয়েছে)।

বললাম,—যেতে চেষ্টা করবো! কাল-পরশু নাগাদ।

—রাখেন মশয়, ঘষা আলাপ রাখেন। তবে হ, গেলে সুখ পামু (পাবো),—বলতে বলতে বিদায় নিলেন কালাচাঁদবাবু।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে বসলাম খানিকক্ষণ। ভক্তদের আনাগোনা দেখলাম।

সামনেই বিগ্রহ। সেখানে সন্ধ্যারতি হল। ধূপে দীপে, চন্দনে পুষ্পে মিলে অদ্ভুত মিষ্টি একটা সুবাস সারা নাটমন্দিরে ছড়িয়ে পড়ল।

না, নাটমন্দিরটি অপরূপ কিছু নয়। চিক্কণ ভাস্কর্য বা মহিমময় কোনো চিত্রকলার সন্ধানে ওখানে কেউ যায় না।

দিতেই চাঁদবাবুর মত মানুষরা যায় ওখানে। আর যায় অতি-খুব খুশি কিছু লোক।

প্রজয়ন্ত রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে এ-মন্দির যেন প্রজাদেরই বসে ন জানাচ্ছে। এর আটপৌরে এবড়ো-খেবড়ো মেঝে, রঙ্-অভি যাওয়া প্রাচীর এবং জরাজীর্ণ চৌকোণ গর্ভগৃহটি দরিদ্র ত্রিপুরার স কারের প্রতীক যেন।

সেদিন লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির থেকে বেরিয়ে সোজা কোণাকুণি পথ ধরি' প্রাসাদ-এলাকার ভিতর দিয়ে এগোই।

পথ অন্ধকার। যত্রতত্র কুকুর শুয়ে। টর্চের আলোতে সাবধানে চলতে হয়।

এদিকে প্রাসাদ-এলাকা পেরোতেই দেখি, অন্ধকারের চিহ্নও নেই আর। রাজপথে ঝলমল করছে আলো। সাধারণ মানুষের মিছিল চলছে।

ভাবলাম, এমনই হয়। দিনবদল হলে রোশ্‌নাই ঠিক এমন করেই প্রাসাদ থেকে পথে ভিড় করে একের জমিয়ে-রাখা গাঢ় তীব্র আলোক মূর্তিমান ঝরনাধারার মতো হঠাৎ সকলের হয়ে ওঠে।

—সকলকে নিয়েই তো জগৎ গো! তুমি-আমি কে?—পরদিন আগরতলা বুদ্ধ-মন্দিরের প্রধান ভিক্ষু সত্যিকারের এক ঝরনাধারারই সামনে দাঁড় করিয়ে যেন দেন।

গোপালবাবুর সূত্রে পরিচয় ওঁর সঙ্গে। বুদ্ধ-মন্দিরে বসেই আলাপ-আলোচনা।

গোপালবাবু মন্দির-কমিটির সভাপতি। অনেকদিন থেকেই ভিক্ষুকে জানেন। আর ভিক্ষুরও গভীর শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি! সদলবলে তাঁকে আসতে দেখে ভীষণ খুশি তিনি।

এদিকে খুশি আমরাও। কারণ, শহর আগরতলার ঠিক ওপরেই এমন মনোরম একটি মন্দির দেখবো, এ যেন ভাবতেই পারি নি।

বুদ্ধ-মন্দিরকে ভালো লাগল সে বিরাট বা বৈভবশালী বলে নয়, শান্ত স্নিগ্ধ ও সুপরিকল্পিত বলে। রাজধানী আগরতলার কোলাহল-সমুদ্রের মাঝখানে সে একটি স্তব্ধ ও গম্ভীর দ্বীপ রচনা করেছে যেন।

মন্দিরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াই। হঠাৎ নতুন কোনো জগতে এসেছি, মনে হয়।

কোলাহল নেই এখানে, ভিড় নেই। নিঃশব্দ, নীরব পরিবেশ। গোটা মন্দির-মহলটি শান্তি ও সমর্পণের মহিমায় শুচিশুভ্র।

ঘাসে-ঢাকা সবুজ উদ্যানটি ভক্তিমান কোনো প্রহরী যেন। যেন তাকে ডিঙিয়ে অতি সাবধানে মন্দিরে ঢুকতে হবে। প্রহরীর আরাধনায় এতটুকু বিঘ্ন না ঘটে।

সন্তর্পণে এগোই। জুতো খুলে ধীরে ধীরে পথ চলি।

সান-বাঁধানো পথ। ঝকঝকে তকতকে। চলতে কষ্ট নেই।

সোপান আছে কয়েকটি। অনাড়ম্বর, সুন্দর। যেন না থাকলে ক্ষতি হ'ত। রাজধানীর কোলাহল-সমুদ্রের ঢেউগুলো সরাসরি মন্দির প্রাঙ্গণে এসে আছড়ে পড়ত।

প্রাঙ্গণটিও সুদৃশ্য। চৌকোমতো পাথর দিয়ে বাঁধানো। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মালা বুঝি; বড় বড় ফুল দিয়ে গেঁথে মন্দির-পাদপীঠে অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে।

মন্দিরটি আকারে ছোটখাটো, কিন্তু প্রকারে অভিনব। কাছাকাছি হতেই দেখি, একতলা সাদাসিধে একটা কুঠী যেন। তার মাঝমধ্যিখান বরাবর ছাদের অংশটা দু'পাশের তুলনায় উঁচু। সামনের দিকে এগিয়ে-আসা বারান্দাটা ছাদের তুলনায় নীচু একটু। ডান পাশের মাঝামাঝি অংশ থেকে মঠ-মতো চৌকোণ গম্বুজটি উঠে গেল। এবং প্রধানতঃ এরই গুণে সব মিলিয়ে অপরূপ হয়ে উঠল মন্দিরটি।

দেখতে দেখতে এগোচ্ছিলাম।—

এক ভিক্ষু স্বাগত জানালেন। গোপালবাবু পরিচয় করিয়ে

দিতেই বোঝা গেল, এ-মন্দিরের প্রধান তিনি। আমাদের পেয়ে খুব খুশি।

প্রধান ভিক্ষু সঙ্গে করে নিয়ে মন্দির দেখালেন। বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করলেন। পরিষ্কার বাংলায় বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বললেন।

শুধিয়েছিলাম,—অনেক দেশ ঘুরেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ, অনেক। না ঘুরলে জানবো কী করে? বুঝবো কী করে? সকলকে নিয়েই তো জগৎ গো! তুমি-আমি কে?

—তাই বটে! তুমি-আমি কে?—সেদিন কলেজ-টিলায় ফিরতে ফিরতে ভাবি।

'আমি'কে নিয়ে জগৎ হলে আলো তো রাজপ্রাসাদেই থাকত আজও। পথে ভিড় করত না।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, সব পথেই কি আলো জ্বলে?—পরদিন সকালে কলেজ-টিলায় ঘুরতে ঘুরতে মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের দিকে তাকিয়ে ভাবি,—এই যে শিক্ষার নামে মূর্তিমান একটি প্রাসাদ গড়ে উঠেছে এইখানে, এক জায়গায় অনেক প্রদীপ জ্বালিয়ে রোশ্‌নাইয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় এ কতটুকু?

অস্বীকার করবো না, ত্রিপুরায় ছ'-সাতটি কলেজ আছে আরও। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়ও সে আজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সে শিক্ষা এমন কিছু নয় যার দিকে তাকিয়ে বলতে পারি আলো একের নয়, বহুর; প্রাসাদের নয়, পথের।

—পথে কি আলাদীন আছে যে, বলা মাত্রই আলো জ্বলবে?—বলেছিলেন আমাদের সেদিনকার সঙ্গী ত্রিপুরার শিক্ষা-অধিকর্তা ডঃ গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে কথা উঠতেই এবং শিক্ষা নিয়ে যে ভাবনার কথা একটু আগে বলেছি, তার খানিকটা তাঁকে বলতেই এ-মন্তব্য তাঁর।

ডঃ চট্টোপাধ্যায় অদ্ভুত গুণী মানুষ। ত্রিপুরায় শিক্ষার উন্নতির জন্যে অনেক কিছু করেছেন তিনি। গোপালবাবু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার কানে কানে বলেছিলেন,—মনে রেখো। লাইট অব্ ত্রিপুরা।

মনে রেখেছিলাম। কিন্তু তবু, সেদিন তাঁর কথা সমর্থন করতে পারিনি। উদ্ধত জবাবই দিয়েছিলাম,—মানুষ ইচ্ছে করলে আলাদীনের চেয়েও বড় হতে পারে।

—হ্যাঁ, পারে,—ডঃ চট্টোপাধ্যায়ও ছাড়বেন না,—তবে সে-মানুষ আমাদের মতো কেউ নয়; রূপকথার।

—ব্যস! খুব হয়েছে। এখন থামো,—এবার মন্তব্য করেন অপর সঙ্গী ডঃ মিসেস চট্টোপাধ্যায়,—তর্ক থামিয়ে এখন অন্য কথা বলো।

আগেও লক্ষ্য করেছি, ডঃ মিসেস চট্টোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতাই এইখানে। তর্ক-টর্কের মধ্যে নেই উনি। সব কিছু ভালোবাসা দিয়ে দেখেন। তাই তর্কের আগুন তাঁর সামনে জ্বললে নিভতে বড় একটা সময় নেয় না।

প্রথম সাক্ষাতের দিনে। কলেজ-টিলায় তাঁর ঘরে বসে গল্প হচ্ছিল। আদিবাসীদের শিক্ষা নিয়ে কী একটা ব্যাপারে যেন গোপালবাবুর সঙ্গে ডঃ চ্যাটার্জী কিছুতেই একমত হতে পারছিলেন না। এমন সময় হঠাৎ মিসেস চ্যাটার্জী সব কিছু ভণ্ডুল করে দিলেন। আমাদের সামনে একরাশ খাবার রেখে বললেন,—ব্যস! এবার ইণ্টারভ্যাল। খেয়েদেয়ে তারপর লড়াই।

কিন্তু আর কি লড়াই জমে? জ্বলন্ত কাঠের উপর কেউ যদি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয় তো সে-কাঠ আর কি তেমন জ্বলে?

না, সেদিনও জ্বলে নি; আজও না। তর্ক থামল। অন্য কথা উঠল।

মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের দিকে তাকিয়ে বারবার মনে হল আমার, এ যেন কলেজ নয়, প্রাসাদ। ছোটখাটো এক রাজমহল।

ঠিক রাজবাড়ির মতোই গম্ভীর এ। ঠিক তেমনি ঐশ্বর্যদীপ্ত।

প্রধান প্রবেশ-পথের দু'পাশে দর্শনীয় দু'টি গম্বুজ। ছাদের ওপর মূর্তিমান দু' দু'টি ছত্রধর যেন। রাজা যুদ্ধ জয় করে এলে ওরই ছায়ায় যেন অন্তঃপুরিকারা আসবেন। মঙ্গলশঙ্খ বাজাবেন।

রাজার নাম মহারাজা বীরবিক্রম। আর একটু এগোলে চোখে পড়বে, তিনি এসে গেছেন। কলেজে ঢুকতেই তার মর্মরমূর্তি অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আপনাকে।

কলেজটি দোতলা। তবে ছোটবড় অনেকগুলো গম্বুজ, বিরাট বিস্তৃত কলেজের সম্মুখভাগ এবং নয়নাভিরাম পরিবেশ তাকে এমন একটি মহিমা দিয়েছে যে, প্রথম দর্শনেই তাকে অন্য অনেক কলেজ-বাড়ি থেকে আলাদা মনে হয়।

পশ্চিমদিকে, খানিকটা নীচে বিরাট এক হ্রদ। সেই হ্রদের গা-ঘেঁষে খেলার মাঠ।

কলেজ-বাড়ি থেকে উত্তরে এগোন একটু; আর একটা মাঠ। পশ্চিমে এগোন, আরও একটা। যেন মাঠ-ময়দান, গাছ-গাছালি আর হ্রদই মুখ্য; কলেজ গৌণ। যেন ওদের খাতিরেই কলেজ; কলেজের খাতিরে ওরা নয়।

সেদিন আরও খানিকক্ষণ ঘুরলাম সেখানে। তারপর ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি হয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে বেলা দশটা।

ফিরে দেখি, মেজর শম্ভু সাহা। অপেক্ষা করছেন আমাদেরই জন্যে।

মনে পড়ল, প্রথম আলাপেই হাতির গল্প শুনিয়ে তাক লাগিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

- বাইগনা, তুমরা নাকি মণিপুর যাইবা ?—ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন,-- কাইলঐ (আগামীকালই) যাইবা নাকি ?

বললাম,—হ্যাঁ।

—নাগাল্যাণ্ড হইয়া ফিরবা ?

—হ্যাঁ।

—যাও। দেইখ্যা আইয়ো (দেখে এসো)। আমিও গেছিলাম একবার। সরকারী কামে। মজা পাই নাই।

—কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন বুঝি ?

—ব্যস্ত ?···না না। মুটেও (মোটেও) না। সারাদিন পান খাইয়া আর গল্প কইরা কাডাইছি (কাটিয়েছি)। আহা ! মণিপুরের কি পান রে বাইগ্না ! একটা খাই, পরাণ কয় আরেকটা। কুহিমার (কোহিমার) পানও,—কথাটা বুঝছ নি,—মজাদার।

—তাহলে মজা পান নি, বললেন যে ?

—ঐ আর কি, ঘুইরা-বেড়াইয়া (ঘুরে বেড়িয়ে) পাই নাই। খাইয়া-লইয়া (খেয়েদেয়ে) পাইছি।

—ঘুরতে আপনার ভালো লাগে না ?

—ভালো ত দূরের কথা রে বাই্গনা। কও সে মজা লাগে না।

—তা লাগে না, আমি কী করুম ?—একটু থেমে মুখে একটা পান পুরে নিজের অক্ষমতা জানান শম্ভুবাবু।

গোপালবাবু বলেন,—কিছুই করবার নেই। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।

শম্ভুবাবু খুব খুশি,—হ, কইছেন গুপালদা। জব্বর (দামী) কথাডা কইছেন। এই যেমুন (যেমন), আমার রুচি পানে ; আবার ইস্ফলের শান্তি চক্করতির (চক্রবর্তী) হুটকীতে (শুঁটকী)।

গোপালবাবু শুধোলেন,—শান্তি চক্রবর্তী ! মানে, মণিপুর ওয়েট্স্ অ্যাণ্ড্ মেজার ডিপার্টমেন্ট্-এর কন্ট্রোলার ? আগরতলায় যা'র বাড়ি ?

—ধরছেন ঠিকঐ,—শম্ভুবাবু আর একটা পান মুখে দিয়ে শুরু করলেন,—হের লেইগ্যা (তার জন্যে) কিছু হুটকী আনছি। আপনেগ লগে দিমু।

গোপালবাবু বললেন,—বেশ তো, দেবেন। তবে ঠিকানাও দেবেন যেন। শান্তিবাবু কোথায় থাকেন, ঠিক জানি না।

—জাননের দরকার নাই,—শম্ভুবাবু ছোপ-ধরা দাঁতগুলো বের করে ফিক করে হাসলেন একটু। মুখে কিছু জর্দা পুরে দিয়ে শুরু করলেন,—হুটকীর গন্ধ পাইলে হে নিজে নিজেই আইব। কথাডা বুঝছেন নি ?

গোপালবাবু বললেন,—বুঝলাম। তবু ঠিকানাটা দেবেন। সাবধানের মার নেই।

সেদিন ঠিকানা দিয়ে এবং তার চেয়েও বড় কথা, ত্রিপুরার শুঁটকী সম্পর্কে সরস একটি ভাষণ দিয়ে শম্ভুবাবু উঠলেন। বারবার করে বললেন, আবার ত্রিপুরায় এলে আমরা যেন অতি অবশ্যই তাঁর বাড়ি যাই। যেতাম; হয়তো বা সেদিনই। কিন্তু সময় হল না। মণিপুর টার-এর উদ্যোগ-আয়োজন করতেই দিনটা পেরিয়ে গেল।

পরদিন। সকাল নটায় ফ্লাইট। ভোর থেকেই বাঁধাছাঁদা চলছে। শক্তিবাবু এসেছেন। এয়ার-পোর্ট অবধি পৌঁছে দেবেন আমাদের।

ঝন্টু খুব ব্যস্ত। গোপালবাবুর জিনিসপত্র গোছগাছে সাহায্য করছে।

সাড়ে সাতটা নাগাদ সহযাত্রী সুধীরবাবু এলেন।

অধ্যাপক সুধীর সাহা। বি. টি. কলেজের ভূগোলের প্রধান। আগেই বলেছি এঁর কথা। ইম্ফলের টিকিট কাটতে এঁকে নিয়ে এয়ার-অফিসে যাই।

সুধীরবাবুর বয়স চল্লিশ পেরোয় নি। কিন্তু সেদিন ঘরে ঢুকেই চুয়াত্তরের বুড়োদের মতো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

শুধালাম,—ব্যাপার কী সুধীরবাবু ?

—না, কিছু না; বলেই বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন

ভদ্রলোক। কয়েক সেকেণ্ড কী যেন ভেবে নিয়ে শুরু করলেন,—মণিপুরে খুব নাকি গণ্ডগুল (গণ্ডগোল)! আর নাগাল্যাণ্ডে ত কথাঐ নাই। হেড্‌-হান্টাররা ঘুইরা বেড়ায়। ফির্‌রি কি না-ফির্‌রি তার ত ঠিক নাই। খুশি, তুলু আর হেগো (ওদের) মা'র কাছ থিক্যা (থেকে) আওনের সময় মনডা খারাপ হইয়া গেল।

বললাম,—বৃথাই ভাবছেন। কোনো ভয় নেই।

—ইডা (এটা) আপান বুঝলেন। কিন্তু খুশির মা বুঝলে ত?

—বুঝবেন, আপনি বুঝলেই ঠিক বুঝবেন উনি,—বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন অধ্যাপক কৃষ্ণমোহন সরকার।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বি. টি কলেজের আরও কয়েকজন অধ্যাপক এলেন। বেণুবাবু, বৈষ্ণববাবু, চ্যাটার্জীবাবু—অনেকেই।

একেবারে শেষ মুহূর্তে মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের বাংলার অধ্যাপক আমার সহপাঠী ডঃ কার্তিকচন্দ্র লাহিড়ী হাজির। বললাম, —কার্তিক, তুই।

—হ্যাঁ, চলে এলাম। তুই এসেছিস শুনে।

—এ ক'দিন কোথায় ছিলি?

—কোলকাতায়।

—কবে ফিরলি?

—কাল বিকেলে। ফিরেই শুনলাম, খোঁজ করেছিলি।

—হঠাৎ কোলকাতায়?

—বেড়াতে।

—ছি ছি! সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় তোদের।

—সুখে আছি, কে বললো?

—আমিই বলছি। ভালো কলেজ, পাকা চাকরী, মোক্ষম কোয়ার্টার, নিরিবিলি জায়গা এবং সবচেয়ে বড় কথা, অঢেল অবসর। আবার কী সুখ চাই?

—আরও অনেক চাই। কী জানিস, অঢেল অবসর বলেই

অসুখী আমরা। কাজকম্মো মানে, নিজেদের লেখাপড়া কিছুই হয় না।

—বলিস কী!

—ঠিকই বলি। অবস্থাটা আলিবাবার মতো। গুহায় ঢুকেছি, সামনে প্রচুর ধনরত্ন। কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা নেবো, ঠিক করতে পারি না। এত সময়ের কোন্‌খানটা কীভাবে কাজে লাগাবো, হদিস পাই না।

—তা তোরা কলকাতার লেখকরা তো দিব্যি আছিস,—একটু থেমে আবার শুরু করে ডঃ লাহিড়ী,—এত ব্যস্ততার মধ্যেও লিখছিস ঠিক।

বললাম,—তা লিখছি। কিন্তু ভালো কিছু হচ্ছে কি?

—হবে,—ডঃ লাহিড়ীর সাফ জবাব,—এবারেও এই ভ্রমণ নিয়ে একখানা ভালোগোছেরই ছাড়বে; কেমন? তাই না?

বললাম,—ঠিক নেই কিছু।

—ঠিক নেই? কার্তিক ছাড়বার পাত্র নয়, বললেই বিশ্বাস করবো? তোকে চিনি না? স্কুলে পড়বার সময় 'দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণ' লিখলি। কলেজে ম্যাগাজিনে ছাড়লি 'আমতায় কয়েকদিন'। তোকে চিনি না?

উপস্থিত সকলেই, এমনকি সুধীরবাবু পর্যন্ত কার্তিকের কথায় হেসে উঠলেন।

আমি অপ্রস্তুত। কী জবাব দেবো ভাবছি, এমন সময় কার্তিকই সহায় হল,—নাও। তৈরি হও। দ্বিজেন্দ্র জীপ নিয়ে রেডি।

আটটা নাগাদ বেরোলাম। চার সহযাত্রী—আমি, গোপালবাবু, অঞ্জলি ও সুধীরবাবু। এছাড়া, শক্তিবাবুও সঙ্গে। এয়ার-পোর্ট চলেছেন আমাদের বিদায়-অভিনন্দন জানাতে।

দ্বিজেন্দ্র যথারীতি বীর-বিক্রমে চালালো! কলেজ-টিলা থেকে নেমেই গাড়ি তীরবেগে ছুটল।

শক্তিবাবু বাধা দিলেন একবার,—দ্বিজেন্দ্র, একটু আস্তে।

কিন্তু কে কা'র কথা শোনে! একবার একটু আস্তে চালিয়েই দ্বিজেন্দ্র আবার আগের মূর্তি ধরল। এবং গাড়িটাও এক গর্তের মধ্যে পড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল ভীষণভাবে।

গোপালবাবু মৃদু ধমক দিলেন,—আস্তে চালাও। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

—ডরানেরও (ভয় পাবারও) কিছু নাই স্যার।—দ্বিজেন্দ্রর স্পষ্ট জবাব,—গাড়ি উল্টাইলেঅ (উল্টোলেও) মাডির (মাটির) উপরঐ থাকব। একপ্লেনের লাখান (মতো) ঘুম্মুইর দিয়া (ঢুম করে) পড়ত না। গাড়ি এস্‌কিডেণ্ট্‌ অইলে (হলে) মরণের আগে উগলা-দুইলা (একটা-দুটো) কথা কওন যাইব।

মনে পড়ল,—হ্যাঁ ঠিক। দ্বিজেন্দ্র সেদিনও বলেছিল বটে, মাডির (মাটির) নীচে টেকা রাখছি, পুষ্কনির ধারে সুনা (সোনা) রাখছি, ইতান (এসব) কইয়া মরণ যাইব।

আর মনে পড়ল, মাটির নীচে দ্বিজেন্দ্ররও টাকা আছে কিছু। 'তিনশ তেরো টাকা চল্লিশ পুইসা'।

মিনিট কুড়ির মধ্যে এয়ার-পোর্ট পৌঁছুই।

প্লেন লেট আসছে। প্রায় আধ ঘণ্টা। লাউঞ্জে তাই অপেক্ষা করি। গল্প জমাই।

দ্বিজেন্দ্রর কথা ওঠে।

—ও ফেরে নি?—গোপালবাবুকে শুধোই।

—কার কথা বলছ? দ্বিজেন্দ্র?—জবাব আসে অপর দিক থেকে —না, প্লেন না-ছাড়া অবধি ও ফিরবে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

—কেন?

—ইও ওর স্বভাব। বললেও শুনবে না।

—হ্যাঁ, অনেক সময়ই কথা শোনে না ও ; লক্ষ্য করেছি।

—ঠিক। ঠিক তাই।···আসলে কী জানো, ওর দেহে আছে রাজরক্ত। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে কী নাকি সম্পর্ক আছে ওর। তাই মাঝে মাঝে রাজোচিত একগুয়েমি ওকে পেয়ে বসে। অথচ ও লোকটা কিন্তু ভালো। খুব ভালো। ইচ্ছে হলে সারাদিন এইরকম দাঁড়িয়ে থাকবে। দরকার হলে সারা রাত গাড়ি চালাবে। তবু মুখ ফুটে একবার বলবে না, 'স্যার, কষ্ট হচ্ছে ; পারছি না।'

বললাম,—কিন্তু কথা তো অনেক বলে ও! মিতভাষী মোটেই নয়।

গোপালবাবু বললেন,—তা নয়। তবে ওর কথার বেশির ভাগই নিজের খুশিমাফিক। অন্য কে খুশি হল আর না হল, তা ভেবে নয়।

বললাম,—আশ্চর্য!

গোপালবাবু সায় দিলেন,—যা বলেছ।···বীর বিক্রমের ছেলে কিরীট বিক্রমের সঙ্গে ছেলেবেলায় ও খেলতো। সেই থেকেই···

কথা শেষ হয় না। হঠাৎ দ্বিজেন্দ্র কিছু ফুল নিয়ে হাজির।

আমাদের হাতে ওগুলো গুঁজে দিয়ে বললে,—আনি খা তং থগ (আমি খুশি হয়েছি)।···আমরাও খুশি। মনে হল, সারা ত্রিপুরার হয়ে দ্বিজেন্দ্র আমাদের বিদায় জানাচ্ছে।

এদিকে দেখতে দেখতে সময় গড়ায়। প্লেন আসে। রোদে-ঢাকা রাণ-ওয়ের দিকে এগোই। শক্তিবাবু প্লেন-এর সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দেন।

—আবার আসবেন। মনে থাকে যেন,—বিদায় জানিয়ে তিনি বলেন,—আনি খা তং থগ (আমি খুশি হয়েছি)।

দ্বিজেন্দ্র পাশেই ছিল। আবার বললে—আনি খা তং থগ।

হাত নেড়ে সায় দিলাম,—আনি খা তং থগ।

চলেছি আমরা। ঝড়ের বেগে।—

ফ্রেণ্ড্শিপ বিমানটি দেখতে দেখতে আকাশে উঠল। ত্রিপুরার বন-পাহাড়কে পেছনে ফেলে কাছাড়-অরণ্যের দিকে এগোল।

পাশেই সহযাত্রী সুধীরবাবু। কী যেন ভাবছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ মুখ খুললেন,—মাও-মণিপুরে কাইলঅ (গতকালও) খুন হইছে দুইটা। খুশির মা কইছিল ; রেডিওতে শুনছে।

বললাম,—ও হল মিলিটারী বনাম নাগাদের এনকাউণ্টার। ও নিয়ে আমি-আপনি ভয় পাবো কেন ?

—না না, ঠিক ভয় না ;—সুধীরবাবু একটু যেন লজ্জিত,—কইছিলাম কী, যামু (যাবো) ত হেইদিকেঐ (ওদিকেই) ; ইম্ফল লাইম্যা (নেমে) মুটরে (মোটরে) মাও-মণিপুর দিয়া কুহিমা (কোহিমা)।

বললাম,—হ্যাঁ, তা তো যাবোই। কী হয়েছে ওতে ? নাগাল্যাণ্ড থেকে পীস-সেন্টারের গাড়ি পাঠাবেন ডঃ আরাম। ইম্ফল থেকে সে গাড়ি আমাদের কোহিমা পৌঁছে দেবে। অতএব যা'ই হোক না কেন, আমাদের ভয় নেই।

—হ, বুঝলাম ;—সুধীরবাবু কিছুটা আশ্বস্ত এবার,—কিন্তু নাগাদের কি বিশ্বাস আছে ? হেড্-হাণ্টার না ?

—না, না। মোটেও না,—সামনের আসন থেকে গোপালবাবুর প্রতিবাদ,—ওরা সাহসী। উদার।···সুধীরবাবু চুপ করলেন এবার। আমিও।

পাশের জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকালাম। ত্রিপুরার পাহাড়গুলোকে হঠাৎ একবার উদয়পুরের অমরসাগর বলে ভ্রম হল। যেন ঢেউ উঠেছে সাগরে। মন্ত্রবলে কে যেন ওদের স্তব্ধ করেছে।

কিন্তু ত্রিপুরার পাহাড় কাছাড়ের তুলনায় ছোট। অনেক ছোট।—

খানিকক্ষণ বাদে কাছাড়-অরণ্যের ওপর দিয়ে যাবার সময় সুধীরবাবুকে বলতেই উনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন,—ছুড় (ছোট) ত হইবঐ (হবেই)। গাছের ডালপালার মতো ব্যাপার না। কাণ্ডের থিক্যা (থেকে) যত দূরে যাইব, তত ছুড় হইব। বুঝলেন নি কথাডা (কথাটা) ? কাণ্ড হইল হিমালয়। আর ডালপালা হইল হেরা (ওরা)—নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, কাছাড, ত্রিপুরা

উপমাটা ভালো লাগল। বললাম,—বাঃ! বেশ বলেছেন। চমৎকার।

গোপালবাবু যোগ করলেন,—এমন সুন্দর উপমা দেন বলেই ভূগোলের এই অধ্যাপকটির এত নামডাক।

—নাম-টামের কথা জানি নে,—গোপালবাবুর পাশের আসন থেকে অঞ্জলির মন্তব্য,—তবে শুনেছি, কেউ কেউ নাকি বলেন, ভ্রমণের সঙ্গে বিমানের বিরোধ। আমার কিন্তু ধারণা, কথাটা সবক্ষেত্রে ঠিক নয়। এবং বিশেষ করে যে দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা এখন চলেছি, সেইরকম ক্ষেত্রে। যদি ঠিক হ'ত তবে সুধীরবাবুর ব্যাখ্যার বেশ খানিকটা অংশ চোখের সামনেই ঠিক এমনভাবে জীবন্ত দেখতাম না।

অঞ্জলির কথাটা যথার্থ। কাছাডের রাজধানী শিলচর পেরোতেই পাহাড়গুলো জীবন্ত হয়ে উঠল। মনে হল, যেন ওদের গা-ঘেঁষে চলেছি। ওরা হাতছানি দিচ্ছে। পেঁজা তুলোর মতো মেঘের উত্তরীয় গায়ে জড়িয়ে লুকোচুরি খেলছে কেউ কেউ। আবার কেউ কেউ অনেকটা নীচুতে ক্লান্ত স্তব্ধ পথিকের মতো বসে।

এদিকে খোদ মণিপুরের আকাশে পড়ি যখন, পাহাড়গুলো তখন প্রহরীর রূপ ধরে। ভৈরব-ভীষণ দৌবারিকের মতো শির উঁচু করে পথ আগলায়।

ফ্রেণ্ডশিপ্ বিমানটি বলাকার মতো ভাসতে ভাসতে ওপরে ওঠে আরও। মেঘলোক ছিঁড়েফুড়ে ছোটে।

সুধীরবাবু মন্তব্য করেন,—এইরম সময়ঐ (এরকম সময়েই) বিপদ। পাহাড়ের লগে ঘষা খাইলে অক্করে (একেবারে) ঠাণ্ডা।

—শুধুমাত্র বিপদের কথাই বা ভাবছেন কেন ?—গোপালবাবুর স্পষ্ট জবাব,—এই যে মেঘসমুদ্র, এর সৌন্দর্যের দিকটাও ভাবুন। বিরোধ নয়, সমন্বয়কেও খুঁজুন।

—খুঁজলে বিপদও আছে স্যার,—সুধীরবাবুর স্পষ্ট উত্তর—এই ত হেইদিন (সেদিন) সমন্বয় খুঁজতে গিয়া শিলচরের কাছে একটা প্লেন ভাইঙ্গা (ভেঙ্গে) পড়ল। তিরিশজন প্যাসেঞ্জারের একজনও বাঁচে নাই।

বললাম,—ভ্রমণের সঙ্গে বিমানের বিরোধটা আপনার ক্ষেত্রে যোল আনা খাটে দেখছি।

গোপালবাবু বললেন,—অথচ সমন্বয় খুঁজলে ওখানেও লাভ।

—আসলে আমার কী মনে হয়, জানো ?—কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে আবার শুরু করেন তিনি,—জীবনে যত বেশি সমন্বয় খুঁজবো আমরা, আনন্দও তত বেশি পাবো।

—কিন্তু স্যার,—সুধীরবাবুর সাফ জবাব,—জীবনটাই যে বিরোধের ক্ষেত্র। স্ট্রাগ্‌ল ফর এক্‌জিস্‌টেন্‌স্।

গোপালবাবু বল্‌লেন,—অস্বীকার করি নে। কিন্তু তবু, বিরোধটাই সব নয়। ওই দেখুন···। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে চারিদিক। মণিপুর আমাদের অভ্যর্থনা করছে।

তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ, অভ্যর্থনাই বটে। মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। আশেপাশে, চারিদিকে অজস্র পাহাড় সূর্যস্নানে ব্যস্ত।

—হ, আবহাওয়া অখন ভালঐ,—সুধীরবাবু বললেন একবার,—কিন্তু স্যার, ডঃ আরাম গাড়ি না পাডাইলেঐ (পাঠাইলেই·)ত গেছি ! ··হুঁ, ভালো কথা, তাইন্‌রে (ওনাকে) কবে যেন্ টেলিগ্রাম করছিলেন ?

—পরশুর আগের দিন। এর মধ্যে পেয়ে গেছেন নিশ্চয়ই।

—যদি না পান? নাগাল্যাণ্ডের পোস্ট্যাল ডিপার্টমেণ্ট আমাগো ত্রিপুরার লাখান (মতো) লেইট্‌-লতিফ্‌ হয় যদি ?

—আবার বিরোধ খুঁজছেন ?—গোপালবাবু হাসতে হাসতে মৃদু ধমক দিলেন এবার।

আমরাও সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

এদিকে পৌঁছে গেছি প্রায়।—

শিলচর ছাড়বার পর মিনিট কুড়িও পেরোয়নি, ফ্রেণ্ড্‌শিপ্‌ বিমানটি নামতে শুরু করেছে।

খানিকটা নীচে স্পষ্ট চোখে পড়ছে ইম্ফল বিমান-বন্দর। পাহাড় দিয়ে ঘেরা। থালার মতো একটা জায়গার মাঝখানে যেন।

দেখতে দেখতে নেমে আসি। আকাশ থেকে মাটিতে ফিরি।

কিন্তু একী হালত মাটির? ফুলবাগিচার মাঝখানে ফণিমনসার মতো অতি সুন্দর এই পাহাড়ভূমিতে সশস্ত্র প্রহরীরা কেন ?—বিমান থেকে নেমে লাউঞ্জ-এর দিকে এগোবার সময় আশ-পাশের পরিবেশ থমথমে ঠেকে।

এদিকে এয়ার-অফিসের ছাদে তিন তিনটি বন্দুকধারী সঙীন উঁচিয়ে 'রেডী'। যেন যে কোনো মুহূর্তে যা খুশি ঘটতে পারে। মোকাবিলা করবে বলে প্রস্তুত।

ভাবলাম, 'ডিসটারবড্‌ এরিয়া' সন্দেহ নেই। কিছু হয়তো ঘটে। না হলে রবটা এমন সাজ-সাজ কেন ?

এতক্ষণে এগিয়েছি অনেকটা। 'রাণওয়ে' পেরিয়ে 'এয়ার-অফিস'-এর সামনে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, জহর-কোট গায়ে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

লোকটি মণিপুরী। খর্ব নাক, উঁচু চোয়াল এবং পুরু ঠোঁট দেখে সন্দেহ বদ্ধমূল হল।

তাঁর পোশাক-আশাক অতি সাধারণ। চোখে পুরু লেন্‌স্‌-এর চশমা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। চুল উসকো-খুসকো। আপন-

ভোলা সাদাসিধে একটা ভাব। প্রথম দর্শনে বোঝবার জো নেই, সমাজের ঠিক কোন্ স্তর থেকে এসেছেন।

—প্রিন্সিপ্যাল ভট্‌চায্ কেউ আছেন?—গোপালবাবুর সামনে গিয়ে পরিষ্কার ইংরেজীতে তিনি শুধোলেন। পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। বললাম,—হ্যাঁ, ইনিই।

—আমি অধ্যাপক নীলকান্ত সিং; ডঃ আরামের বন্ধু,—নিজের পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক জানালেন,—আপনাদের রিসিভ করতে এসেছি; আরামের নির্দেশে।

—খুব খুশি আমরা। খুব কৃতজ্ঞ,—গোপালবাবু অধ্যাপক নীলকান্তের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বললেন,—ডঃ আরাম কি কোহিমায় এখন?

—হ্যাঁ। টেলিগ্রাম করেছিলেন। আপনারা আসছেন, জানিয়ে।

—আপনি বুঝি ইম্ফলেই থাকেন?

—হ্যাঁ। জন্মাবধি। আমি মণিপুরী।

—না বললেও চলতো। দেখেই বুঝেছি,—মনে মনে বললাম। এবং ঠিক পর-মুহূর্তেই এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করলাম তাঁর সঙ্গে।

গোপালবাবু একটু বিস্তারিত পরিচয় করাতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই সুধীরবাবু অধ্যাপক নীলকান্তের দিকে হাত বাড়ালেন। যেন করমর্দনের প্রতিযোগিতা চলছে। সহযাত্রীটি পিছিয়ে থাকতে রাজী নন।

দেখতে দেখতে আলাপ-পরিচয় জমে উঠল। নীলকান্তের সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে এগোলাম।

ভদ্রলোক কোন্ এক আত্মীয়ের কাছ থেকে গাড়ি এনেছেন। ইম্ফলে হোটেল অবধি পৌঁছে দেবেন আমাদের।

এয়ার-পোর্ট থেকে বেশি দূরে নয় শহর। বড় জোর মাইল চারেক।

পীচঢালা বাঁধানো সড়ক ধরে এগোই। গাড়ি ঝড়ের বেগে ছোটে। দমকা হাওয়া দুরন্ত শিশুর মতো ছুটে এসে মুখেচোখে জড়িয়ে ধরে যেন। শীত শীত লাগে।

লাগবেই। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আড়াই হাজার ফুটেরও বেশি উঁচুতে এখন। অতি সুন্দর মণিপুর-উপত্যকা রূপসী প্রেয়সীর মতো এখন পাশে দাঁড়িয়ে।

সামনে বাঁয়ে, চারিদিকে পাহাড়। অরণ্যের নিটোল প্রসাধনে ভরো-ভরো। যেন ওতেও কুলোয়নি। তাই মেঘের ছিটেফোঁটা মণিমুক্তোর মতো ঝুলিয়ে-ঝালিয়ে বৈচিত্র্য আনবার প্রয়াস।

—কাম সারছে! হঠাৎ ছন্দপতন ঘটান সুধীরবাবু। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করেন,—ডঃ আরাম নিজে ত গাড়ি পাঠান নাই! কুহিমা যামু ক্যামনে?

বলতে যাচ্ছিলাম—যাবেন না; কিন্তু তার আগেই নীলকান্ত বললেন,—না না। ও নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। আপনারা মণিপুর দেখুন আগে। তারপর কোহিমা যাবেন। ডঃ আরামই ব্যবস্থা করবেন সব কিছুর। অবাক হলাম। এবং সেই সঙ্গে লজ্জিতও।

লজ্জিত কেননা, সুধীরবাবুর ফিস্‌ফিসিনি ভদ্রলোক শুনতে পেয়েছেন। আর অবাক কেননা, ভদ্রলোক যে বাংলা জানেন এবং এমনকি পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক বাংলাও, তা আগে থাকতেই আমরা কোন্ যাদুতে জানবো?

—কাম সারছে!—সুধীরবাবুর এবারের ফিস্‌ফিসিনি অনুশোচনায় ভরা। তবে আগের তুলনায় আস্তে একটু।

এদিকে গাড়িও আস্তে চলছে। বোধ করি, জনবিরল ফাঁকা এলাকা পেরিয়ে শহরে ঢুকছে বলেই।

ইম্ফল শহরটি ছিমছাম। পরিচ্ছন্ন। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার তুলনায় ঢের সুন্দর। পথের দু'পাশে ঘরবাড়ি আর

দোকানপাট যেমন, পথও তেমনি অপেক্ষাকৃত ঝকঝকে তকতকে। আর তাছাড়া, পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী হলেও পর্বত কই আগরতলায়? ইম্ফলের মতো চারিদিকে এমন মন-ভোলানো পাহাড় কই?

শহরটিতে পৌঁছেই মনে হল, পাহাড়ের দাক্ষিণ্য এখানে অবারিত, কিন্তু পাহাড়কে নিয়ে ঘর করার ক্লেশটুকু নেই।

এখানকার পথঘাট সমতল। চড়াই-উতরাইয়ের ঝামেলা নেই। অথচ পাহাড়ীয়া পরিবেশটুকু পুরো আছে। এ যেন কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অথবা নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর ছাঁচে গড়া। ঠিক পাহাড়-ঘেরা সেইরকম। ঠিক সেইরকম সমভূমির মতো।

তবে একদিক দিয়ে দেখলে, এ আবার আলাদাও একটু। মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে এখানে। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

যেতে যেতে মনে হল, পাল্লাটা মেয়েদের দিকেই যেন ভারী। যেন পুরুষকে ছাপিয়ে ওদেরই রাজত্ব এখানে। দোকানে ওরা, ফুটপাথে ওরা; পথেও ওদেরই মিছিল।

পায়ে হেঁটে চলেছে কেউ। কেউ বা সাইকেলে।

দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে সাইকেল আসছে। রাজপথ অবরোধ করছে যেন।

গাড়ি সাবধানে এগোয়। পথ অবরোধ করা সাইকেলের ঝাকগুলো দু'ভাগ হয়ে যায় দেখতে দেখতে। স্টিমার বা লঞ্চের পাশ দিয়ে জলস্রোত যেমন, ওরাও ঠিক তেমনি আমাদের গাড়িটিকে মাঝখানে রেখে ছোটে। একটু গিয়ে ঠিক স্রোতের মতোই মিলে যায় আবার। সবাই আবার দল বেঁধে চলে।

ছোট ঝাঁকগুলো দু'ভাগ হয় না। টলতে টলতে, দুলতে দুলতে বাঁ-পাশে সরে গিয়ে পথ দেয়।

অবাক হয়ে দেখছিলাম। নীলকান্তের কথায় চমক ভাঙে,—এই যে, আসুন। নামতে হবে এইবার।

নামলাম। দেখি, সামনেই এক হোটেল। উল্টোদিকে খেলার মাঠ।

নীলকান্ত বললেন,—এই হল 'হোটেল ডিপ্লোম্যাট'। এখানেই থাকবেন আপনারা। ডঃ আরাম জানিয়েছেন।

গোপালবাবু খুব খুশি এ-প্রস্তাবে। বললেন,—বেশ তো।

ডিপ্লোম্যাট হোটেলের বাড়িটি দোতলা।

একতলায় নানা ধরনের দোকান। মেডিকেল স্টোর্স থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্ট অবধি। দোতলায় হোটেল।

ডিপ্লোম্যাট-এ ভালো ঘর দেখে থাকবার ব্যবস্থা হল। নীলকান্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু তদারক করলেন।

কিন্তু তার দরকার ছিল না। কারণ, হোটেলের মালিক শান্তিলাল চুনেজা এত কর্মতৎপর এবং সপ্রতিভ যে, পারলে খদ্দেরদের জুতো পর্যন্ত নিজেই খুলে দেন।

ভদ্রলোক অতি অমায়িক। পাকা ডালিমটির মতো দেখতে। গাল দু'টো ঠিক তেমনি লাল।

মাথায় একরাশ চুল। ধবধবে সাদা। হঠাৎ দেখলে ভ্রম হয়, নতুন-পড়া তুষার বুঝি।

শান্তিলালের ছেলে রামলাল ঠিক তার উল্টো। কদম-ছাঁট চুল, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি এবং খুনীর মতো লাল টকটকে চোখ নিয়ে ঘুরে ঘুরে এসে এমনভাবে তাকাল যে, তার বাবা পরিচয় করিয়ে না দিলে ভাবতাম ডাকসাইটে কোনো গুণ্ডা বুঝি ; আগন্তুক দেখে নজর রাখছে।

রামলালের পোশাক-আশাকও চুল-দাড়ির সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো।

চোঙা প্যাণ্ট, ছুঁচলো জুতো এবং আঁকিবুকি করা হাওয়াই শার্ট দিব্যি মানিয়েছে ওর দেহে।

নীলকান্ত লক্ষ্য করেছিলেন, ছেলেটির হাবভাবে আমরা একটু বিব্রত। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই অভয় দিলেন তিনি,—আরে, ও তো রামলাল! দেখতে ওইরকম হলে হবে কী, ছেলে খুব ভালো।

আর ভালো! অঞ্জলি ওদিকে ভয়ে কাঠ। সুধীরবাবু ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। যেন ভাবটা এই যে, যতই কেন নজর রাখ না ভায়া, আমরাও কম যাই না। গোলমেলে কিছু করেছ কি এই সুধীর শর্মাই শায়েস্তা করবে তোমায়।

—হে (সে) যেমুন (যেমন) শিসও দেয় আবার!—নীলকান্ত বিকেল চারটে নাগাদ আসবেন বলে বিদায় নিতেই সুধীরবাবুর স্বগতোক্তি।

বললাম,—দিক না। কান না দিলেই হল।

কিন্তু না, শেষ অবধি বাধ্য হলাম কান দিতে।

বিকেল সাড়ে চারটে তখন। নীলকান্তকে নিয়ে বেরোচ্ছি হঠাৎ দেখি, শ্রীমান রামলাল, শিস দিতে দিতে এবং আপন মনেই হাতপায়ের কিছু মুদ্রা প্রকটিত করতে করতে আমাদের একেবারে সামনে।

ভাবলাম লজ্জিত হবে বুঝি। কিন্তু না, সে গুড়ে বালি। উল্টে এমনভাবে তাকাল যে, লজ্জিত হয়ে আমরাই পালাবার পথ পাই না।

—যাবেন কোথায় আজ?—পথে বেরিয়ে নীলকান্তকে শুধালাম, —কোন্খানে?

—ঠিক কোনোখানেই নয়,—উনি বললেন,—এই ধরুন, আশে-পাশেই।

বললাম,—বেশ তো!

গোপালবাবুও সায় দিলেন,—খুব ভালো।

ব্যস, শুরু হল ঘোরা। হোটেলের সামনেকার জনবহুল রাস্তাটা ধরে এগোলাম।

সাইকেলের স্রোত তখনও ঠিক তেমনি। বরং আগের তুলনায় বেশি একটু। বোধ করি, স্কুল ছুটি হল। ছাত্রীরা ফিরছে।

গায়ে ওদের রঙ-বেরঙের জামা। রকমারি চাদর। কোমর এবং পায়ের দিকটা লুঙ্গীর ছাঁচে ঢাকা।

কা'রও কা'রও গায়ে আবার সোয়েটার। নানা রঙের। নানা ডিজাইনের।

হঠাৎ দেখলে মনে হয়, চলমান রামধনু বুঝি। আকাশ থেকে পথে নেমেছে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিলাম সেদিন। বারবার তাকাচ্ছিলাম।—

নীলকান্ত তা' লক্ষ্য করে থাকবেন। হঠাৎ বললেন,—কী দেখছেন? ছাত্রীদের?

বললাম,—হ্যাঁ। ঘরে ফিরছে বুঝি?

—রোজই ফেরে। এই সময়। সামনে তাম্পাসনা গার্লস্ স্কুল। ওতে পড়ে সব। ছুটি হলেই—

আরও কী যেন বলছিলেন নীলকান্ত। কিন্তু তাঁর শেষের কথাগুলো শোনা যায় না। আমাদের প্রায় গা-ঘেঁষে এগিয়ে চলা এক দঙ্গল ছাত্রীর কলকোলাহলের মধ্যে হারিয়ে যায়।

অবাক হয়ে হাসিখুশির ঝরনাগুলিকে দেখি আবার। ট্রামে-বাসে চিঁড়ে-চ্যাপটা হওয়া কলকাতার ছাত্রীদের কথা ভাবি।—ইস্! আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে আনন্দের বরাদ্দটা আরও একটু বাড়াতাম যদি!

এদিকে, খেয়ালই করিনি; কথা বলতে বলতে এগিয়েছি খানিকটা। হাট-মতো একটা জায়গার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

নীলকান্ত বললেন,—এই হল লেডিজ্ মার্কেট। যাবেন নাকি?

আমরা জবাব দেবার আগেই অঞ্জলি লাফিয়ে উঠল,—যেতে পারি।

—কী হবে গিয়ে?—গোপালবাবু বিরক্ত একটু,—কেনাকাটা? দেশ না দেখে বাজার?

—না না, ওকথা বলবেন না,—নীলকান্ত অঞ্জলির সহায় হলেন, এ-বাজারে অনেক কিছু দেখবার। এখানে মণিপুরী হ্যাণ্ড্লুম্ মেয়েরা বিক্রী করে।

—হ্যাণ্ড্লুম্? মণিপুরী?—সুধীরবাবু সাপের পাঁচ পা দেখেন যেন। প্রথমে বিস্ময়ে এবং তারপর আনন্দে হকচাকিয়ে যান। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে গদগদ হন,—খুশির মা কইছিল, মণিপুর থিক্যা (থেকে)—

অঞ্জলি বাধা দিয়ে বললে,—বুঝেছি। আর বলতে হবে না শাড়ী আনতে। কেমন? এই তো?

সুধীরবাবু জবাব দিলেন না কিছু। শুধু হাসলেন এমন যে, দেখে মনে হল, বাসর-ঘরে কোনো লাজুক বর, শালীর কানমলা খেয়ে প্রসন্নচিত্তে হজম করছে।

তাড়াতাড়ি এগোলাম লেডিজ্ মার্কেটের দিকে।—

কিন্তু মার্কেট বলবো একে? না কি বলবো হাট। এর চারিদিক খোলা ঘরবাড়িগুলোর সঙ্গে হাটেরই যেন মিল বেশি।

তবে সচরাচর দেখা হাট নয়। তাদের তুলনায় অনেক ছিমছাম এ। এর ছাউনিগুলো পাকা। আবার ছাউনির সামনে যে উঠোন, তা'ও সযত্নে বাঁধানো।

ওই উঠোনেও দোকান অনেক। অনেক খদ্দেরের আনাগোনা।

দোকানীরা দিব্যি পসরা সাজিয়েছে। গোপালবাবুর ভাষায়,—পসরা তো নয়, আগুন। তোমরা খদ্দের-পতঙ্গরা ওতে গিয়ে ঝাঁপ দাও। দেশ দেখতে এসে বেশ কেনো।

তা কিনলাম বৈকি। গোপালবাবু ছাড়া সবাই কিছু কিছু

কিনলাম। পাঞ্জাবীর কাপড় থেকে শুরু করে শাড়ী, লাইসাম্পি এবং এমনকি চাদর অবধি।

সুধীরবাবু চোখের পলকে খুশির মায়ের জন্যে গোটা তিনেক শাড়ী কিনলেন। চতুর্থটিতে হাত দেবেন ঠিক এমন সময় গোপালবাবু বেচারীর তপ্ত উৎসাহের উপর ঠাণ্ডা জল ঢাললেন যেন,—সক্রেটিস দোকানে গিয়ে কী বলতেন জানেন?···হাউ ম্যানি থিংগস্ আই ক্যান গো উইদাউট?

—তান্ (ওনার) কথা ছাইড়া (ছেড়ে) দেন স্যার!—সুধীরবাবু অনেকটা দমলেও জবাব দিতে ভুললেন না,—তাইন্ (উনি) হইলেন দার্শনিক। আর্কিমিডিস গুছের (গোছের) মহাপুরুষ। 'ইউরেকা ইউরেকা' কইয়া দিগম্বর হইয়া ছুটলেও তাইনগ (তাঁদের) চলে। কিন্তু স্যার, খুশির মা? আমি?

সুধীরবাবুর যুক্তি অকাট্য। রীতিমত বেকায়দায় পড়লেন গোপালবাবু। লজ্জায় তাঁর চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠল। একবার বললেন,—আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? বৌমার জন্যে আমি যদি একটা শাড়ী কিনি?

সুধীরবাবু আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন,—না স্যার, ইডা (এটা) অয় (হয়) না।—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো আপত্তিই টিকল না। আমাদের সকলের জন্যে কিছু কিছু কিনে উনি ঠাণ্ডা হলেন।

—আপনার কই?—সক্রেটিস্-এর সমর্থক অঞ্জলির কাছে ধরা পড়ে গেছেন।

বললেন—না না। আমার কিছু লাগবে না।

—তা কখনও হয়!—বলেই সামনের দোকানটি থেকে একটা চাদর বেছে নিল অঞ্জলি। গোপালবাবুর হাতে গছিয়ে দিয়ে বললো,—এটা আমি আপনাকে দিলুম।

—বেশ! আমিও নিলুম;—বলেই গোপালবাবু শিশুর মতো হাসলেন একটু।

সেদিন লেডিজ্ মার্কেটে আরও খানিকক্ষণ ঘুরলাম।

গোপালবাবু পালাতে ব্যস্ত। বারবার বলেন,—এখানে নয়; অন্য কোথাও চলো।··কিন্তু চলি কী করে?—

দোকানীদের সঙ্গে গল্প জমছে একে একে। নানান সব কথা হচ্ছে।

একজন শুধোল,—অদোম্ কাড়েদাগি লকপিবানো (কোত্থেকে আসছো)?

বললাম,—কলিকাতাদাগি লক-ছেযি (কলকাতা থেকে)।

—অদোমনা লেইনিংবা পট কেইথলদাগি লেইবা ইয়ুই (বাজার থেকে যা খুশি কিনতে পারো)। ফি সবানা মেইতেই নুপিগি মাক ওইবা থাবাকনি (মণিপুরী মেয়েদের জীবিকাই হল তাঁতশিল্প)।

—হ্যা, শুনেছি সে-কথা। আগেই,—নীলকান্তকে বললাম,—মেয়েরা এখানে দূর-দূর থেকে আসে বুঝি?

—তা আসে। দশ-বিশ মাইল পথ এদের কাছে কিছুই নয়।

—এ কোত্থেকে আসছে?—সামনেকার মেয়েটিকে শুধোই,—নান্গ্গী খুল আসিদাগি কায় লপি (তোমার গ্রাম এখান থেকে কতদূর)?

—মাসিদাগি মেইল তার লপি (দশ মাইল এখান থেকে),—সে জবাব দিল।

—নাং ইয়ম্না লপ্না লকৃলা (তুমি অনেকটা পথ এসেছ)।

—আসছে বৈকি! অনেকেই আসে এরকম,—নীলকান্ত মেয়েটির হয়ে জবাব দিলেন,—না হলে খাবে কী? সংসার চলবে কী করে?

মেয়েটি ওদিকে হাসছে। তার সঙ্গিনীর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে বলতে গেলে।

শুধালাম,—নান্‌গ নোক-ইবা কাম্নিজিনো (হাসছ কেন) ?

মেয়েটি হাসতে হাসতেই জবাব দিল,—নান্‌গ্‌গী ওয়া তবাদা নোক-নিংগি (তোমার কথা শুনে)।

—আমার কথা শুনে ?—অবাক হয়ে নীলকান্তের দিকে তাকালাম।

উনি বুঝিয়ে দিলেন,—দশ মাইলকে অনেকটা পথ বললেন কিনা . তাই ও হাসছে। আসলে আরও অনেক দূর থেকেও আসে ওরা।

শুধালাম.—দূর মানে, কত দূর ?

—অনেক দূর,—বলেই নীলকান্ত আমাদের নিয়ে অন্য একটি দোকানের দিকে এগোন। বছর উনিশ কুড়ির এক তরুণীকে দেখিয়ে বলেন,—এই যে দেখছেন, মেয়েটি—এর জন্ম পথে। মা আসাংবা কিছু শাড়ী আর চাদর নিয়ে বাজারে আসছিল। এই পম্বা তখন পেটে। পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে আসাংবার। চড়াই-উতরাই বেয়ে এগোবার সময় দেহটা কুঁকড়ে যাচ্ছে কিন্তু তবু উপায় নেই . এগোতেই হবে। বাজারে এসে মালপত্তর বিক্রী না করলে পেট চলবে না তাই অসুস্থ শরীরেও এগোয় আসাংবা। পাহাড়ীয়া পথ ধরে একা চলে।··কিন্তু না, আর যেন এগোতে পারছে না সে। সাত ঘণ্টায় বিশ মাইলেরও বেশি পাড়ি দিয়ে তার মনে হচ্ছে, দেহটা অসাড় হয়ে এলো। এদিকে তলপেটে দারুণ বেদনা। দারুণ অস্বস্তি সারা দেহে।···নিরুপায় হয়ে আসাংবা তাই পথের পাশেই বসে পড়ল।

শুধালাম,—তারপর ?

—পম্বা জন্ম নিল পথে। বড় হল। একই পথ ধরে সে-ও একদিন এই বাজারে এল।

—তারপর ?

—এই তো ! দেখুন না। সামনেই সে।

দেখলাম। এতক্ষণে তাকালাম ভালো করে। মনে হল, মেয়েটি

সন্তানসম্ভবা। সে নিজে যেমন, তার সন্তানটিও তেমনি পথেই হয়তো জন্ম নেবে একদিন।

এদিকে পদ্মা লজ্জা পেয়েছে। খানিকটা দূর থেকে হলেও ওকে নিয়েই যে কথা বলছি আমরা, তা টের পেয়েছে।

তাই এগোতে হল আবার। আশ-পাশের পসারিনীদের বলতে গেলে উপেক্ষা করেই নিরাপদ দূরত্বে যেতে হল।

নীলকান্তকে শুধালাম একবার,—আসাংবাকে আপনি চিনতেন ?

—হ্যা, খুব ;—বললেন নীলকান্ত,—আসাংবার স্বামী শ্যামচাঁদকে এই সেদিনও দেখেছি। আমাদের ডি. এম্. কলেজে পিওনের কাজ করত। ইম্ফলেই থাকত।

—তোমরাও থাকবে নাকি ? এই বাজারেই ?—

গোপালবাবু এতক্ষণ অন্যদিকে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আমাদের দেরী দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাড়া দিলেন।

সুধীরবাবুর এতে আপত্তি। মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলেন তিনি,—খুশির মা কইছিল—

—না, আর খুশির মা নয় ;—গোপালবাবু বাধা দিলেন,—খুশির বাবার কথা শুনতে চাই এবার।

—খুশির বাবা ?—সুধীরবাবু একগাদা জিনিসপত্র সামাল দিতে দিতে বললেন,—না না ; আমি আর কী কমু !

—না যদি কন তো চলুন এবার,—গোপালবাবু বলতে গেলে আমাদের টেনে নিয়েই এগোলেন।

বাজারের খুব কাছে পাওনা-বাজার রোড। ঘিঞ্জি। জনবহুল।—ধীরে ধীরে এগোই তা ধরে।

নীলকান্ত মণিপুরী মেয়েদের কথা বলেন,—খুব কাজের ওরা। খুব চটপটে। পুরুষরা যখন কলকারখানায় অথবা বন-পাহাড়ে কাজ করে, ওরা তখন ঘর আগলায় ; গ্রামের বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য

করে। কেনাকাটা তো মেয়েদেরই ব্যাপার। ম্মা বাড়ি দেখিয়ে যান তো অবাক হবেন মশাই। বাজারে পুরুষ মানুষ না। মেয়েরা এখানে ভারতের অন্য সব জায়গার তুলনা: পাওনা স্বাধীন। বিয়ের ব্যাপারে দেখুন, ঝামেলা নেই। কা'র্র্রক্ষী মারা গেল, নিজের পছন্দমত বিয়ে করতে পারবে সে।···স্বামীর ১, কা'রও বনিবনা হল না; নতুন করে সে আবার ঘর বাঁধবে।···না না, সমাজ বাধা দেয় না। মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছেকে সম্মান করে বরং।

—আমরাও করি,—আমি বললাম,—এই তো, দেখুন না; সুধীরবাবু। খুশির মায়ের ইচ্ছেকে সম্মান করছেন কেমন!

সবাই এবার একসঙ্গে হেসে উঠলাম। এমনকি সুধীরবাবুও।

হাসি সামলে নীলকান্ত বললেন,—এখন চলেছি মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ। আপত্তি নেই তো?

গোপালবাবু সকলের হয়ে জবাব দিলেন,—আপত্তি? কেন থাকবে? আপনি আমাদের ফ্রেণ্ড, গাইড, ওয়েল-উইশার—যেখানে বলবেন, সেখানেই যাবো।

—লেডিজ মার্কেটে যেতে চাননি কিন্তু!

—ও! হ্যাঁ, চাইনি। বটে। বটে,—বলেই হাসলেন গোপালবাবু। আমরাও সবাই ওঁর সঙ্গে যোগ দিলাম।

এদিকে পাওনা-বাজার রোড ধরে বেশ খানিকটা এগিয়েছি। দেখতে দেখতে অনেকগুলো ঘরবাড়ি আর দোকানপাট পেছনে ফেলে এলাম।

বড় বড় দোকান এ-অঞ্চলে প্রচুর। ড্রাগ, স্টেশনারী ও ক্যামেরা থেকে শুরু করে সাইকেল এবং এমনকি মিঠাই পর্যন্ত। বইয়ের দোকান দু'-তিনটি—ও. কে. স্টোর, ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ইত্যাদি।··· সিনেমাও আছে—ইম্ফল টকিজ, ফ্রেণ্ডস্ টকিজ, ভিক্টোরিয়া সিনেমা। বিশেষ করে সিনেমা এবং সাইকেলের আয়োজনটাই এলাহী। আর মণিপুরী হ্যাণ্ডলুম-এর দোকানগুলো ফাঁকা জলসা-ঘরের মতো।···

কন্ত লোক নেই।...উইভার্স কোঅপারেটিভ
মণিপুর গভর্ণমেন্ট এম্পোরিয়াম—দু'টোরই এক

—মণিপুরী সাহিত্যের অবস্থা কিছু বলুন।—নীলকান্তকে বললাম,—সাহিত্য পরিষদে যাচ্ছি : কিছুই তো জানি না।

—আমিই বা কতটুকু জানি!—নীলকান্ত অস্বাভাবিক বিনীত,—পড়লাম দর্শন। পড়ালামও তাই। সাহিত্যের কী বুঝি!

গোপালবাবু বললেন,—যা বোঝেন, তাতেই চলবে। বলুন এবার; শুনি।

—শুনবেন? ছাড়বেন না কিছুতেই?—নীলকান্ত আমতা আমতা করেন দু'একবার। ধীরে-সুস্থে শুরু করেন,—মণিপুরীর সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর মিল যেমন আছে, ঠিক তেমনি আবার আছে অমিলও।...মিল কোথায়?—না, আর্য ও দ্রাবিড় ভাষাগুলোর মতোই সংস্কৃতকে আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে এ মেনে নিয়েছে।...কোথায় অমিল?—না, প্রায় দু' হাজার বছর ধরে মণিপুরী ভাষা তার নিজস্ব ধারাটি বজায় রাখে। প্রচুর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ গ্রহণ করার পরেও স্বতন্ত্র থাকে সে। কী জানেন, মণিপুরীর গৌরব তার ভাষাভাষীদের সংখ্যার মধ্যে নেই; আছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের মধ্যে। আর শুধু কি মণিপুরী সংস্কৃতি? ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তেও এর অবদান বড় কম নয়। অথচ এসব জায়গায় ভাষা তো আরও অনেক আছে। হিমালয়-প্রভাবিত এ পাহাড়পুরীতে তিব্বতী-বর্মী ভাষাগোষ্ঠী তো নেহাৎ নগণ্য নয়। কিন্তু হলে কী হবে! এদের মধ্যে মণিপুরীই বোধ করি সেই অগ্রগণ্য ভাষা, যে নাকি তিব্বতী-বর্মী জনগণের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিয়েছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে।......

হ্যাঁ, আমরাও পৌঁছে গেছি,—বলতে বলতে হঠাৎ থামলেন

নীলকান্ত। পথের ডানদিকে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ি দেখিয়ে বললেন,—এই হল মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ।

—এই?—অবাক বিস্ময়ে বাড়িটির দিকে তাকাই। পাওনা বাজার রোড নামক রাজপুরীতে প্রাসাদের ঠিক পাশেই প্রাসাদরক্ষী কা'রও কুঠরি দেখছি, মনে হয়।

বাড়িটি জীর্ণ, একেবারেই ছোটখাটো। ভেতরে ঢুকতে ভালো করে বোঝা গেল।

দেখি, পায়রার খোপ-মতো একটি কুঠরি। দেয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়-করানো কয়েকটা আলমারি, মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত আসামীর মতো দেখতে।

আলমারির সামনে ছোট ছোট দু'টি টেবিল এবং কয়েকটি চেয়ার। টেবিলের একপাশে মেঝের উপর চাটাই। কয়েকজন ওতে বসে কী যেন আলোচনা করছেন।

আমরা ঘরে ঢুকছি দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ওঁরা। দু' একজন উঠে দাঁড়ালেন।

এদিকে নীলকান্ত পরিচয় করাতে লেগেছেন। প্রথমে আমাদের সম্পর্কে বলে তারপর উপস্থিত সুধীজনদের দেখিয়ে বলছেন,—ইনি পরিষদের সম্পাদক ইবোহাল সিং, ইনি অমুক, ইনি তমুক।

দেখতে দেখতে সুধীরা সবাই উঠে এলেন। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। টেবিল দু'টিকে ঘিরে আমরা বসলাম।

অনেক কথা হল সেদিন। অনেক গল্প। মণিপুরী সাহিত্যের অনেক মণিমুক্তোর খবর সেদিন পেলাম।

সম্পাদক মশাই নিজে এনে এনে সব দেখালেন।

—এই হল মণিপুরী মহাভারত,—টকটকে লাল কাপড়ে বাঁধাই বিরাট একটি বই দেখিয়ে তিনি বললেন।

—আর, এই হল রামায়ণ। এই ঋগ্বেদের কিছুটা। এই ভাগবত পুরাণ, এই ভাগবত গীতা, এই ভাস-এর নাটক, এই কালি-

দাসের রঘুবংশ, এই বাণভট্টের কাদম্বরী,—আর এই যে, এরা হল মনুসংহিতা আর গীতগোবিন্দ।

দেখতে দেখতে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত হয় বই। ছোট-খাটো একটি পাহাড় গড়ে ওঠে। এদিকে সম্পাদক থামেননি তখনও। অনর্গল বলে চলেছেন,—সংস্কৃত থেকে মণিপুরীতে অনুবাদ করা হয়েছে এদের। মূল সংস্কৃত এবং অনুবাদ দুই-ই একসঙ্গে ছাপা হয়েছে।

গোপালবাবু ব্যাপার দেখে থ। বললেন,—একটা ক্যাটালগ আমি চাই। কলেজ-লাইব্রেরীর বই কিনতে দরকার হবে।

সম্পাদক জবাব দিলেন,—না। আজ কিছুই দেবো না। সব আগামীকাল। সম্বর্ধনা সভায়।

—সম্বর্ধনা ? বেড়াতে এসে রিসেপশান ?—ব্যাপারটা আমার কাছে অভিনব ঠেকল। কারণ, এত জায়গায় ঘুরেছি। কিন্তু এ জিনিস কোনোদিন কোথাও লাভ করিনি।

সেদিন ডিপ্লোম্যাট হোটেলে ফেরবার পথে ভাবছিলাম এসব। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল, গোপালবাবুর হাত খালি। চাদরটা নেই।

—কোথায় ফেললেন চাদর ? সাহিত্য পরিষদে ?—প্রশ্ন করতেই ওঁর হয়ে জবাব দিলেন সুধীরবাবু,—না না। পরিষদে তাইনের আতে (হাতে) চাদর দেখি নাই। না দেইখ্যা কইছিলামও একবার, স্যার! চাদর কই ?···স্যার তখন গা করলেন না বিশেষ। খালি কইলেন, এই যাঃ! বাজারেই বুধ (বোধ) অয় (হয়)·····
আমি তখন কইলাম, চলেন তবে! বাজারে যাই। খুঁজি গিয়া।······
তাইন (উনি) কইলেন,—না না, বাজারে না। পথেই বুধ অয়······

—ব্যস! ব্যস!—অঞ্জলি মাঝপথে সুধীরবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—আর বলতে হবে না, বুঝেছি। সেই যে, সক্রেটিস-এর কথা, 'হাউ ম্যানি থিংস্ আই ক্যান গো উইদাউট'কে বোঝার মতো।

গোপালবাবু বললেন,—না না, ঠিক তা নয়। তবে কিনা,

অন্যায় হয়ে গেল। দারুণ অন্যায়। তুমি একটু আগে জিনিসটা দিলে। অথচ আমি কিনা কোথায় রাখতে কোথায় রাখলুম!

বললাম,—আপনি তো চিরকালই এইরকম। সেই যে, সেদিন; কে যেন একটা ছবি দিল। দেবার সময় বললেন, দাও দাও। কিন্তু পরদিন ওটাই কা'র হাতে যেন গছিয়ে দিয়ে বললেন, নাও নাও।

—ও! তাই নাকি? বলেছিলাম?—গোপালবাবু অনেক চেষ্টা করলেন মনে আনতে; কিন্তু কিছুতেই পারলেন না। এদিকে সুধীরবাবুর মনে এলো হঠাৎ,—স্যার, ত্রিপুরার শম্ভু সাহা না শুঁটকী দিছিলেন? ইম্ফলের শান্তি চক্কত্তীরে দিতে কইছিলেন?

গোপালবাবু সায় দিলেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে! কিন্তু দেয়া যে হল না?

নীলকান্ত শুধোলেন,—কা'কে দেয়ার কথা বলছেন? কোন্ মিস্টার চক্রবর্তী? 'ওয়েট্স্ অ্যাণ্ড মেজারস্ ডিপার্টমেণ্ট'-এর কণ্ট্রোলার?

বললাম, —হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

—জিনিসটা আমার কাছে দেবেন। আজই পৌঁছে দেবো। বাড়ি ফেরার পথে।

—আপনি?

—হ্যাঁ, আমি। কিন্তু তাতে কী! রাত হয়েছে। আপনারা যাবেন কী করে?

নীলকান্তের যুক্তি অকাটা। রাত আটটা এখন। ইম্ফলের পথঘাট একেবারে ফাঁকা। এমন সময় অপরিচিত কেউ নতুন করে কোথাও আর যেতে পারে না।

অস্বস্তি লাগছিল। যে পথে খানিক আগেও এতো লোকজন দেখেছি, হঠাৎ তার এমন কী হল?—কারফিউ? না কোনো গণ্ডগোল? না কি মরফিয়া দিয়ে গো'টা শহরটাকে ঘুম পাড়াল কেউ?

নীলকান্তকে এই সন্দেহের ইঙ্গিত দিতেই আক্ষেপ করলেন,—আর বলেন কেন! কিছুদিন এইরকমই চলছে। সন্ধ্যে নামতেই পথঘাট সব খাঁ খাঁ।

শুধালাম,—কেন? গণ্ডগোলের ভয়ে?

—না, ঠিক গণ্ডগোলও নয়,—নীলকান্ত গলার স্বরটা হঠাৎ নামিয়ে দিয়ে বললেন,—ছেলে-ছোকরারা মাতলামি করে। চুরি, ছিনতাই লেগেই আছে।

—কন্ কী?—সুধীরবাবুর টনক নড়ল এবার,—হেষে (শেষে) আমরাও না···

নীলকান্ত বাধা দিলেন,—না না, আপনাদের ভয় নেই। আমি আছি।

সেদিন হোটেল পৌঁছে মনে হল, সত্যি আছেন তিনি। ইম্ফল আসা অবধি আগাগোড়া সঙ্গে আছেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব যেন এক দিনের নয়, এক যুগের।

রাত ন'টায় তিনি বিদায় নিলেন। যে সাইকেলটিতে চেপে বাড়ি থেকে হোটেল অবধি এসেছিলেন, তা নিয়েই জনবিরল, নিস্তব্ধ পথ ধরে একা এগোলেন। যাবার সময় স্মরণ করিয়ে দিলেন বারবার, কাল সকালে আসছেন। সাতটায়। গোবিন্দজীর মন্দির দেখাবেন।

গোবিন্দজী?—নিজের মনকেই প্রশ্ন করি সেদিন,—কোন্ গোবিন্দজী? মণিপুরের কুলদেবতা? বদ্রীনাথের প্রবীণ পাণ্ডা ধীরেন ভট্ট যাঁর কথা বলেছিলেন? বৃন্দাবনের হরিশ মহারাজ যাঁর কথা স্মরণ করে সোনার তালগাছ প্রদক্ষিণ করেছিলেন? যাঁর কথা নবদ্বীপে শুনেছি? হরিদ্বারে, হৃষীকেশে, রামেশ্বরমে, কন্যাকুমারিকায়—সর্বত্র শুনেছি? সেই?—

ডিপ্লোম্যাট হোটেলের বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসি। আগের দিন 'ও. কে. স্টোর' থেকে কেনা 'এ সর্ট হিস্ট্রি অব মণিপুর'-এর পাতা ওল্টাই—

হ্যাঁ, পেয়েছি। ইনিই সেই। মণিপুরের সর্বজনপ্রিয় সম্রাট জয় সিং এঁর প্রতিষ্ঠা করেন। আজ থেকে দু'শো বছরেরও আগে।

জয় সিংকে রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র বলে সবাই। বলে, তিনি রাজা এবং ঋষি দুইই। তরবারি হাতে বর্মীদের বিরুদ্ধে যখন রুখে দাঁড়িয়েছেন অথবা যখন ইংরেজ এবং আসামের আহোম সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তখন তিনি রাজা ; আবার যখন দেশের উন্নতি বিধান করে নিজে বেছে নিয়েছেন সরল ও অনাড়ম্বর জীবন তখন তিনি ঋষি।

এ-ঋষির জীবনকথা বর্ণনায় ইতিহাস সহস্রমুখ, ঐতিহাসিকরা উচ্ছ্বসিত। শোনা যায়, শেষ অবধি রাজ্য ছেড়ে দেশান্তরে গেলেন তিনি। রাজ-সিংহাসন ফেলে পরিব্রাজক হলেন।

কারণ ছিল। জয় সিং-এর দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুতর।

এক ব্রাহ্মণ অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। জয় সিং-এর অনুচররাই দেন। কিন্তু জয় সিং তা জানতেন না। এ-খবর যখন তাঁর কানে পৌঁছুল তখন ক্ষোভে-দুঃখে তিনি অস্থির।

—কী করেছ তোমরা ? ব্রাহ্মণকে মেরেছ ?—সিংহাসন থেকে পথে নেমে এলেন ভাগ্যচন্দ্র। প্রজাদের ডেকে বললেন,—জানো না, ব্রাহ্মণকে মারার অর্থ স্বয়ং ব্রহ্মকে আঘাত করা ? দেশের অকল্যাণ ডেকে আনা ?

প্রজারা অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করল,—সম্রাট, যে দোষী সে ব্রাহ্মণ হোক আর অব্রাহ্মণই হোক, শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

—না, কখনই নয় ; —সম্রাটের কণ্ঠস্বরে হাহাকার এবং ক্রোধ,—ব্রাহ্মণ শাস্তি পেতে পারে না। গুরুতর অপরাধেও ব্রাহ্মণের ক্ষমা আছে। মৃত্যুদণ্ডের বদলে রাজ্য থেকে নির্বাসনই তাঁর প্রাপ্য।

—তা কী করে হয় ?—প্রজাদের কেউ কেউ বললো,—দোষ এক হলে শাস্তি আলাদা হয় কী করে ?

সম্রাট জবাব দিলেন না এ-কথার। ঠিক করলেন, নিজের জীবন উৎসর্গ করে এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

হ্যাঁ, করলেন তিনি। পরদিনই বড ছেলে লাবণ্যচন্দ্রকে সিংহাসনে বসিয়ে পরিব্রাজক হলেন। প্রজারা হাহাকার করে উঠল,—মহারাজ। এত বড শাস্তি ? লঘু পাপে এত বড গুরু দণ্ড আমাদের ?

মহারাজ বললেন,—দণ্ড তোমাদের নয়। আমার একার। তোমাদের সকলের হয়ে প্রাযশ্চিত্ত করবো আমি।

—কী প্রাযশ্চিত্ত মহারাজ ?—প্রজাদের কেউ কেউ জানতে চাইলে মহারাজ জবাব দিযেছিলেন,—বৃন্দাবনে যাবো। হয যাবার পথে আর নয়তো ওখানে পৌছে দেহরক্ষা করবো।

চললেন তিনি বৃন্দাবন। চার পুত্র, তিন কন্যা এবং রাণীরা সঙ্গে চলল। কুলী রইল ৩০০ জন। আর তীর্থযাত্রী মোট ৪০০ জন।

সেদিন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের এক জানুযারী সকাল। সারা রাজধানীতে আর্তনাদ। দারুণ ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেও রাজপথে শত শত লোক।

—রাজা চললেন,—একই কথা সকলের মুখে।

—জয়। রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রের জয।—একই জযধ্বনি সকলের কণ্ঠে।

এদিকে রাজধানী ছাডালেও ধ্বনি ছাডে না। সারা মণিপুর যেন পথে। কাঙ্কীপুর, নিংথোও থোং সর্বত্রই অনুরাগীদের ভিড। পথ তো বটেই, আশে-পাশের পাহাডগুলোতে পর্যন্ত প্রজাদেব জমায়েত।

ব্যাপার কী ?—না রাজর্ষিকে সবাই একবার শেষ-দেখা দেখতে চায়। একবার শুধু প্রণাম জানাতে চায়।

রাজর্ষি এদিকে বৃন্দাবনের স্বপ্ন দেখেন। সমাগত প্রজাদের

গোপ-গোপিনী বলে ভ্রম হয় তাঁর। লেইমাতাগ এবং ইরাং নদী পেরিয়ে বরাকের তীরে পৌঁছে মনে হয়, যমুনা দেখছেন। অদূরেই কদম্বমূলে আছেন কেউ। বাঁশী বাজল বলে।

কিন্তু না, বাঁশী আর বাজে না। তার বদলে কাড়া-নাকাড়া শোনা যায়। অনেক দূর থেকে কলকোলাহল ভেসে আসে।—

কাছাড়ের রাজা আসছেন। ভাগ্যচন্দ্র তাঁর রাজ্যে আজ অতিথি। সম্বর্ধনা না জানালে কি মান থাকে?

রাজর্ষির সামনে শিলাবৃষ্টির মতো রৌপ্যমুদ্রা ছড়িয়ে দিলেন তিনি। জামাকাপড় যা দিলেন, সারা বৃন্দাবনকে তা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়।

কিন্তু কাকে দিলেন? রাজর্ষিকে? তিনি কি আর রাজা আছেন এখনও? না কি বরাক পেরিয়ে সুর্মা নদী ধরে যাবার সময় তিনি ভাবছেন কালিন্দীর কথা, গোকুলের কথা?

শোনা যায়, শেষের অনুমানটাই সত্যি। না হলে জয়ন্তিয়া হয়ে শ্রীহট্ট পৌঁছে প্রথমেই তিনি শ্রীচৈতন্য মন্দির দেখতে যাবেন কেন? আর কেনই বা সে-মন্দিরে কীর্তনের আয়োজন করবেন? অথচ উপহার তো কম আসছে না! শ্রীহট্টের ইংরেজরা তাঁবু দিয়েছে, হাতি দিয়েছে; কত কী দিয়েছে আরও।

ভাগ্যচন্দ্র উপহারগুলোকে যেন দেখেও দেখেন না। যেন আরও কিছু বড় 'প্রাপ্তি'র জন্যে তিনি অনুক্ষণ ব্যাকুল। এদিকে দেখতে দেখতে আগরতলা পৌঁছুন তিনি। ত্রিপুরার রাজা রাজধন মাণিক্য তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

কিন্তু কয়েকদিন না যেতেই হঠাৎ কী যেন হল রাজধনের। রাজা থেকে ভিক্ষুক হয়ে উঠলেন তিনি।

—রাজর্ষি!—ভাগ্যচন্দ্রকে তিনি বললেন,—একটা নিবেদন আছে।

—নিবেদন?

—আপনার কন্যা হরিষেশ্বরী অশেষ গুণবতী। রূপেও তুলনা নেই তার।

—কেন? কী হয়েছে হরিষেশ্বরীর?

—হয়নি কিছু। আমারই পাপ মনে তার ছায়া পড়েছে।

—ছায়া?

—হ্যাঁ রাজর্ষি। আপনি অনুমতি দিলে তাকে রাজরাণী করি।

ভাগ্যচন্দ্র অনুমতি দিলেন। হরিষেশ্বরীকে পাশে নিয়ে রাজধন বসলেন সিংহাসনে।

কিন্তু না, সিংহাসনের ভোগসুখের মধ্যে আর নয়। ভাগ্যচন্দ্র হঠাৎ জ্বলে-ওঠা ভোগের শিখাটিকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন যেন।

চললেন কৃষ্ণনগরের দিকে।—

একে বর্ষাকাল, তায় নদীপথ। চলতে কষ্ট হল খুব। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং পদ্মা তিন তিনটি রাক্ষসীর রূপ ধরে তাঁকে গিলতে চাইল।

সঙ্গীসাথীরা ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যচন্দ্র নিরুত্তাপ। বারবার ভাবেন, কালীয়দমন আছে; ভয় কী!

কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি গিয়ে রাজর্ষি হাঁটা-পথ ধরলেন। সঙ্গীদের নৌকোতে রেখে নিজে চললেন একাকী। এদিকে কৃষ্ণনগরের রাজা খবর পেয়েছেন, রাজর্ষি আসছেন। সঙ্গে সঙ্গেই অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। 'গঙ্গা-বাস'-এ রাজর্ষির থাকবার ব্যবস্থা করে লোকজন নিয়ে তাড়াতাড়ি এগোলেন।...মণিপুরের সম্রাট বলে কথা! ধার্মিক সম্রাট! যোগ্য সমাদর না করলে কি চলে?

এদিকে সম্রাট কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলেন সবই। সব সমাদরকে ভাঙা হাটে আবর্জনার মতো পেছনে ফেলে নবদ্বীপ পৌঁছুলেন।

হ্যাঁ, এই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত স্থান। গত কয়েকমাস ধরে শয়নে-স্বপনে তিনি এর কথা ভেবেছেন।

নবদ্বীপ থেকে অম্বিকায় গেলেন রাজর্ষি। বৈষ্ণবদের অভ্যর্থনা

কুড়োলেন। কত কীর্তন হল। দূর-দূরান্তর থেকে কত বৈষ্ণব এলো। রাজর্ষির আবির্ভাবে ভক্তদের প্রেম-যমুনায় জোয়ার উঠল যেন।

ভাগ্যচন্দ্র নবদ্বীপে ফিরে এলেন আবার। গঙ্গা ধরে বৃন্দাবনের দিকে এগোলেন।

কিন্তু না, কষ্ট করে বেশি দূর আর এগোতে হল না তাঁকে। বৃন্দাবনই তাঁর কাছে এগোল। মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি একটি জায়গায় চিরকালের মতো গোবিন্দকে পেয়ে গেলেন তিনি। ইহলোক থেকে গোবিন্দলোকে মহাপ্রস্থান করলেন। তাঁর মরদেহ চৈতন্যভক্ত নরোত্তম-এর সমাধির পাশে সমাহিত করা হল।

মণিপুরীরা বললো,—ঠিক হয়েছে। রাজর্ষি আর দেবর্ষি পাশাপাশি।

—কিন্তু রাজর্ষি কি একদিনে?—প্রজারা বলাবলি করে,—স্বপ্ন দেখেছিলেন না? রাজর্ষি ওরফে ভাগ্যচন্দ্র ওরফে জয় সিং শ্রীকৃষ্ণকে তো কবেই পেয়েছিলেন!—

একদিন স্বপ্ন দেখলেন মহারাজ।—গোচারক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর একেবারে সামনে। বলছেন, আর দেরী কেন? আমাকে প্রতিষ্ঠা করো এবার। বিগ্রহ গড়ো।...মহারাজ কথা দিলেন, গড়বো প্রভু। তোমার নির্দেশ;—মাথায় তুলে নিলাম।

শোনা যায়, এরপর থেকেই ভাগ্যচন্দ্র অন্য মানুষ। ঘরে-বাইরে সবত্র সেই গোচারককে দেখেন। সেই টানা টানা চোখ, ঢুলু ঢুলু চাউনি, সেই শ্রাবণের মেঘের মতো গায়ের বরণ তাঁর। হাতে বাঁশী, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে কৌপীন।

—কি গো, বিগ্রহ গড়লে?—তিনি শুধোন যেন।

ভাগ্যচন্দ্র জবাব দেন,—গড়ছি প্রভু। বিগ্রহ এবং সেই সঙ্গে মন্দিরও। এই তো, হয়ে এল।

এদিকে আর তর সয় না যেন। মহারাজ অধীর, অস্থির। বনে-জঙ্গলে কোথাও একটু শব্দ শুনলেই ভাবেন, শ্রীরাধিকা বুঝি;

অভিসারে চলেছেন।···মর্মরধ্বনি উঠলে ভাবেন, বুঝি শ্রীকৃষ্ণ। দূরে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছেন।

এছাড়া, ঝরনার জলতরঙ্গে নূপুরধ্বনি শোনেন তিনি। চারণরত গোরু দেখলেই ভাবেন, তিনি আছেন; ধারেকাছেই কোনো গাছের ছায়ায়।

দেখতে দেখতে ছায়ার আড়াল থেকে কায়া ধরলেন ঠাকুর। মন্দিরে বিগ্রহের রূপ ধরে অধিষ্ঠিত হলেন।

ভাগ্যচন্দ্র খুব খুশি। শিল্পীদের বারবার তারিফ করেও মন ভরে না তাঁর। বলেন,—ঠাকুরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তো তোমরাই করলে গো! গোবিন্দকে বাইরে থেকে তোমরাই তো ঘরে আনলে।

শিল্পীরা বললো,—আমরা নিমিত্ত। তাঁর ইচ্ছেতেই সব।

—তাঁর ইচ্ছেতেই সব,—পরদিন সকালে গোবিন্দজীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে নীলকান্তও একই কথা বলেন।

অবিশ্বাস্য হয়তো; কিন্তু তবু, কেন জানি না, সেদিন তাঁর কথাগুলো অতিরঞ্জিত ঠেকেনি। মনে হয়েছিল,—কে জানে! হলেও হতে পারে।

ঠিক এমনটি মনে হবার অন্য কারণও আছে। নীলকান্ত মানুষটি স্থির, শান্ত। কম কথা বলেন। কিন্তু যখন যা বলেন, তা'তে প্রত্যয়ের ছাপ থাকে; আর থাকে হৃদয়ের উত্তাপ। ফলে, তাঁর কোনো কথাকেই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই সেদিনের কথাই ধরা যাক। সাতটায় আসবেন ব'লে ঠিক সাতটাতেই এলেন। অথচ আগের দিন রাত্তিরে সকলেরই আশঙ্কা, নীলকান্ত কথা রাখতে পারবেন না। পাহাড়ী ঠাণ্ডায় এই এত ভোরে আসতে পারবেন না কিছুতেই।

কিন্তু না, এলেন ঠিক। সাতটা বাজতে না বাজতেই সাইকেল নিয়ে নীলকান্ত হাজির।

বেরোতে আমাদেরই বরং দেরী হল। তৈরী হতে হতে আটটা পুরো।

পথে বেরিয়ে নীলকান্ত বললেন,—গোবিন্দজীর মন্দির এখান থেকে অনেকটা। অতএব রিক্সা চাই। দু'টো।

বললাম,—দু'টো কেন ?

—আপনারা দু'জন দু'জন করে চারজন। আমি সাইকেলে।

—কষ্ট হবে আপনার।

—না, হবে না ; —বলেই রিক্সা ডাকলেন তিনি আমাদের উঠিয়ে দিয়ে পিছু পিছু এগোলেন।

বেশ লাগছিল যেতে সামনেই টিকেন্দ্রজিৎ রোডে চিকচিক করছে রোদ। ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে কাটাকুটি খেলছে যেন। আবহাওয়া দাঁড়িয়েছে না-শীত, না-উষ্ণ।

টিকেন্দ্রজিৎ রোড পেরিয়ে কী যেন এক 'অ্যাভিন্যু'তে পড়লাম। দেখি, ছায়ায়-আলোয় পথ ওখানে ডোরাকাটা জেব্রা।

'অ্যাভিন্যু' পেরিয়ে পুবমুখো হতেই ছায়ার নামগন্ধও নেই আর। আলোয় আলোয় পথ একেবারে ঝলমলে।

সামনেই সেতু পড়ল একটা। ডিঙোলাম। পুবদিক বরাবর আরও খানিকটা এগিয়ে উত্তরমুখী হলাম। সঙ্গে সঙ্গেই চাবুক পড়ল যেন। উত্তুরে হাওয়া হুস হুস করে ছুটে এসে শাসন শুরু করল।

এদিকে পথও খারাপ। ভীষণ এবড়ো খেবড়ো। হঠাৎ দেখলে 'কম্যাণ্ড মডিউল' থেকে তোলা চাঁদের ছবি বলে মনে হয়। পাশেই পাহাড়। না, চাঁদের মতো ন্যাড়া বা নিষ্প্রাণ নয়, ঘন সবুজ। ঠিক সহচরীটির মতো কাছেই দাঁড়িয়ে যেন। লক্ষ্য রাখছে ; উল্টে না-পড়ি।

পড়লাম না। রিক্সাওলার কেরামতি বা আমাদের ভাগ্য বা জায়গার গুণ—যা হোক কিছু একটা কারণে বেঁচে গেলাম সে-যাত্রা। ধীরে ধীরে গোবিন্দজীর মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

মন্দিরটি দূর থেকে দেখলে দোতলা। ছাদের ওপর গম্বুজকে ধরলে আরও একতলা বেশি; তেতলা। কিন্তু সামনে থেকে দেখলে তালগোল পাকিয়ে যায় সব। তলার আর হদিস থাকে না। মনে হয়, বিরাট মহিমময় কিছু দেখছি।

মন্দিরের পাশেই রাজপ্রাসাদ। সহর্ষ ভক্তটির মতো দাঁড়িয়ে। যেন অনেক পেয়েছে ভক্ত; অনেক বিত্ত, অনেক বৈভব। এখন সুখ ছাড়া আর কিছু পাবার নেই।

প্রাসাদের সামনেই সিংহদ্বার। প্রবেশ-পথকে নিয়ে ভক্তের প্রসারিত হাতটি যেন। যেন, যা'র খুশি যান, যত খুশি দেখুন; ভক্ত কাউকে নিরাশ করবে না। তবে হ্যা, যাবার আগে গোবিন্দজীকে দর্শন করবেন। ঠাকুরের করুণাধারায় নিজেকে অভিসিঞ্চিত করে ভক্তের হাতে হাত দেবেন। সিংহদ্বার দিয়ে যাবেন রাজপ্রাসাদে।

শুনলাম, অনেকেই যান নাকি। হয় গোবিন্দজী-দর্শনের আগে, আর না-হয় পরে প্রাসাদ-দর্শন করেন।

আমরা করিনি। না-আগে, না-পরে। সোজা মন্দিরে ঢুকেছিলাম।

গোবিন্দজী-মন্দিরের কাছাকাছি হতেই ছায়া-ঢাকা একটা জায়গা দেখিয়ে নীলকান্ত বললেন,—জুতো খুলুন এইখানে।

খুললাম। ছায়া-ঢাকা জায়গাটা ধরে এগোতেই পায়ে সূঁচ ফুটল যেন। কুয়াশায়, কাদায় এবং পাঁাতলানো ঘাসেতে মিলে গোড়ালি অবধি প্রায় অসাড় করে দিল।

কিন্তু তবু, এ আর কা ঠাণ্ডা! কিছুই না বলতে গেলে। বদ্রীনাথে দেখেছি, তুষার পড়ছে। চারিদিক দুধের মতো সাদা বরফে ঢাকা। অথচ এরই মধ্যে এগোচ্ছেন একদল তীর্থযাত্রী। খালি পায়ে। শতছিন্ন বস্ত্র গায়ে। এগোতে গিয়ে পিছলে যাচ্ছেন কেউ কেউ। নতুন-জমা বরফের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। বিরক্তি নেই এতটুকু। মুখে সেই এক কথা, —জয়! বদ্রীবিশাল কি জয়!..

ভাবলাম, আমরাও বলবো নাকি?—জয়! গোবিন্দজী কি জয়!……

না, থাক। বললেও ঠিক জমবে না। বিরাট এক ভণ্ডামীর মতো শোনাবে।

সেই বিশ্বাস কই আমাদের? সেই অসংকোচ প্রত্যয়?…আমরা তো গোবিন্দজীকে দেখবো বলে মণিপুর আসিনি? মণিপুর এসেছি বলে গোবিন্দজীকে দেখছি।

—গোবিন্দজী-দর্শন উপলক্ষ্যেরও উপলক্ষ্য এখানে; লক্ষ্য তামাম মণিপুর। আসলে সে জন্যেই শীত লাগছে পায়ে। অল্পেতেই কষ্ট হচ্ছে,—নীলকান্তকে কথাটা বলতেই হেসে উঠলেন,—যা বলেছেন! তবে আসলে কিন্তু গোবিন্দজী-দর্শন মানেই অর্ধেকের বেশি মণিপুর-দর্শন।

—তাই নাকি?—বললো অঞ্জলি। নীলকান্তের পিছু পিছু মন্দিরের সামনের দিকে এগোল।

এদিকে আমরাও এগিয়েছি। নীলকান্তের কাছ থেকে কিছু শুনবো বলে উৎসাহী ছাত্রের মতো কান পেতেছি। শেষ অবধি ছাত্রদের নিরাশ করেননি ভদ্রলোক। বলেছিলেন,—মণিপুরের ইতিহাস বলি, অথবা বলি ধর্ম বা সংস্কৃতি,—সব কিছুই গোবিন্দজীকে ঘিরে।

বললাম,—ইতিহাসে ভাগ্যচন্দ্রের কথা পড়েছি।

—আর অভাগাদের কথা?—নীলকান্ত শুধোলেন,—পড়েননি বুঝি?

বললাম,—পড়লেও মনে নেই। বলুন আপনি। শুনি।

—শুনবেন?—নীলকান্ত থামেন একটু। নতুন করে শুরু করেন,—আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে। সম্রাট গম্ভীর সিং-এর মৃত্যু হয়েছে। মণিপুরের উত্তরাধিকারী হয়েছে তাঁরই শিশুপুত্র চন্দ্রকীর্তি সিং। মাত্র দু'বছর বয়স তাঁর। অতএব, নামেই তিনি

উত্তরাধিকারী। রাজকার্য আসলে চালান নরসিং। দক্ষ প্রশাসক তিনি। রাজ্যের কল্যাণের দিকে বরাবরই তাঁর লক্ষ্য। তাই, যে কেউ চন্দ্রকীর্তির সিংহাসন জবর দখল করার চেষ্টা করে, তাকেই তিনি নির্বিচারে দমন করেন।...কিন্তু করলে হবে কি! রাণী কুমুদিনীর শান্তি নেই। সব সময় তাঁর ভয়, নরসিং ফিকির খুঁজছে। সুযোগ পেলেই চন্দ্রকীর্তিকে হটিয়ে দেবে। নিজে সিংহাসনে বসবে।..আসলে মোটেই তা নয়। নরসিং-এর এমন কোনো মতলব ছিল না। রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলাই ছিল তাঁর কাছে বড়।...এদিকে কুমুদিনী উল্টো বুঝে বসে আছেন। নরসিংকে শায়েস্তা করার কথা ভাবছেন।...তাই শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করলেন তিনি। নবীন সিং নামে এক অনুচরকে লাগালেন। ঠিক হল, ছোটখাটো কিছু নয়, নরসিংকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। সরাতে অসুবিধে নেই। নরসিং গোবিন্দজীর ভক্ত; প্রায়ই আসেন মন্দিরে। নতজানু হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করেন। অতএব, নবীন একটু যদি নজর রাখে তো ঐ প্রণামের সময়েই কাজ হাসিল হতে পারে।...কুমুদিনীর আদেশ শিরোধার্য। সেই থেকে নবীন সিং ওৎ পেতে থাকে। শিকারের সন্ধানে খুনী নেকড়ে যেমন, এই পবিত্র বৈষ্ণবতীর্থে সে-ও তেমনি অপেক্ষা করে। এবং অবশেষে সুযোগও পায় একদিন। নরসিং ঠাকুরকে প্রণাম করছে, ঠিক এমন সময় নবীন সিং পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে তাকে। তাজা লাল রক্তে গোবিন্দজীর প্রাঙ্গণ কলুষিত করে পাপী।...নবীন ধরা পড়েছিল শেষ অবধি। শাস্তিও পেয়েছিল। কিন্তু রাণী দারুণ সেয়ানা। বেগতিক বুঝে চন্দ্রকীর্তিকে নিয়ে পালালেন। ভাবলেন, নরসিং মরে গেছেন বুঝি।...আসলে রাণীর অনুমান ভুল। নরসিং মরেননি। গোবিন্দজীর প্রসাদেই রক্ষা পেয়েছিলেন—

নীলকান্ত এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন এতক্ষণ। কাহিনী শেষ করে হাঁপাতে লাগলেন।

শুধালাম,—সব সত্যি ?

নীলকান্ত জবাব দিলেন,—হ্যাঁ। নবীন যে নরসিংকে ছুরিকাঘাত করেছিল, তা'তে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মূল ঘটনার সঙ্গে কুমুদিনীর যোগ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, নরসিং-এর সঙ্গে শত্রুতা ছিল নবীনের। তাই সুযোগ বুঝে শত্রুকে সে আঘাত করে।

—বুঝলাম,—গোপালবাবুর মন্তব্য,—কিন্তু চন্দ্রকীর্তি কি রাজা হয়েছিলেন শেষ অবধি ?

নীলকান্ত বললেন,—হ্যা, হয়েছিলেন। বলতে কী, মণিপুরের নবযুগ তাঁরই আমল থেকে। তিনি ছিলেন গোবিন্দজীর ভক্ত। ঠাকুরকে ছু ছু'টি বিরাট ঘণ্টা প্রণামী দিয়েছিলেন তিনি।

শুধালাম—সে ঘণ্টা এখনও আছে ?

—হ্যাঁ, আছে। তবে ছু'টির মধ্যে একটি। দেখবেন ?—বলেই নীলকান্ত একরকম টানতে টানতে নিয়ে চললেন আমাদের। গোবিন্দ-মন্দিরের দক্ষিণ-পুব কোণে বিরাট এক ঘণ্টা দেখিয়ে বললেন, এই যে, দেখুন।

দেখলাম। সত্যি, বিরাট ঘণ্টা। সচরাচর যে সব ঘণ্টা আমরা দেখি, তাদের তুলনায় কম করে পঞ্চাশ গুণ।

এখন আর কাজে লাগে না ওটা। তাই জীর্ণ, ধূলিধূসর। কিন্তু চন্দ্রকীর্তির আমলে ?—

নিশ্চয় প্রাসাদ থেকে ঘণ্টাধ্বনি শুনতেন সম্রাট। গোবিন্দ-মন্দিরে ভক্ত-সমাগমের আভাস ঘরে বসেই পেতেন।

—যুগে যুগে কত ভক্ত গোবিন্দজীর দরজায়,—এতক্ষণে মন্দিরের সামনেকার বিরাট নাটমন্দিরটিতে এসে দাঁড়িয়েছি। নীলকান্ত আবার শুরু করেছেন,—কিন্তু ভাগ্যচন্দ্রের বুঝি তুলনা নেই! অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে মজে থাকতেন।...সেই কবেকার কথা! গোবিন্দজীর বিগ্রহ তখনও গড়া হয়নি। সপম লোথন নামে এক

শিল্পী দিনরাত খাটছেন। বিগ্রহটি যাতে অপরূপ হয়, সেই চেষ্টা শুধু। কিন্তু ভাগ্যচন্দ্রের যেন তর সয় না। শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা পড়তে পড়তে তন্ময় তিনি। পুঁথি বন্ধ করলেও তাঁকেই দেখেন।·· একদিন, স্বপ্ন দেখেন মহারাজ, রাস-লীলা চলছে। বৃন্দাবনের গোপিনীদের মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণ!···ব্যস! আর কথা নেই। ঘুম ভাঙতেই আকুল তিনি। বারবার বলেন,—রাসলীলা মণিপুরেও হবে। গোবিন্দ-মন্দিরেও ঠিক তেমনি নাচবে গোপিনীরা।··· নাচবে? মহারাজের পরিজনরা অবাক,—কী বলছেন প্রভু? কিছু তো বুঝছি না!·· প্রভু তখন কন্যা বিম্ববতীকে ডেকে বললেন,—মা আমার, বুঝিয়ে দাও। রাজস্থানে যেমন মীরা, মণিপুরেও তেমনি তুমি। রাসলীলার কথা তুমি যদি না বোঝাও তো কে বোঝাবে মা? ···বিম্ববতী বললেন,—কিন্তু লীলার যে কিছুই জানি না! মহারাজ অভয় দিলেন,—তাতে কী! আমি বলে দিচ্ছি। সব জানবে।· ভাগ্য-চন্দ্র স্বপ্নের কথা আগাগোড়া বলে গেলেন। আর বিম্ববতী সেই স্বপ্নকে নিয়ে লিখলেন রাসলীলা। গোবিন্দজীর মন্দির উদ্বোধন হল যেদিন, প্রচুর ধমধাম সহকারে সেদিন রাস হল। দূর-দূরান্তর থেকে ভক্ত বৈষ্ণবরা এল। আর ভাগ্যচন্দ্র রাস দেখতে দেখতে ভাবলেন, হ্যাঁ, স্বপ্নে-দেখা দৃশ্যটা ফুটে উঠছে বটে। গোপিনীদের পোশাকে সেইরকম ঝলমলে চুমকি। খুদে খুদে আয়নাগুলো ঠিক সেইরকম চকমকে। গাঢ় সবুজ বা ঘোর লাল রঙের বাহার ঠিক সেইরকম। নাচ যখন চলছে, রঙ্ তখন আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে ঠিক।·· ভাগ্যচন্দ্র বাস্তব থেকে স্বপ্নে ফিরে গেলেন আবার। রাসলীলায় স্বপ্ন ও বাস্তব এক হতে দেখলেন।···সেই রাসলীলা আজও হয়; প্রতি বছর হয়,—বলেই নাটমন্দিরের মাঝামাঝি একটা জায়গা দেখিয়ে নীলকান্ত বললেন,—এই যে! এইখানে হয় রাসলীলা।

জায়গাটা দেখলাম। 'আহা মরি' তো নয়ই, মঞ্চ-টঞ্চও কিছু নয়। সাধারণ মেঝের মতোই দেখতে। তবে, অনেকেই যাতে

রাস দেখতে পায়, সে-ব্যবস্থা আছে। জায়গাটিকে ঘিরে দর্শক-আসনও আছে বেশ কিছু।

দর্শকরা বাবু হলে চলবে না। কারণ, আসনগুলো নেহাৎই কাজ-চলা গোছের; সান-বাঁধানো ছোট ছোট গ্যালারীর মতো।

এদিকে নাটমন্দিরের জায়গায় জায়গায় সিমেন্ট উঠে গেছে। ভেতর থেকে মেঝের হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে যেন।

মন্দিরের টিনের আচ্ছাদনটি শতছিদ্র। টর্চ-এর মতো আলো ছুটে আসছে ছিদ্রগুলো দিয়ে। সিলিং ভিড় করা মাকড়সার জাল-গুলোর উপর পড়ছে।

নাটমন্দিরের এই দারিদ্র্য দেখে বারবার মনে হল, লক্ষ্যই বড় এখানে; উপলক্ষ্য নয়। ভাগ্যচন্দ্রের স্বপ্নে দেখা সেই দৃশ্যটা ফুটে উঠলেই হল। উদ্যোগ-আয়োজনের অন্য সব কিছুই অপ্রাসঙ্গিক। হলে ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই।

নাটমন্দির থেকে বেরিয়ে মূল-মন্দিরের সামনে আসি আবার। সোনালী গম্বুজ দুটোর দিকে তাকাই।—

দেখি, ঝলমল করছে। প্রতিহত সূর্যালোক থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে সোনালী ঝালর।

—সোনা বুঝি? গম্বুজ দুটি বুঝি সোনা দিয়ে মোড়া?—নীলকান্তকে শুধিয়েছি একবার।

—ঠিক জানি না,—জবাব দিয়েছেন উনি,—শুনেছি, মহারাজ চূড়াচাঁদ সত্যি একদিন সোনায় মুড়িয়েছিলেন ওদের।

—সেই সোনা? না কি যা দেখছি, তা শুধু সোনালী রঙ্?

—জানি না।

—চূড়াচাঁদ নতুন করে মন্দির গড়লেন বুঝি?

—গড়লেন। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে। পুরনো মন্দির এখান থেকে মাইলখানেক দূরে ছিল: বলেই নীলকান্ত গোবিন্দজীর দিকে এগোলেন একটু। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম।

মূর্তিটির মুখোমুখি হতেই দেখি, অপরূপ। স্বপ্নে-দেখা জয়সিং-এর সেই রাখাল বালকই যেন। বাঁশি হাতে দাঁড়িয়ে।

গোবিন্দজীর পাশেই গৌরবর্ণা শ্রীরাধিকা। যেন রাসে নামার অপেক্ষায়। গোপিনীরা এলেই লীলা শুরু হবে।

এদিকে গোবিন্দজীর প্রতিবেশী দু'টি কুঠরিতেও সাজ সাজ ভাব। একটিতে পরিজনসহ বলরাম। অন্যটিতে সপারিষদ জগন্নাথ।

সবাইকে প্রণাম জানাই সেদিন। গোবিন্দজীর মধ্যে জয়সিং-এর স্বপ্নকে খুঁজি .

নীলকান্ত পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন,—তাঁর ইচ্ছেতেই সব। মণিপুরের দুঃখ-সুখ, ভালো-মন্দ সব কিছু।

বিশ্বাস হয় না আমার। কিন্তু তবু, কেন জানি না, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রতিবাদের ভাষাও খুঁজে পাই না। বিরাট মন্দির থমথম করে। চুন খসে-পড়া দেয়াল থেকে ভ্যাপসা অদ্ভুত এক গন্ধ ভেসে আসে। ধারেকাছেই মাকড়সার জালগুলো হাওয়ার দাপটে খুদে খুদে যবনিকার মতো দুলতে থাকে। মর্মরধ্বনি ওঠে হঠাৎ-ফেলা দীর্ঘশ্বাসের মতো।

পিছন ফিরে তাকাই।—

নাটমন্দির খাঁ খাঁ করছে। কৃষ্ণবিহীন মথুরা যেন। তিনি নেই, তাই চারিদিক শূন্য—

শুন ভেল মন্দির, শুন ভেল নগরী
শুন ভেল দশ দিশ, শুন ভেল সগরী।

অথচ কাছেই তো তিনি। গোবিন্দ-মন্দিরে। নিত্য-বৃন্দাবনে। গোপিনীরা বুঝি বাঁশি শুনে শুনে ক্লান্ত। সবাই গভীর ঘুমে অচৈতন্য। তাই তিনি থাকতেও স্তব্ধতা এখানে। মথুরার যেমন, বৃন্দাবনেরও তেমনি সুষুপ্তি।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি মন্দির ছেড়ে। ভয় হয়, একটু জোরে

কথা বললেই সবাই জেগে উঠবে বুঝি।—এদিকে বেরিয়ে দেখি, বাইরেও মথুরা-বৃন্দাবন। রিক্‌সাওয়ালারা যে যা'র গাড়িতে ঘুমুচ্ছে।

ডাকতেই হুড়মুড় করে ওরা উঠল। চোখ কচলাল একটু। যাত্রী-আসন ছেড়ে চালকের জায়গাতে গিয়ে বসল।

আবার এগোলাম। এবারে শহর ইম্ফলের দিকে।—

রোদের তেজ অনেকটা বেড়েছে এতক্ষণে। সূর্য মাঝ-আকাশকে ছুঁই-ছুঁই করছে।

নীলকান্ত বললেন,—এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট হয়ে চলুন। ডিরেক্টার অপেক্ষা করছেন।

শুধালাম,—অপেক্ষা? কেন বলুন তো?

—ফোনে বলেছিলাম আপনাদের কথা। নিয়ে যাবো বলেছিলাম, এই এগারোটা নাগাদ।

—কিন্তু এগারোটা যে বেজে গেল।

—তা হোক; চলুন তবু। গেলে খুশি হবেন উনি।

গেলাম শেষ অবধি। মণিপুরের 'এডুকেশান ডিরেক্টোরেট'কে দেখে অবাক হলাম।

সাধারণতঃ ডিরেক্টোরেট বলতে যে ধরনের ম্যানসান বা সুসজ্জিত অফিসের কথা আমাদের মনে আসে, এ মোটেই তা নয়। এ যেন নেহাৎই দীন-দরিদ্র; কোনো রকমে টিঁকে-থাকাগোছের।

এর একতলা বাংলো-প্যাটার্ণের জরাজীর্ণ ঘরগুলোকে দেখলে দেউলিয়া হয়ে-যাওয়া মধ্যবিত্ত সাহেব-বাড়ির কথা মনে হয়।

তা হোক। বাইরের অভাবটা ভেতরের ঐশ্বর্য দিয়ে সে পুষিয়ে নিয়েছে। যেমন তার ডিরেক্টার, তেমনি ডেপুটি। কথায়-বার্তায়, আদরে-আপ্যায়নে আজন্ম-বন্ধুর মতো যেন।

ওঁরা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। মণিপুরের কয়েকটি স্কুল-কলেজ দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। বারবার করে বললেন, থাকুন কয়েকদিন।

দেখুন সব কিছু। ট্রান্‌স্‌পোর্ট-এর ভাবনা নেই। ডিরেক্টোরেট-এর গাড়ি প্রয়োজনমত 'লিফ্‌ট্‌' দেবে।

খুব খুশি আমরা। এই সমাদর একেবারেই যেন অপ্রত্যাশিত। মণিপুর আসতে না আসতেই অনুকূল এত কিছু ঘটবে, ভাবতে পারি নি।

গোপালবাবু খুশি অন্য কারণে।

—স্কুল-কলেজ 'ভিজিট' করবো! ক'জন পায় এমন সুযোগ? পথে বেরিয়ে বললেন।

সুধীরবাবু এদিকে আতঙ্কিত।—

—সারছে!—আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করলেন —স্যার ত 'মিটিং' পাইলে আর লড়ত না (নড়বেন না)! মণিপুর-ভ্রমণ খতম!

'মিটিং'-এর ব্যাপারে গোপালবাবুর কিছু দুর্বলতা আছে, জানতাম। কিন্তু সেই দুর্বলতা বক্তৃতা করে হাততালি কুড়োবেন বলে নয়; অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু জানবেন বলে। এদিকে ঘুরতে বেরিয়ে এভাবে 'জানা'টাও বিপদ। কারণ, এক্ষেত্রে 'জানা' একটু-আধটু হলেও ঘোরা প্রায় কিছুই হয় না। সুধীরবাবুকে তাই অভয় দিলাম,—ভাবছেন কেন? সঙ্গেই তো আছি। 'মিটিং' যা'তে সংক্ষিপ্ত হয়, দেখবো।

—আর দেখছেন;—সুধীরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে কথা বল্লেন যেন, 'মিটিং' পাইলে স্যার অক্করে (একেবারে) বেসামাল।

এদিকে নীলকান্তের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্যার মানে, গোপালবাবু খানিকটা এগিয়ে গেছেন। আমাদের দেরী দেখে তাড়া দিচ্ছেন,—কই! এসো! হোটেলে ফিরতে হবে এখুনি। দু'টোর মধ্যে 'রেডী' হতে হবে। গাড়ি আসছে, মনে আছে?

বললাম,—হ্যাঁ, আছে। আজকের প্রোগ্রাম তাম্পাসনা গার্লস্‌ স্কুল।

তাম্পাসনা গার্লস্ স্কুল, হোটেলে ফিরে বেরোবার উদ্যোগ করতে করতে ভাবি,—নামটা আগেও শুনেছি নীলকান্তের কাছে। 'লেডীজ মার্কেট'-এ যাবার সময়।…তাম্পাসনার ছাত্রীদেরও দেখেছি। টিকেন্দ্রজিৎ রোড ধরে রামধনু হয়ে যাচ্ছে।

ছ'টো বাজতে না বাজতেই বেরোলাম। নীলকান্ত আর বাড়ি ফেরেন নি। হোটেলে আমাদের সঙ্গেই স্নানাহার সেরেছেন।

তাম্পাসনা গার্লস্ স্কুলে পৌঁছুতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। 'এডুকেশান ডিরেক্টোরেট্'-এর জীপ এক লাফে ছুটে গেল যেন।

স্কুলে পৌঁছে দেখি, মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা। ক্লাশ চলছে পুরোদমে। আর মাঝে মাঝে প্রহরীদের মতো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

প্রধান শিক্ষক অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। পরম সমাদরে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

মৃদু ঘা খেলুম। প্রধানটি শিক্ষক কেন? শিক্ষয়িত্রী হতে কি দোষ ছিল? মণিপুরের মতো নারী-প্রগতির দেশে উচ্চ-শিক্ষিতার আকাল নাকি?

জানি না। এ নিয়ে প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না। তবে শিক্ষয়িত্রী অনেককেই দেখি;—এলেন; দুটো-একটা কথা বললেন, চলে গেলেন।

একজন তো হবু অভিযাত্রী। পায়ে হেঁটে ভারত-ভ্রমণের স্বপ্ন দেখছেন।

শুধালাম,—কেন করবেন ভ্রমণ?

—ভারতকে বুঝবো বলে। অন্য কিছু না. ভারতের রাজনৈতিক চেতনাকে।

—কিছু মনে করবেন না। আপনি কি রাজনীতির ছাত্রী?

—না, তা ঠিক নয়।

—রাজনীতি করেন?

—না, তা'ও নয়।

—তবে?

—আমার খুব কৌতূহল হয় জানতে, স্বাধীনতার তেইশ বছর পরও সর্বভারতীয় একটা বিরোধী দল কেন গড়ে উঠল না।

—বিরোধী মানে কংগ্রেস-বিরোধী তো?

—হ্যাঁ।

—কেন গড়ে উঠল না জানেন?—গোপালবাবু চুপচাপ শুনছিলেন এতক্ষণ। এইবার কথা বললেন,—আমাদের জাতীয় সংহতি আজও গড়ে ওঠে নি বলে। এত বিচিত্র দেশ আমাদের, ভাষায় চিন্তায় ধর্মে সমাজ-ব্যবস্থায় এত আমাদের ফারাক যে, সত্যিকারের একটা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠা খুব কঠিন।

ভদ্রমহিলা দমবার পাত্রী নন। চট করে জবাব দিলেন,—কিন্তু কংগ্রেসের বেলায় তো গড়ে উঠেছিল?

—হ্যাঁ, উঠেছিল,—বললেন গোপালবাবু,—কারণ, তখন সাধারণ একটা লক্ষ্য ছিল সকলের সামনে। এবং সে লক্ষ্যটি হল, ইংরেজ হটাও, স্বাধীনতা কায়েম করো।

—সাধারণ লক্ষ্য তো এখনও দাঁড় করানো যায়। দারিদ্র্য তো ঘরে ঘরেই।

বললাম,—ঠিক। ঠিক কথা। কিন্তু একদিকে রাজনৈতিক পার্টিগুলোর মধ্যে দলাদলি এবং অন্যদিকে জাতীয় সংহতির অভাবে আজও তা সম্ভব হয় নি।

ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন,—অথচ দেখুন, সত্যিকারের বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্রে আর একনায়কতন্ত্রে তফাৎ থাকে না।

গোপালবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাধা পড়ে। মিটিং-এর ডাক আসে। সহকারী প্রধান-শিক্ষয়িত্রী থৈবী দেবী এগিয়ে এসে অনুরোধ জানান,—আসুন আপনারা। সব 'রেডী'।

—রেডী? এরই মধ্যে?—স্কুলের সংহতি দেখে অঞ্জলি অবাক!

থৈবী দেবী বুঝিয়ে দেন,—আমাদের এইরকম। দশ মিনিটের নোটিশেই 'মিটিং অ্যারেনজ্' করি। অসুবিধে হয় না।

—হুঁ, 'হয় না', তা তো দেখতেই পাচ্ছি,—মিটিং-এ পৌঁছেই মনে মনে আওড়ালাম একবার।

দেখলাম, ব্যবস্থা বেশ ভালো। মাইক-অ্যাম্প্লিফায়ার থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রীদের জমায়েৎ পর্যন্ত নিখুঁত।

ছাত্রীরা বেশির ভাগই স্কুল-বাড়ির বারান্দায়। কয়েকজন মাত্র উঠোনে: আমাদের ঠিক মুখোমুখি একটি পতাকাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে।

স্কুল-বাড়িটি একতলা: উঠোনের তিন দিক ঘিরে। ছাদ টিনের। দেয়াল অ্যাসবেসটাসের, ধবধবে সাদা রঙের। স্কুলের যে দিকটি খোলা, আমরা সে-দিকেই মুখ করে বসেছি। দু'পাশে এবং ডাইনে-বাঁয়ে ছাত্রী দেখছি অজস্র।

সবাই চুপচাপ। কথা নেই কারও মুখে। মনে হচ্ছে, শোক-সভা বুঝি। দু' মিনিট মৌন থেকে এবং শোক-প্রস্তাবটি পাঠ করেই সভা ভাঙবে।

আমি কলকাতার লোক। স্কুল-কলেজের সভায় এইরকম নীরবতা দেখতে অনভ্যস্ত। তাই আনন্দের পরিবেশেও থাপছাড়া ঐ উপমাটা মনে এল আমার।

সভায় প্রথম বক্তৃতা করলেন গোপালবাবু: সহজ সুশ্রাব্য ইংরেজীতে। মণিপুরের নারী-প্রগতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন,—আমার ধারণা, এ রাজ্যের মেয়েরা অনেক কিছু করতে পারে। শিক্ষায়, শিল্পে, রাজনীতিতে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে পারে। কিন্তু তারা এখনও এগিয়ে আসছে না কেন? ভারতের একপাশে বলে নিজেদের শক্তিকেও কি তার পাশে সরিয়ে রাখবে? বিচ্ছিন্নতা এবং একাকিত্বের বাধা জয় করবে না?

আমি বললাম,—জয় করার দায়িত্ব ওদেরই শুধু নয়, আমাদেরও। আরও বেশি সুযোগ-সুবিধে মণিপুরকে দিতে হবে। আজ অবধি

বিশ্ববিদ্যালয়ই গড়ে উঠল না এ-রাজ্যে। মেয়েরা উচ্চ শিক্ষাটা পাবে কোথায়?···কিন্তু তবু, এত কিছু বাধার মধ্যেও মণিপুরী মেয়েরা যে এগিয়ে চলেছে, এটাই সবচেয়ে আশার কথা।

সভা শেষ হবার আগে প্রধান শিক্ষক মশাই ধন্যবাদ দিলেন। মেয়েরা, যারা নাকি উঠোনের মাঝখানে পতাকাটিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তারা সমবেত কণ্ঠে খুব সুন্দর একটা মণিপুরী গান গাইল।

সভা ভাঙ্‌তেই স্কুল ছুটি। আমরা প্রধান শিক্ষকের ঘরে গেলাম। আবার। চা এবং কপি-ভাজা দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করা হল।

ভাজা একটি করে; বেশ সুস্বাদু।

গোপালবাবু তো স্বাদের তাড়নায় অস্থির একেবারে। প্রধান শিক্ষককে বললেন,—দেখুন কাণ্ড! আজ দু' দু'বার লাঞ্চ খেতে হল!

—লাঞ্চ?—কথা শুনে আমি অবাক। ভাজাটা দেখতে একটু বড় ছিল; কিন্তু তাই বলে লাঞ্চ?

প্রধান শিক্ষক মশাইও অবাক হয়েছিলেন একটু। গোপালবাবু বুঝিয়ে দিলেন,—এত সুন্দর জিনিস! এত বড় আর এত ভালো। লাঞ্চ নয় তো কী?

সুধীরবাবু টিপ্পনী কাটলেন এইখানে। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করলেন,—নেন, ঠ্যালা সামলান! স্যারের কাণ্ড!

ভাবলাম,—হ্যাঁ, কাণ্ডই বটে। গোপালবাবুর পক্ষেই এ সম্ভব। কাউকে দুঃখ দেবেন না উনি। আগ বাড়িয়ে সবাইকে খুশি করবেন। সব সময় উনি সজাগ, কোথাও অভাব আছে বলে কারও না এতটুকু কষ্ট হয়।···এই তো, একটু আগে; মিটিং আরম্ভ হবার সময়। নালকান্ত ছাত্রীদের সামনে আমাদের পরিচয় দিচ্ছিলেন, ইনি গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য,—ত্রিপুরার বি. টি. কলেজের অধ্যক্ষ; ইনি সুধীর সাহা,—ঐ কলেজেরই ভূগোলের অধ্যাপক; ইনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য,—কলকাতা জয়পুরিয়া কলেজের বাংলার অধ্যাপক; আর

ইনি অঞ্জলি ভট্টাচার্য,—কলকাতা সেণ্ট মার্গারেট্‌স্‌ স্কুলের ইংরেজীর টিচার। এঁরা সকলেই ··

গোপালবাবু বাধা দিলেন হঠাৎ। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন,—টিচার। ব্যস! এটুকুই আমাদের পরিচয়।

বুঝলাম, কথাটা অঞ্জলিকে ভেবে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কলেজে পড়াবার সুযোগ পায় নি সে। এখন স্কুলে পড়াচ্ছে বলে তার মনে যদি দুঃখ হয়? পরিচয়-উপস্থাপনের মধ্যে তার অভাবটা এতটুকুও বেরিয়ে পড়ে যদি? · অতএব, কাজ কী হাঙ্গামায়। সবাই আমরা টিচার, এ পরিচয়ই ভালো।

কিন্তু এ-সংসারে কে কার পরিচয় দেয়।

সেদিন হোটেলে ফিরে গিয়ে দেখি, মালিক শান্তিলাল মাথায় হাত দিয়ে বসে।

শুধালাম,—ব্যাপার কী?

শান্তিলাল আধা হিন্দী আর আধা ইংরেজী মিশিয়ে যা বললেন, তার মানে দাঁড়ায়,—ছেলে রামলাল কিছুদিন থেকেই বাড়াবাড়ি করছিল। হোটেলের কাজকর্ম কিছুই প্রায় দেখছিল না। তাই আজ খুব বকেছেন ওকে। গালিগালাজ করেছেন। ছেলের ওতে গোসা হল। রাগ করে চলে গেল বেযাকুফ।

শুধালাম,—কোথায় গেল? কিছু বলে নি?

শান্তিলাল কপালে করাঘাত করে বললেন,—নেহি হজুর, কছু না।

বলতে কী, ডিপ্লোম্যাট হোটেলে আসা অবধি রামলালের উপর প্রসন্ন ছিলাম না আমরা। কিন্তু তবু, কেন জানি না, ওর এই হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাদের ভালো লাগে নি।

নীলকান্ত অবিশ্যি বলেছিলেন,—ভাববেন না। দু' একদিনের মধ্যেই ঠিক ফিরবে।

শান্তিলাল বিশ্বাস করেন নি। বলেছিলেন,—নেহি বাবুজী, ফিরবে না। 'হস্‌টাইল নাগা' কা মুল্লুকে যাবে বেতমিজ। দোস্তি করবে। আমাকে সমঝে দিয়ে গেল।

নীলকান্ত বললেন,—ও কিছু নয়, আপনাকে ভয় দেখিয়েছে। 'হস্‌টাইল নাগা'রা আর যাই হোক না কেন সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু। রামলালের মতো বাবু আদমীর ওখানে ঠাঁই হবে না।

—সাচ্‌ বাত,—শান্তিলাল সায় দিলেন এবার,—রামলাল তো দাড়ি তালিম দিবে দিনভর। কম সে কম তিনঘণ্টা লাগাবে।

শান্তিলাল-এর কথা শুনে দারুণ ঐ অস্বস্তিকর পরিবেশেও অনেক কষ্টে হাসি চাপি। তাড়াতাড়ি বিকেলের চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি আবার।

আজ সন্ধ্যেয় সম্বর্ধনা। মণিপুর সাহিত্য পরিষদে। সবাই বিশেষ করে বলেছেন ; যেতেই হবে।

যাচ্ছি। ডিপ্লোম্যাট হোটেলের সামনে টিকেন্দ্রজিৎ রোডে সবে পা দিয়েছি। নীলকান্ত হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন।

ব্যাপার কী ?—না, ভালো করে তাকাতেই দেখি, এগিয়ে গিয়ে কা'র সঙ্গে যেন কথা বলছেন তিনি।

—কে ? ঐ ভদ্রলোকটি ? চেনেন নাকি ?—গোপালবাবুকে শুধালাম।

—চিনি চিনি মনে হচ্ছে, তিনি বললেন,—শান্তি চক্রবর্তী কি ? মণিপুর 'ওয়েটস্ অ্যাণ্ড্ মেজারস্'-এর কণ্ট্রোলার ?

এতক্ষণে ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরেছেন। এগোচ্ছেন নীলকান্তকে সঙ্গে নিয়ে।

আর একটু এগোতেই গোপালবাবু লাফিয়ে উঠলেন,—আরে ! শান্তিবাবু না ?

—ঠিক ধরেছেন ! ঠিক ! ঠিক !—বলতে বলতে শান্তিবাবু

মুখোমুখি হলেন আমাদের। ঝুঁকে পড়ে গোপালবাবুকে প্রণাম করলেন।

—কেমন আছেন?—শুধালেন গোপালবাবু।

—খুব ভালো; এবং বিশেষ করে আজকে তো বটেই।

—সে-জিনিসটা পেয়েছেন?

—কোন্ জিনিসটা? শুঁটকী?···ও! হ্যা হ্যা, কাল রাত্তিরেই।

—চললেন কোথায়? বাড়ি? অফিস-ফেরৎ বুঝি?

—না না; অফিস আজ যাই নি। যা খেয়েছি, তারপর আর যাওয়া চলে না।

সুধীরবাবু বললেন,—শুঁটকী দিয়া ফিস্ট্ করছেন বুঝি?

—তা ফিস্ট্-ই একরকম, শান্তিবাবু জানালেন,—গলা পর্যন্ত একেবারে। খেয়েদেয়ে অজগরের মতো ফ্ল্যাট। ঘুম থেকে উঠে এই বেরোচ্ছি। খেলা দেখবো।

টিন দিয়ে ঘেরা সামনের মাঠটিকে দেখিয়ে শুধালাম,—কোথায়? এইখানে?

শান্তিবাবু জবাব দিলেন,—হ্যা। কলকাতা থেকে ইস্টবেঙ্গল আসছে। এক্জিবিশন ফুটবল খেলবে। 'আর্মি'র সঙ্গে।

বললাম,—দেরী হচ্ছে আপনার।

—হোক গে, বলেই ধীরে-সুস্থে এগোলেন তিনি। যাবার আগে গোপালবাবুকে বললেন,—ভয় হচ্ছে, একদিনের ছুটিতে কুলোবে না, আরও দু'চারদিন চাই। ঘরে শুঁটকী, আর আমি অফিসে, ভাল দেখায় কি দাদা? আপনারাই বলুন?

বলা আর হল না। অবাক বিস্ময়ে শুঁটকী-রসিকটির দিকে তাকালুম শুধু। এদিকে নীলকান্ত তাড়া দিলেন,—কই! চলুন! সাহিত্য পরিষদে সম্বর্ধনা; যেতে হবে না?

পরিষদ যেতে যেতে সাড়ে পাঁচটা প্রায়।

গিয়ে দেখি সবাই প্রস্তুত। আমাদেরই অপেক্ষায়।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই উৎসব শুরু হল। একটি মণিপুরী মেয়ে চন্দন দিয়ে তিলক কেটে দিল আমাদের। আর একটি এগিয়ে এসে মালা দিল। নীলকান্ত উপস্থিত সকলের সামনে আমাদের পরিচয় দিয়ে বললেন, এঁদের সম্মান দেখাবার সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেরাই সম্মানিত।

এবারে অবিশ্যি নীলকান্ত সবাইকে 'টিচার' বলে পরিচয় দিলেন। আলাদা করে অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকের প্রশ্ন আর তুললেন না।

গোপালবাবু খুব খুশি এতে। পিঠ চাপড়ে নীলকান্তকে বললেন,—এই ওজনি (আমি শিক্ষক)।

এতক্ষণে চন্দন পরিয়ে দিয়েছিল যে মেয়েটি, সে এগিয়ে এসেছে। নিজের লেখা একটি মণিপুরী কবিতা পড়ছে :—

নগাসিডি যমনা সথরা (আজ বড় গরম)
এই ওয়ারা (আমি ক্লান্ত)।
নোং চুদৌরা (বৃষ্টি হতে চলেছে)
এই হারৌরা (আমার আনন্দ)।

বুঝলাম, গরমে কষ্ট হচ্ছিল কবির। হঠাৎ বৃষ্টির আভাস পেয়ে মনে আনন্দ হয়েছে।

—কিন্তু এ তো ঠাণ্ডার জায়গা!—কবিতাটি পড়া হতেই নীলকান্তকে শুধিয়েছিলাম,—তেমন গরম কি এখানে পড়ে? নীলকান্ত জবাব দিয়েছিলেন,—হ্যাঁ, পড়ে বৈকি! মে-জুনে বেশ গরম।

ভাবলাম,—হবে হয়তো। খোদ শ্রীনগরেও জুন-জুলাই নাগাদ পাখা চলে। আর এ তো ইম্ফল! শ্রীনগরের অর্ধেক উঁচু।

এতক্ষণে সম্পাদক মশাই এগিয়ে এসেছেন। দু'টি করে বই উপহার দিচ্ছেন আমাদের—'গ্লিম্প্সেস্ অব্ মণিপুরী ল্যাংগুয়েজ লিটারেচার অ্যাণ্ড্ কাল্চার' এবং 'এ ক্যাটালগ অব্ মণিপুরী বুক্স্'।

মনে পড়ল,—হ্যাঁ, গতকালই। গোপালবাবু সম্পাদকের কাছে

ক্যাটালগ চাইতে উনি বলেছিলেন,—সব আগামীকাল। সম্বর্ধনা সভায়।

শেষ অবধি বেশ ভালই হল সম্বর্ধনা। মঞ্চ নেই, মাইক-অ্যাম্প্লিফায়ার নেই, ভিড় নেই, গাদাগাদি নেই; নেহাৎ-ই ঘরোয়া পরিবেশ। ছোট্ট অথচ সুন্দর আয়োজন। সমাগতদের সংখ্যা সব মিলে বারো-চৌদ্দর বেশি হবে না। (অবিশ্যি হলেও মুশকিল হ'ত। ছোট ঘরে জায়গা হ'ত না।)

এদিকে বরণ এবং উপহার-পর্ব শেষ হতেই তরুণ-তরুণীরা চলে গেল। প্রবীণদের মুখোমুখি বসে গল্পগুজব এবং আলোচনা শুরু করলাম আমরা।

মণিহার সিং ইংরেজী পড়ান ডি. এম্. কলেজে। বললেন,—মণিপুরীতে এম্. এ. খুলবার চেষ্টা চলছে। শুধালাম,—খোলা হয়নি এতদিন?

—না।

—অনার্স?

—না, তা'ও না। বি. এ.-তে ইলেক্‌টিভ্ অবধি মণিপুরী।

নীলকান্ত বললেন,—সবই হচ্ছে। তবে ধীরে ধীরে। মণিহার সিং-ই উদ্যোগী হয়েছেন এ-ব্যাপারে।

শুধালাম,—উদ্যোগী? কী রকম?

নীলকান্ত বুঝিয়ে দিলেন,—স্থির হয়েছে, আপাততঃ অনার্স এবং এম্. এ.-তে মণিপুরীর দায়িত্ব উনিই নেবেন।

গোপালবাবু চুপচাপ ছিলেন এতক্ষণ। এইবার কথা বললেন,—কত এগোচ্ছেন আপনারা! কত কী করছেন! কিন্তু দেখুন, আমাদের ত্রিপুরী ভাষা; যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল। মোটে এগোল না।

বললাম,—এজন্য ত্রিপুরী এবং বাঙালী—দু'তরফই দায়ী।

—কেন? দু'তরফ কেন?—দুরূহ প্রশ্ন গোপালবাবুর।

জবাব তৈরীই ছিল। বললাম,—ত্রিপুরীরা নিজেরা কিছু না করে বাঙ্গালীর দিকে তাকিয়েছে। আর বাঙ্গালীরা ত্রিপুরীর দিকে তাকানো প্রয়োজন মনে করে নি।

গোপালবাবু কিছুতেই মেনে নিলেন না আমার কথা। ওদিকে মণিহার সিং অন্য প্রসঙ্গ তুললেন,—আমরা মণিপুরীরা কিন্তু সেয়ানা। গাছেরও খাবো, তলারও কুড়োব।

শুধালাম,—কুড়োবেন? মানে?

—মানে, কুড়োচ্ছি।—মণিহার সিং মৃদু হেসে জবাব দিলেন, —বাংলার ভালো যা কিছু, সব অনুবাদ করছি মণিপুরীতে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র মণিপুরের ঘরে ঘরে এখন।

বললাম,—মধুসূদন বলতে মেঘনাদ বধ তো?

মণিহার সিং হা-হা করে উঠলেন,—না না, তা কেন হবে? বীরাঙ্গনা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী—সব।

—আর বঙ্কিমচন্দ্র?

—কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, সীতারাম, আনন্দমঠ—বাদ নেই কোনোটা।

—রবীন্দ্রনাথ?

—অনুবাদ হয়েছে। আরও হচ্ছে। নীলকান্ত সিং সাহায্য করছেন এ-ব্যাপারে।

—নীলকান্ত করছেন?—অবাক হয়ে মণিপুরী বন্ধুটির দিকে তাকালাম,—কই! কিছু বলেন নি তো?

নীলকান্ত এবারেও কিছু বললেন না। বিনয়ে লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে এমন একটা ভাব করলেন যে দেখে মনে হল, কাজটা করলেও দারুণ কিছু একটা অন্যায় করছেন তিনি।

এদিকে গল্পে-গুজবে সময় পেরোয়। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়। দেখতে দেখতে সামনের রাস্তাটা জনবিরল হয়ে আসে।

নীলকান্ত তাড়া দেন,—নিন। চলুন এবার। ফেরা যাক।

গোপালবাবুর আপত্তি,—ফিরতে ইচ্ছে হয় না। মন বলে, আরও খানিকক্ষণ বসি। এমন সুন্দর পরিবেশ!

সুধীরবাবু অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন। এইবার আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন,—কী? কইছি মুক্তি। (বলেছিলাম কিনা?)—স্যার, মিটিং পাইলে কিছু আর চায় না। শেষে তার

সেদিন সাহিত্য পরিষদ থেকে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় আটটা। ফিরে দেখি, শান্তিলাল তেমনি মাথায় হাত দিয়ে বসে।

না, রামলাল ফেরে নি।

কী করা যায়, আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন গোপালবাবু। এমন সময় নীলকান্ত মুশকিল-আসান হতে চাইলেন,—কিছু ভাববেন না। ও বরাবর এইরকম। মাঝে মাঝে ডুব দেয়; আবার দু'চার দিন বাদেই ফিরে আসে।

—এবার কি ফিরবে?—বলতেই গোপালবাবুর দিকে তাকিয়ে মনে হল, ওঁকেও শান্তিলালের দশায় পেয়েছে।

কিন্তু শান্তিলাল তো বাবা। আর গোপালবাবু? পরদেশী অপরিচিত একেবারে।

অবাক লাগল। আরও অবাক হলাম দেখে যে, গোপালবাবু শান্তিলালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাত জাগছেন। অথচ নীলকান্ত যাবার সময় বারবার বলে গেছেন, খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। কাল আবার ভোরে বেরোতে হবে; মোইরাঙ্ হয়ে চুড়াচাঁদপুর।

মোইরাঙ্। নাম শুনে নেতাজীর আই. এন্. এ.র কথা মনে আসে।

'এ সর্ট হিস্ট্রি অব্ মণিপুর' হাতের কাছেই ছিল। খুলে বসি।

দেখতে দেখতে রাত বাড়ে। শীত শীত লাগে। বই রেখে উঠি একবার। ডিপ্লোম্যাট হোটেলের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই।

দেখি, শান্তিলাল আর গোপালবাবু পাশাপাশি। পথের দিকে মুখ করে বসে। সলা-পরামর্শ করছেন; আর বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন মাঝে মাঝে।

গোপার্গে কারোই ঘুম হয় নি ভালো।

মণিহার।স্তলালের সমব্যথী গোপালবাবু; আর গোপালবাবুর আমরা।

গাে'

পরদিন। সাতটাও বাজে নি; নীলকান্ত হাজির। সঙ্গে 'এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট'-এর জীপ।

তৈরী হয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরোলাম।—

ইম্ফল অনেক আগেই জেগেছে। রাতভোর দীর্ঘ নিদ্রার চিহ্ন-ও নেই কোথাও। আর দশটা পাহাড়ী শহরের মতো উঠি-উঠি ।বটুকুও নেই। এরই মধ্যে উঠে, হেটে, চলে রীতিমত সে কর্মব্যস্ত।

শহর ছাড়াতেই চারিদিক অন্যরকম আবার। ব্যস্ততা নেই, ভিড় নেই; যেন ঘুমে ঢুল্ ঢুল্ ভাব।

মণিপুর উপত্যকা অপরূপ দেখাচ্ছে। পাহাড় চারিদিকে। সারি সারি। মাঝখানে আমরা। ছুটছি। প্রায়-সমতল পথ ধরে।

পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সূর্যরশ্মি। ঝলমল করছে। সবুজের মেলায় রুপোলী জরি ঢালছে কে যেন। আলোতে-ছায়াতে ঢলাঢলি চলছে।

শোনা যায়, এ রেওয়াজ প্রাচীন। বয়স হল মণিপুর উপত্যকার। দশ লক্ষ প্রায়।

তার আগে জলগর্ভে ছিল সে। পার্শ্বচর কাছাড় ও প্রতিবেশী ত্রিপুরাকে নিয়ে মহাসমুদ্রে সমাধিস্থ ছিল।

তখন জল, শুধুই জল এদিকে। আর এখান থেকে দূরে, অনেকটা দূরে উত্তর-পূর্বদিকে আসামের মহাকায় পাহাড়গুলো।

পাহাড় তো নয়, প্রহরী যেন। আকাশছোঁয়া। ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়ে ওদের গায়ে; সহচরদের কান্নার মতো শোনায়। সূর্য-

প্রদক্ষিণের পথে পৃথিবীর বয়স বাড়ে লক্ষ লক্ষ বছর। কিন্তু সাগর-শাসিত মণিপুর আলোর নাগাল আর পায় না।

তারপর! একদিন। হঠাৎ কী যে হল! জলে-স্থলে কানাকানি। চারিদিকে থরো থরো কাঁপন। সাগর-জঠর থেকে মণিপুরের মুক্তি। সদ্যোস্নাতা টকটুকে নববধূটির মতো আর্দ্রবেশে সিক্তকেশে তার সূর্যবন্দনা।

সে উঠল। জাগল। পাহাড়-পারিষদদের মাঝখানে বহুমূল্য 'মণি'টির মতো চকচক করল। যুগে যুগে কত রসিক এল তার টানে।

মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বলছেন, এমনকি অর্জুনও নাকি।

আদি পর্বে আছে, বনবাসী পরিব্রাজক অর্জুনের কথা।—ঘুরতে ঘুরতে মণিপুরে এলেন তিনি। মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণি-গ্রহণ করলেন। বভ্রুবাহন নামে একটি পুত্রলাভ হল তার। রঙে-রসে মণিপুর তাঁকে বিস্মিত করল।

লোকে বলে, দীর্ঘদিন বাদেও এ-বিস্ময়ের ঘোর নাকি কাটে নি।—

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। তোড়জোড় চলছে। মেধ্য অশ্বটিকে স্নান করিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। স্বেচ্ছায় সবত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। তার সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাদের নিয়ে মহাবীর অর্জুন, সতর্ক, সাবধান সব সময় কেননা, বিপদ হতে পারে। পররাজ্যের উপর দিয়ে যাবার সময় মেধ্য অশ্বটিকে হরণ করতে পারে কেউ, আবার কেউ বা তার যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

ঘুরতে ঘুরতে অশ্বটি মণিপুরে এল।—

অর্জুনও এসেছেন এদিকে। সারাক্ষণ লক্ষ্য রাখছেন তুরঙ্গমের দিকে।

মণিপুরের সম্রাট তখন অর্জুন-পুত্র বভ্রুবাহন। পিতা এসেছেন

শুনে মহা খুশি তিনি। ব্রাহ্মণদের নিয়ে বিনীতভাবে এগিয়ে এলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে।

অর্জুন এতে ক্ষুব্ধ।

—তুমি না ক্ষত্রিয়?—পুত্রকে বললেন তিনি,—যুদ্ধই না তোমার ধর্ম?

বভ্রুবাহন জবাব দিলেন না কিছু। অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অর্জুন থামেন নি তখনও। তিরস্কার করছেন,—এ বিনয় কি তোমার শোভা পায়? করজোড়ে পরদেশীদের অভ্যর্থনা করছ তুমি? ছিঃ ছিঃ!

বভ্রুবাহন এবারও নিরুত্তর।

অর্জুন বললেন,—অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন যুধিষ্ঠির। আমি তাঁর অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত। তোমার রাজ্যে এসেছি যুদ্ধ-কামনায়, বিনীতভাব অবলোকন করব বলে নয়।

বভ্রুবাহন তখনও ঠিক করজোড়েই দাঁড়িয়ে।

—ধিক! ধিক!—অর্জুনের কণ্ঠস্বরে গঞ্জনার অনুরণন,—আমি যদি নিরস্ত্র হতাম, তবে তোমার এই বিনয় শোভা পেত। কিন্তু তা তো নই। সসৈন্যে এসেছি তোমার রাজ্যে। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়েই এসেছি। আর তুমি কিনা একথা জেনেও নিরুত্তাপ? আচ্ছা, তোমার কি পুরুষকার নেই? স্ত্রী-সুলভ দুর্বল তুমি?

অর্জুন যখন বভ্রুবাহনকে এইভাবে তিরস্কার করছিলেন, তখন নাগকন্যা উলুপী সঙ্গে সঙ্গেই অবগত হচ্ছিলেন সব কিছু। কী করবেন, চিন্তা করছিলেন।

এই উলুপী হলেন অর্জুনের আর এক স্ত্রী; অর্থাৎ, বভ্রুবাহন সম্পর্কে তাঁর সতীন-পুত্র।

অর্জুন-বভ্রুবাহন সংবাদ উলুপীর কানে যেতেই মণিপুরে হাজির হলেন তিনি। চিন্তাক্লিষ্ট এবং অধোমুখ বভ্রুবাহনকে বললেন,—বৎস, আমি তোমার বিমাতা। তোমাকে উপদেশ দেব বলে এসেছি।

তুমি যদি আমার কথা শোন তো লাভবান হবে। পরম ধর্ম অধিগত হবে তোমার।

বভ্রুবাহন বললেন,—ধর্মলাভে চিরকালই আমার আকাঙ্ক্ষা। আপনি পথ-নির্দেশ করুন।

—নির্দেশ? গর্জন করে উঠলেন উলূপী,—তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে বৎস! পিতা অর্জুন যুদ্ধার্থী হয়ে তোমার রাজ্যে উপস্থিত। আর তুমি কিনা ভীরুর মতো তাঁকে অভ্যর্থনা করবে?

বভ্রুবাহন সবিনয়ে বললেন,—কী আমার কর্তব্য তবে?

—যুদ্ধ,—স্পষ্ট জবাব দিলেন উলূপী,—তুমি যুদ্ধে উদ্যোগী হলে অর্জুন তোমার প্রতি খুশিই হবেন।

—বেশ! যুদ্ধই শিরোধার্য তবে,—বভ্রুবাহন এবার উত্তেজিত।

অচিরেই উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হল। কাঞ্চনময় বর্ম পরলেন বভ্রুবাহন। ঝলমলে শিরস্ত্রাণ ধারণ করলেন। দেখতে দেখতে চার ঘোড়ায় টানা হিরণ্ময় সিংহধ্বজ রথ এল।

ওদিকে তূণীরে জায়গা নেই আর। অসংখ্য অস্ত্রে সব ক'টি পরিপূর্ণ।

উষ্ণীষধারী অনুচররা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন,—মহারাজ, অস্ত্র আমাদের তূণেও প্রচুর। যদি আজ্ঞা দেন, তো মুহূর্তে শত্রুকে পর্যুদস্ত করি।

মহারাজ আজ্ঞা দিলেন,—মেধ্য অশ্বকে ধারণ কর তোমরা। অর্জুনকে আমি দেখছি।

অনুচররা আজ্ঞা পাওয়া মাত্র অশ্বকে অবরোধ করল। আর ওদিকে ধনঞ্জয় ও বভ্রুবাহনে শুরু হল তুমুল সংগ্রাম।

অর্জুন রথারূঢ় বীর পুত্রের দিকে বাণ নিক্ষেপ করেন। পুত্রও মুহূর্তের মধ্যে যোগ্য জবাব দেন।

দেখতে দেখতে লড়াই জমে ওঠে। সমাগত দর্শকরা ভাবেন, দেবাসুর যুদ্ধ বুঝি।

এদিকে যুদ্ধে বভ্রুবাহনের প্রভাব বিস্তৃত হয় ক্রমেই। অর্জুনের কণ্ঠাস্থি লক্ষ্য করে তিনি শর নিক্ষেপ করেন।

অব্যর্থ সেই শর। অর্জুনের কণ্ঠ বিদীর্ণ করে তা পাতালে প্রবেশ করে।

ধনঞ্জয় তখন মৃতবৎ। দিব্যতেজ ধারণ করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকেন তিনি। তারপর সংজ্ঞা লাভ করে পুত্রকে সাধুবাদ প্রদান করেন,—বৎস! তোমার বীরত্ব-দর্শনে পরম পরিতুষ্ট আমি। একান্ত-ভাবে মুগ্ধ। এখন আমি তোমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করছি। সাধ্য থাকে তো প্রতিহত কর।

বভ্রুবাহন রাজী। বললেন,—তথাস্তু।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু হল সংগ্রাম। অর্জুন বভ্রুবাহনের প্রতি স্থূলকায় বাণ নিক্ষেপ করলেন। গাণ্ডীব-নির্মুক্ত মারণাস্ত্র পাঠালেন একের পর এক।

বভ্রুবাহনও মহাবীর। সমুচিত জবাব দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। অর্জুনের তীক্ষ্ণ ভীষণ বাণগুলোকে ছেদন করলেন।

ধনঞ্জয় এবার বভ্রুবাহনের ধ্বজযষ্টি তাক করে তীর ছুঁড়লেন। স্বর্ণখচিত অপরূপ রথটিকে ছিন্নভিন্ন করলেন দেখতে দেখতে। রথ-বাহক চার চারটি অশ্ব ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। অর্জুনের শরাঘাতে মৃত্যুবরণ করল অচিরেই।

মহাবীর বভ্রুবাহন তখন রথ থেকে মাটিতে নেমে এলেন। ক্রোধে গর্জন করতে করতে পিতার সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন আবার।

পিতা ধনঞ্জয় এ-দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। তখনও পুত্রের দিকে অবিরাম শর-বর্ষণ করছেন তিনি। পীড়নে আঘাতে বারবার তাঁকে জর্জরিত করছেন।

এদিকে বভ্রুবাহন তখন উত্তেজিত। ভাবলেন, উগ্র বিষধর সমতুল্য শর নিক্ষেপ করি এবার। পাখাযুক্ত বাণ দিয়ে পিতার বক্ষোদেশকে বিদ্ধ করি।

বালকসুলভ চাপল্যহেতু ঠিক সেই মুহূর্তেই অর্জুনকে চরম আঘাত হানলেন তিনি। মারাত্মক বাণ দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করলেন।

মর্মভেদ হল অর্জুনের। মোহাবেশ হল। তিনি মাটিতে লটিয়ে পড়লেন। এদিকে পিতার মৃত্যু হয়েছে দেখে বভ্রুবাহনও মোহাবিষ্ট। সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়লেন তিনিও।

তাঁর জননী চিত্রাঙ্গদা সব শুনে হতবাক প্রথমে। তারপরে উন্মাদিনী।

কালবিলম্ব না করে সমরভূমিতে ছুটলেন তিনি। নাগরাজ-কন্যা উলূপীকে বললেন,—এ তুমি কী করলে? পুত্রকে প্ররোচনা দিলে পিতৃহত্যায়? তুমি না পতিব্রতা? ধনঞ্জয় না তোমার পতি? ছি! ছি! এই তোমার ধর্ম?

উলূপী কোনো অভিযোগেরই জবাব দিলেন না কিছু। নির্বাক. স্থবির পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। চিত্রাঙ্গদা আবার বললেন,—ধনঞ্জয় কি তোমার কাছে অপরাধী? কোনো ক্ষতি করেছেন তোমার? যদি করে থাকেন তো আমি ওঁর হয়ে মার্জনা চাইছি। করজোড়ে প্রার্থনা করছি, দয়া করে ওঁকে বাঁচাও।···ছাখ উলূপী, বভ্রুবাহনের জন্যে ততটা দুঃখ হচ্ছে না আজ। দুঃখ হচ্ছে ধনঞ্জয়ের জন্যে। পুত্রের হাতে নিহত হলেন মহাবীর! আর তুমি কিনা পুত্রকে প্ররোচিত করলে!···আজ তুমি যদি ধনঞ্জয়কে পুনরুজ্জীবিত না করো তো এই সমরভূমিতেই আমি উপবাসে প্রাণত্যাগ করবো।

উলূপী এবারেও জবাব দিলেন না কিছু। এদিকে বভ্রুবাহনের মোহনিদ্রা ভেঙ্গেছে। জ্ঞান হওয়া মাত্রই আর্তনাদ করছেন তিনি,—হায় হায়! এ আমি কি করলাম? মহাবলী ধনঞ্জয়কে নিধন করে পিতৃহন্তা হলাম? আমার জননী সহমৃতা হবেন এখন? পিতার পাশেই অন্তিমশয়নে তিনি?

এই অবধি বলে বভ্রুবাহন থামলেন একটু। শোকে-দুঃখে কাতর

হয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণদের সম্বোধন করে বললেন,—আজ্ঞা দিন আপনারা। আদেশ করুন, কী করলে আমার এই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়?

ব্রাহ্মণরা কেউ কিছু বললেন না। সবাই স্তব্ধ নিরুত্তর থাকলেন।

বভ্রুবাহন তখন বিশ্বজগৎকে সম্বোধন করে বললেন,—হে যক্ষ, রক্ষ, দেব, দেবী, ভূত, প্রেত এবং পিশাচগণ! তোমরা শোন, আমি পিতৃঘাতক। ধনঞ্জয়কে হত্যা করে মহাপাপ করেছি। এখন তিনি যদি না পুনরুজ্জীবিত হন তো তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করবো আমি। পিতার এই মৃতদেহের পাশেই প্রায়শ্চিত্ত করবো।

প্রতিজ্ঞা মাত্রই তা পালনে উদ্যোগী হলেন বভ্রুবাহন। এদিকে উলূপী দেখলেন, পিতৃশোকে ধনঞ্জয়-পুত্র মুমূর্ষু। অবিলম্বে কিছু একটা করা দরকার।

তৎক্ষণাৎ নাগলোকের সঞ্জীবন-মণির কথা চিন্তা করলেন তিনি। আর চিন্তা মাত্রই মণি হাজির হল। উলূপী সেই মণি বভ্রুবাহনের হাতে দিয়ে বললেন,—বৎস! গ্রহণ কর। তোমার পিতার বক্ষে স্পর্শ করাও এই মণি। তিনি পুনরুজ্জীবিত হবেন!···কী জানো, অর্জুনকে পরাজিত করা তোমার সাধ্য নয়। তুমি তো দূরের কথা, ইন্দ্রেরও নয়। তোমার পিতাকে খুশি করবো বলেই আমি মায়াবিস্তার করেছি এতক্ষণ। কারণ, জানো তো, পিতা এখানে এসেছেন তোমারই পরাক্রম প্রত্যক্ষ করবেন বলে।···নাও নাও, বিলম্ব নয় আর! ধনঞ্জয়ের বক্ষোদেশে অচিরে স্থাপন কর এই মণি। তাঁকে পুনরুজ্জীবিত কর।

বভ্রুবাহন উলূপীর নির্দেশমত কাজ করলেন। আর অর্জুনও গাঢ় নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন যেন।—কিন্তু উলূপী,—জ্ঞান ফিরে আসতেই অর্জুনের প্রশ্ন—এই সমরক্ষেত্রে তুমি কেন? আর কেনই বা চিত্রাঙ্গদা?

উলুপী বললেন,—প্রভো! আমার ইচ্ছে যাব আমি। পার্বতীকে কল্যাণ হবে বলে আমিই বভ্রুবাহনকে যুদ্ধে প্ররো।

—তুমি করেছ? কিন্তু কেন? সায় দিলেন,—

—বলনুম কল্যাণ হবে বলে। আর তাছাড়া, আপনি সঙ্গে যুদ্ধ করতেই চেয়েছিলেন! এলেন।

—হ্যা চেয়েছিলাম। কিন্তু পরাজয় তো চাই নি!

—পরাজয়েরও প্রয়োজন ছিল মহাবলী!

—ছিল?

—হ্যা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অধর্ম করেছেন আপনি। শিখণ্ডীর সহায়তা নিয়ে মহাত্মা ভীষ্মকে পীড়ন করে মহাপাপ করেছেন। এখন নিজপুত্রের কাছে পরাজিত হওয়ায় সেই পাপ খণ্ডন হল। কেননা, দেবতা ও বসুগণ আপনাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, শুধু মাত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহনের শরে যুদ্ধক্ষেত্রে নিপাতিত হলেই অর্জুনের মুক্তি।

মুক্তি?—পথে যেতে যেতে সেদিন ভাবি—কে জানে! পুরাণ-কাহিনী হাজার হোক; সত্যি-মিথ্যে নিয়ে আজ আর প্রশ্ন চলে না। তবে সুপ্রাচীন মহাভারতে উল্লেখ আছে মণিপুরের। ভারত-আত্মার সঙ্গে তার সনাতন আত্মীয়তার এটাই বড় কথা।

এদিকে দেখতে দেখতে এগিয়ে এসেছি আরও খানিকটা পথ। ঠিক সামনেই দু'টি পাহাড়-বরাবর ছুটছি।

একবার মনে হল, পথ রুদ্ধ; পাহাড় দু'টির একটিকে অন্ততঃ ডিঙোতে হবে। কিন্তু না; পাহাড়ে-পথিকে লুকোচুরি চলছে যেন। পথ পাহাড়ের পাদদেশকে ছুঁই ছুঁই করেও পাশ কাটিয়েছে দিব্যি। চলেছে ঠিক সেই একইরকম সমতল প্রান্তর ধরে।

পথের দু'পাশে শস্যক্ষেত্র। কদাচিৎ দু'টো-একটা পল্লী।

জীপ একবার প্রায়-শহর মতো এক এলাকার উপর দিয়ে ছুটল।

হয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস জানলাম, এই হল নাম্বোল; বড় বাজার
সম্বোধন করে বলছে
কী করলে আমা।পরোতেই আবার সেই প্রান্তর। কদাচিৎ একটা-
ব্রাহ্মণ পাহাড়ের পা-ছুঁয়ে এগিয়ে-চলা।
থাকলেইল কয়েক এগোতে প্রায়-শহর আর একটা ; নাম বিষেণপুর
। বিষ্ণুপুর।

ভালো করে তাকাতেই দেখি, না, প্রায়-শহর ঠিক নয় ; পুরো শহরই বটে। মফঃস্বল বাংলার ছোটখাটো কোনো মহকুমার সদর-দপ্তর যেন।

জায়গাটা ইম্ফল থেকে মাত্র সতের মাইল। কিন্তু হাবভাব দেখলে মনে হয়, শহুরে কায়দা-কানুনের দিক থেকে রাজধানীর সঙ্গে আদৌ যেন মিল নেই তার।

বিষ্ণুপুরের পথঘাট পীচঢালা ; তবে ইম্ফলের মতো প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন নয়। দোকানপাটে ভিড় আছে, কিন্তু ইম্ফলের মতো জমজমাট ভাবটুকু নেই। পাকা ঘরবাড়িও অনেক, কিন্তু রাজধানীর ঐশ্বর্যের ছিটেফোঁটাও অনুপস্থিত।

অথচ বনেদী জায়গা এই বিষ্ণুপুর। মণিপুরের ইতিহাসে তো বটেই, পুরাণেও বার বার এর নামোল্লেখ আছে।

পুরাণে পাই, আদিকালে সব কিছুই ছিল জলময়। মণিপুরও। 'লাইবংথৌ' (দেবতা) এবং 'লাইলুড়া'রা (দেবী) ভাবনায় পড়লেন,—তাই তো! শুধু জল নিয়ে তো সৃষ্টি থাকে না, স্থলও চাই। নয় জন লাইবংথৌ সায় দিলেন,—হ্যাঁ চাই। এখুনি চাই।

সাত জন 'লাইলুড়া'ও এগিয়ে এলেন,—বটেই তো! স্থল না হলে কি চলে!

ব্যস। দেখতে দেখতে কাজে লাগলেন 'লাইবংথৌ' এবং 'লাই-লুড়া'রা। ৬৪টি মাটির ঢিবি গড়লেন। সৃষ্টি হল পৃথিবী।

শিব বললেন,—মণিপুরে আছে নোংমাইজিং (নীলকান্ত) গিরি।

দেখতে অপরূপ নাকি। এই নোংমাইজিং-এ যাব আমি। পার্বতীকে নিয়ে রাসনৃত্য করবো।

দেবদেবীরা নীলকণ্ঠের কথা শুনে খুশি। একবাক্যে সায় দিলেন,—বেশ তো! যাবেন। করবেন রাসনৃত্য।

নীলকণ্ঠ এবার পার্বতীকে সঙ্গে দিয়ে নোংমাইজিং-এ এলেন। মণিপুর উপত্যকা তখনও জলমগ্ন।

—এত জল চারিদিকে!—শিব বললেন,—শুধু জল আর জল! এ-পরিবেশে কি রাসনৃত্য জমে?

পার্বতী বললেন,—না মহাদেব। জমে না।

মহাদেব তখন ত্রিশূল হাতে নিলেন। দক্ষিণ দিকের পর্বত ভেদ করে গুহাপথ গড়লেন একটি। মণিপুর উপত্যকা থেকে বেশির ভাগ জলই সরে গেল। জল সরবার মুহূর্তে প্রথম যে জায়গাটি ভেসে ওঠে, তারই নাম হল বিষ্ণুপুর।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি পুরাণ-কথিত সেই বিষ্ণুপুরের পথ ধরে। আমাদের গাড়িটি শহরের ঘিঞ্জি এলাকা পেরোবার পর নিরিবিলি এক পাড়ার সামনে এসে দাড়ায়। যেন দম নেয় একটু।

—এইবার ডানদিকে বেঁকতে হবে,—নীলকান্ত বললেন,—পথ এবড়ো-খেবড়ো। সাবধান।

ড্রাইভার সাবধানেই এগোল। মূলপথ থেকে খানিকটা নেমে গিয়ে শাখাপথ ধরল।

অবিশ্যি পথ নয় ঠিক, প্রায়-পথ। তার কোথাও ডালপালা আর লতাপাতা, কোথাও ছোট-বড-মাঝারি ইট-পাথর।

চলতে চলতে এত দোল খেল গাড়ি যে, ভাবলাম নৌকোয় উঠেছি। পাড়ি দিচ্ছি প্রমত্তা পদ্মা।

কিন্তু না, ভাগ্যি ভালো বলতে হবে। পদ্মার তুলনায় পথটি খাটো। ফার্লং-খানিক যেতে না যেতেই গাড়ি এসে এক মন্দিরের সামনে দাঁড়াল।

নীলকান্ত বললেন,—এই হল বিষ্ণুমন্দির। এরই জন্যে বিষ্ণুপুরে আসা।

এরই জন্যে?—গাড়ি থেকে নামতে নামতে আপন মনেই প্রশ্ন করি যেন। জীর্ণ-শীর্ণ বিষ্ণুমন্দিরের দিকে তাকাই। হঠাৎ কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মনটা। বার বার ভাবি, এরই জন্যে এত কষ্ট করে আসা? এই হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে-পড়া মুমূর্ষু দেউলটিকে দেখব বলে?

জায়গায় জায়গায় ইট খসে গেছে বিষ্ণুমন্দিরের। পুরনো আমলের ইট-সুরকী এমনভাবে বেরিয়ে পড়েছে যে, দেখলেই সন্দেহ হয়, এই বুঝি ঝুপ ঝুপ করে পড়বে।

একটু তফাৎ থেকে বিষ্ণুমন্দিরের চেহারা ধিঙ্গি লম্বা কোনো বাউলের মতো। উঁকিঝুঁকি-মারা ইট-সুরকীর দৌলতে বাইরেটা ঠিক তেমনি গৈরিক, গম্বুজ-আকারের চূড়াটা বাউলের পাগড়ীটির মতো তেমনি।

আর একটু এগোন; বাউলের ভ্রান্তি কাটবে। পরিত্যক্ত এক বাতিঘর দেখছেন, মনে হবে।

বাতিঘরটি যেন দোতলা। বর্গাকার ভূমিতল থেকে সোজা খাড়া উঠে গেল তার প্রাচীর। গম্বুজাকৃতি ছাদের গায়ে গিয়ে ঠেকল।

বাতিঘরের নীচতলায় চারদিকে চারটি প্রবেশ-পথ। আর দোতলায় প্রতি দিকে দু'টি করে জাফরি-কাটা জানালা।

আরও একটু এগোন। বাতিঘরের ভ্রান্তিও কাটবে। জীর্ণ মন্দির তার ভীষণ শূন্যতা নিয়ে গ্রাস করতে চাইবে আপনাকে।

মন্দিরে দেবতা নেই, বেদীতল শূন্য। ভক্ত সমাগম নেই, প্রাঙ্গণ শূন্য। কাঁসর-ঘণ্টা নেই, চারদিক শূন্য। যেন শূন্যতা এখানে যুগ যুগ ধরে জমছে। এখানে একটিই কথা শুধু;—নেই আর নেই।

কিন্তু তবু, 'ভাঙা মন্দির তো'! মহিমা কি এত সহজেই লুপ্ত হবে তার?

দুই সম্রাট সারা রাত ধরে উৎসব করলেন,
একে অপরকে কত কিছু উপহার দিলেন।

প্রথমে হল দাসদাসী বিনিময়। তারপর ব।
বাদককে উপহার দেন তো উনি বাঁশী-বাদককে।
বাদককে তো উনি বিউগল্-বাদককে।

শেষ পর্যন্ত আসল উপহার কিন্তু পোঙ্-সম্রাটের ক।
এলো। খাগাম্বাকে পাথরে-গড়া ছোট একটি বিষ্ণুমূর্তি দিয়ে
বললেন,—এ দেখতে ছোট; কিন্তু মহিমায় অন্য সব কিছুর চে.
বড়। এটি গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন।

খাগাম্বা দু' হাত পেতে গ্রহণ করলেন সেই মূর্তি! আর লোকে বললো,—হাত তো নিমিত্ত। আসলে গ্রহণ করল তাঁর অন্তর।

অতিশয়োক্তি নয়; মিথ্যে নয় কথাগুলো। খাগাম্বা অন্তর দিয়েই বিষ্ণুমূর্তিকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই যদি না হবে তো এ-ঘটনার পর থেকেই মণিপুরে বিষ্ণু-পুজার প্রবর্তন হবে কেন? আর কেনই বা খাগাম্বা ব্রাহ্মণদের সমাদর করে ডেকে এনে বিষ্ণু-সেবার আয়োজন করবেন? ধুমধাম করে এই বিষ্ণুমন্দির গড়বেন?

মন্দির-নির্মাতা সেই পরাক্রান্ত ও ধার্মিক খাগাম্বা! টিকলেন কি তিনি, যে তার মন্দির টিকবে?

আশে-পাশের ঝোপ-ঝাড়গুলোর দিকে তাকাই। 'বিস্মৃত পরিচয়' ভক্তদের খুঁজি।—

না, এতটুকু সাড়া-শব্দ নেই কোথাও। চারিদিক স্তব্ধ, থমথমে। বাছুরটা ঠিক তেমনি ঘুমুচ্ছে। চামচিকের দাপাদাপি করছিল একটু আগে; এতক্ষণে থেমে গেছে। মন্দিরটাও যেন শতাব্দীর ঘুম থেকে জাগতে জাগতে ঘুমিয়ে গেছে আবার।

শুধুমাত্র শিউলিগুলো বিশ্বস্ত। সুবাস পাঠাচ্ছে ঠিক।

সূর্য বিশ্বস্ত। ঠিক তেমনি প্রসন্নতা ছড়াচ্ছে।

ার।—

টা পথ আরও।

ত চলে। শাখাপথ পেরিয়ে 'হাইওয়ে' ধরে।

'তাক হ্রদ' কাছে আসে দেখতে দেখতে। অদ্ভুত,

দৃশ্য চোখে পড়ে।

, সামনেই টলটল করছে জল। পাহাড়ের ফ্রেমে-আটা রাশি ডালিমের নির্যাস যেন। ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলছে। আকাশের দোয়াটি বুকে টেনে কাঁপছে।

তার এখানে-সেখানে ছোট-বড় দ্বীপ। ডালিম-নির্যাসের মাঝখানে ছড়ানো-ছিটনো কিছু দানা যেন। ভাসছে, ডুবি-ডুবি করছে।

শোনা যায়, এককালে এমন হ্রদ আরও নাকি অনেক ছিল। মণিপুর উপত্যকা হ্রদেরই খাসমহল ছিল এক সময়। সম্রাট তাওথিঙ্ মঙ্ মহলের রূপবদল করেন। জল-নিকেশ করে রাজ্যের স্থল-এলাকা বাড়ান।

সে-সব অনেকদিনকার কথা। সতের শো বছর আগেকার কাহিনী। ১৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হলেন তাওথিঙ্ মঙ্। মণিপুর উপত্যকার এখানে-সেখানে তখন জল, শুধু জল আর জল।...সাপ-খোপ কিলবিল করে। জলে নামলেই জোঁকের দল ছেঁকে ধরে। এছাড়া হাতি, চিতা এবং ভল্লুকও আছে। আশে-পাশের জঙ্গলে থাকে। যখন-তখন আসে জল খেতে।

তাওথিঙ্ মঙ্ দেখলেন, সর্বনাশ! এইরকম যদি চলে তো দিনকয়েক বাদে মণিপুরে মানুষ থাকবে না আর; জীবজন্তুরাই শুধু থাকবে।

তাই তিনি জল-নিকেশে মন দিলেন। পাত্রমিত্রদের ডেকে বললেন,—জল নয়; ডাঙা চাই আরও।

—ডাঙা?—মিত্রদের মাথায় হাত। সবাই একবাক্যে বললেন,—কোথায় পাবো মহারাজ?

তাওথিঙ্ মঙ্ সোজা জবাব দিলেন,—এখানেই। এ-দেশে

—কী করে ?

—জল সরিয়ে।

—জল আর কোথায় সরবে মহারাজ ? দু' দু'টো বড় নদী ইরিল আর ইম্ফল কানায় কানায় ভরা।

—ওদের বুকে মাটি জমেছে, তাই ভরা। মাটি কাটো, নদীখাত গভীর করো, জল সরবে।

ব্যস। শুরু হল কাজ। হাজার হাজার মানুষ কোদাল আর বেলচা নিয়ে এগিয়ে এলো। রাজা নিজেও যোগ দিলেন। সঙ্গে বড় ভাই যৈমোম্বা।

দেখতে দেখতে ইরিল আর ইম্ফল গভীর হল। ছোটবড় খাল কেটে জলো জায়গাগুলোকে ওদের সঙ্গে জোড়া হল। জল সরে গিয়ে ডাঙা ভেসে উঠল হাজার হাজার একর।

রাজা পাত্রমিত্রদের বললেন,—কী ? ডাঙা মিলল ?

মিত্রদের উৎসাহে তখন জোয়ার। কেউ কেউ জবাব দিলেন,—মিলল মহারাজ। যদি আজ্ঞা দেন তো আরও মিলতে পারে।

—আরও ?

—হ্যাঁ মহারাজ ! মোইরাঙ্ এলাকাটা দেখেছেন ?

—দেখেছি।

—দেখেছেন, কত জল সেখানে ?

—না না : সে জল থাক।

—থাকবে ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—সেখানকার জলাধার নীচু। হ্রদ হবে সেখানটা। প্রজাদের কল্যাণ হবে।

-আজ্ঞা শিরোধার্য। এবার আর কেউ কিছু বললো না।

রে গায়েও আঁচড়টি লাগল না।

সেই হ্রদ। সেই লোকতাক।—

জীপ ছুটছে তার গা-ঘেঁষে। ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি।···একটু দূরেই পাহাড়। হ্রদের তীরে প্রহরী যেন।···পাহাড়ের চূড়ায় মেঘ। প্রহরীর মাথায় যেন শিরস্ত্রাণ।

দেখতে দেখতে চলেছি। পাহাড়ীয়া এই নিঝুমপুরীতে কোলাহল ছড়িয়ে দিচ্ছি।

একটু আগে; জীপের সাড়া পেয়ে একঝাঁক বালিহাঁস উড়ে গেল। আরও একঝাক সামনে। জটলা করছে এখনও। যেন হ্রদের বুকে হাট বসিয়েছে।

না, হাটও ভাঙল। আর একটু এগোতেই দেখি, সাজ-সাজ রব। যে-যার খুশিমত পালাচ্ছে। প্রাণভয়ে উড়ছে।

উড়বেই। খুন-জখম তো আর কম হয় নি এ-রাজ্যে! পাখি থেকে শুরু করে মানুষ অবধি কম প্রাণী তো মরে নি!

এক থাওয়ান থাবার আমলেই কত মানুষ প্রাণ দিল! লোকতাক হঠাৎ কী ভীষণ লাল হয়ে উঠল!

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ঘটনা। মণিপুরের সম্রাট তখন থাওয়ান থাবা। মণিপুরীদেরই এক উপজাতি খুমানদের বশে আনবেন বলে লড়াই শুরু করলেন।

এই লোকতাক হ্রদে মোকাবিলা হল দু' পক্ষে। তুমুল নৌ-যুদ্ধ হল। যুদ্ধে থাওয়ান থাবা জিতলেন শেষ অবধি; কিন্তু এত বেশি সৈন্যের বিনিময়ে যে, জয়ের পরেও আনন্দোৎসব আর জমল না। ফুলে-ওঠা পচা দেহের দুর্গন্ধে পান-ভোজন বন্ধ হল।

মণিপুর-সম্রাট থাংবি লাম্বাবার উৎসব ছিল অন্য রকম। হতভাগা সৈন্যদের রক্তে লোকতাক যখন রাঙা হচ্ছে, সম্রাট মনে মনে তখন ভাবী বধূর স্বপ্ন দেখছেন। উৎসব আগেভাগেই সারছেন।

ঘটনাটা খুলে বলি। থাংবি লাম্থাবা ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের রাজা হলেন। কিন্তু মনে তাঁর একদিনের জন্যেও শান্তি নেই। কা'র কাছে শুনেছেন, পরমাসুন্দরী এক কন্যার কথা। পাশেই মোইরাঙ্ রাজ্য; ওখানকার রাজা ছিংখু তেলহেইবার কন্যা তোম্পোক্পির কথা।

তোম্পোক্পি! তোম্পোক্পি!—শয়নে-স্বপনে এই একটিই নাম ধ্যান করেন তিনি। রূপসীকে রাজরাণী করে ঘরে আনবেন, স্থির করেন।...এমন সময় হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত। মোইরাঙ্-এর রাজা তেলহেইবার আপত্তি; না, থাংবি লাম্থাবার সঙ্গে কিছুতেই তিনি রাজকন্যের বিয়ে দেবেন না।

—দেবেন না?—ক্ষুধার্ত সিংহের মতো গর্জে উঠলেন থাংবি লাম্থাবা। সৈন্যদল নিয়ে দিন কয়েকের মধ্যেই লোকতাক-এর দিকে এগোলেন।

উদ্দেশ্য সাধু। লোকতাক পেরিয়ে মোইরাঙ্ যাবেন তিনি। তোম্পোক্পিকে বাহুবলে জয় করবেন।

এদিকে মোইরাঙ্-সম্রাট তেলহেইবার কানে এ-সংবাদ যেতেই জ্বলে উঠলেন তিনি। সৈন্যদল নিয়ে তিনিও এগোলেন লোকতাক-এর দিকে।

তুমুল যুদ্ধ হল। দু' পক্ষেই হাজার হাজার নৌকারোহী সৈন্য। দু' পক্ষই মরীয়া।

লোকতাক হ্রদ দেখতে দেখতে লাল হল আবার। আর হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে থাংবি লাম্থাবার মনে হল, তোম্পোক্পি! রাজরানী হলে তুমি। রাজসভা আলো করে বসলে।

যুদ্ধে থাংবি লাম্থাবারই জয় হল শেষ অবধি। তোম্পোক্পি রাজরানী হল।

কিন্তু হলেই বা কী!...কা'র কী এসে গেল ওতে? প্রজাদের কী উপকারটা হল?

অবিশ্যি প্রজারাও নাকি ছাড়ে নি। আড়ালে-আবডালে বলাবলি করত,—রাজা আমাদের অনেক যৌতুক পেয়েছে রে! হাজার মানুষের তাজা লাল রক্তে হাত ধুয়েছে!···লোকতাক সেই থেকেই তো লাল রে! সব যৌতুক জমা রেখেই তো!

কিন্তু কোথায় লাল?···লোকতাক হ্রদের স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের দিকে তাকাই। সেদিনের সেই রক্তের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাই না।—

হ্রদ টলটল করে। একেবারে তীর ঘেঁষে ধবধবে সাদা কিছু পদ্ম আলো ছড়ায়। খানিকটা দূরে বাংলোগোছের এক বাড়িকে নিঝুমপুরী ধরে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে-দাঁড়ানো পথিকের মতো ঠেকে।

নীলকান্তকে শুধোই,—কী ওটা?

—রেস্ট্ হাউস্, যাবেন?

—যেতে পারি।

—আপনারা?—অন্যান্য সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে নীলকান্ত শুধোন,—আপত্তি নেই তো?

—আপত্তি!—সকলের হয়ে জবাব দেন গোপালবাবু,—কিসের আপত্তি? যাবো বলেই তো আসা! ঘুরেফিরে দেখবো বলেই।

—বেশ! চলুন তবে,—বলেই ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন নীলকান্ত,—রেস্ট্ হাউস।

ড্রাইভার তৈরী। নির্দেশ-মাত্রই গাড়ির বেগ কমিয়ে দিল। বাঁ দিকে বেঁকে একটা শাখাপথ ধরল।

পথটা ধরে অল্প একটু যেতেই রেস্ট্ হাউস্।

—বাঃ! কী সুন্দর জায়গা!—রেস্ট্ হাউস্-এ পা দিয়ে গোপালবাবু উচ্ছ্বসিত—কী শান্ত, স্নিগ্ধ! ইচ্ছে হয়, ধ্যানে বসি।

অঞ্জলি বললে,—বসে লাভ? যাঁতে বসবেন, তিনি নিজেই যে ধ্যানস্থ।

ধ্যানস্থ!—অঞ্জলির কথা শুনে চমকে উঠি। বাড়িটির দিকে

ভালো করে তাকাই। মনে হয়, হ্যাঁ, ঠিক
এসেই যেন ধ্যানীকে অসুবিধায় ফেললাম। যেন
থমকে-দাঁড়ানো পথিক ভেবে অনর্থ সৃষ্টি করলাম।

আসলে রেস্ট্-হাউস্-এর পরিবেশ তপস্বীরই মতো। আশে-পাশে জনপ্রাণী নেই, সাড়াশব্দ নেই। গোটা বাড়িটা তালা ঝুলছে ঘরে ঘরে। সামনেই লোকতাক হ্রদে ঢেউ খুদে খুদে ঢেউ, চুপিসারে। সকলের অজ্ঞাতে যেন।

খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর চৌকিদার বেরিয়ে এল।—

আমাদের দেখে খুব খুশি। পরিষ্কার হিন্দীতে বললে,—রহেগা বাবুজী?

বললাম,—না। একটু বাদেই বেরোব।

চৌকিদার ভীষণ ক্ষুণ্ণ।

হুজুর!—দস্তুরমত ধরা গলায় সে বললে,—পুরা দু' হপ্তা ইধার কোঈ নেহী আয়া হুজুর। ময় একেলা হুঁ।

শুধালাম,—দু' সপ্তাহ কেউ এখানে আসে নি? তুমি একা আছ?

চৌকিদার সায় দিল,—জী মালিক। আপ আয়া দু' হপ্তা বাদ। আপ ভি রহেগা নহী?

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল। এখানে লোকজন কেউ বড় একটা আসে না। চৌকিদার একা একাই থাকে আমাদের দেখে আশা হয়েছিল বেচারীর, হয়তো বা দু' একদিন থাকবো। কিন্তু না, দেখা যাচ্ছে সে গুড়েও বালি

কষ্ট হল চৌকিদারটির জন্যে। নিজের চোখেই দেখলাম, মানুষের সঙ্গের জন্যে কী ভীষণ আকুল সে। একা একা থেকে তার অবস্থাটা কেমন মর্মান্তিক।

সেদিন যত্নের কোনো ত্রুটি করে নি সে। ঝড়ের বেগে ঘরদোর খুলল। মুহূর্তের মধ্যে চেয়ার-টেবিল ঝেড়ে-মুছে বসতে দিল জল চাইতেই চিনি আর লেবু দিয়ে সরবৎ করে দিল।

দেখি ট্রে হাতে নিয়ে সে হাজির। চার চারটে প্রত্যেকটিতে রুটি আর তরকারি।

আশ্চর্য! এর মধ্যে এত কিছু করলে কী করে?

বললে,—করে নি। ওর নিজের খাবারটাই দিয়ে দিল।

কেমন? তাই নাকি?—চৌকিদারকে শুধিয়েছিলাম।

ও জবাব দেয় নি।

বিদায় নেবার সময়ও ঠিক একই সমস্যা। চৌকিদার নিরুত্তর। অথচ গোপালবাবু প্রশ্ন করেছিলেন বারবার,—বাঃ রে! এই যে এত কিছু খাওয়ালে, এজন্যে দাম নেবে না?

না, কিছুতেই দাম নিতে চায় নি চৌকিদার। অনেক কষ্টে গোপালবাবু ওর হাতে সামান্য কিছু গুঁজে দিতে শুধু বলেছিল,—ফির ইধার আনা। দু' চার রোজ ঠারনা। ইয়াদ রাখো বাবুজী!

—ইয়াদ!—রেস্ট্ হাউস্ থেকে ফেরবার সময় ভাবি,—হ্যাঁ হ্যাঁ, রাখবো বৈকি! এমন নিঃস্বার্থ অভ্যর্থনা জীবনে খুব বেশি তো পাই নি। আর তাছাড়া, সামান্য খাবারকেও এমন অসামান্য ভাবি নি কখনও। ইম্ফল থেকে খেয়ে বেরিয়েছিলাম সেই সাতসকালে। তারপর থেকে পেটে দানাপানি তো আর পড়ে নি। অথচ বেলা এগারোটা এখন। এরপর আছে মোইরাঙ্ কলেজে মিটিং।

ছাত্ররা অপেক্ষা করবে। মণিপুরের শিক্ষা অধিকর্তা আগে থাকতেই সব ঠিক করে রেখেছেন।

দ্রুত এগোই এবার। লোকতাক-এর গা ঘেঁষে বলাকার বেগে

খানিকদূর ছুটতেই মোইরাঙ্। ঠিক শহর নয়, আবার গ্রামও নয়; দু'য়ের মাঝামাঝি।

শোনা যায়, মণিপুরের ইতিহাসেও মোইরাঙ্-এর ভূমিকা নাকি একই রকম। অর্থাৎ মাঝামাঝি। দীর্ঘদিন মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত সে ছিল না; আবার সংস্কৃতির দিক দিয়ে যে বিচ্ছিন্ন ছিল তাও নয়।

মোইরাঙ্-এর উপর মণিপুর-সম্রাটের আধিপত্য প্রথম বিস্তৃত হল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ; গোবিন্দ-ভক্ত জয় সিং-এর আমলে।

ইতিহাসে পাই, জয়সিং অসাধ্য-সাধন করলেন। খণ্ড-ছিন্ন মণিপুরকে একসূত্রে গাঁথলেন। মোইরাঙ্ সেই সূত্র থেকে বাদ পড়ে নি।

সেই মোইরাঙ্ :—না-শহর, না-গ্রাম। আদপে কায়দায় তখন যা ছিল, এখনও প্রায় তাই আছে। খুব নাকি বদলায় নি।

অবশ্য বদলালেই বা কী। কে আর সাক্ষী দেবে! ইতিহাস ?— সামনে এই যে অপ্রশস্ত রাজপথ, ঘিঞ্জি ঘরবাড়ি, পথে পথে ভীড়-করা এই যে দরিদ্র মানুষের মিছিল—ইতিহাস কি তাদের খবর রাখে ?

সেদিন মোইরাঙ্ ধরে এগোবার সময় আকাশপাতাল ভাবি। ঘিঞ্জ এলাকা পেরিয়ে জনবিরল পথ ধরি হঠাৎ খোলামেলা পথ। বাঁ পাশে নীচু জমি। ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেল। খানিকটা দূরে লোকতাক হ্রদে গিয়ে মিশল।

ওই হ্রদের দিকে মুখ করেই মোইরাঙ্ কলেজ। ঠিক গড়ে ওঠে নি এখনও। বাইরের দেয়ালে এখনও প্লাস্টার লাগে নি।

গাড়ি গিয়ে কলেজের সামনে দাঁড়াতেই মাঝ-বয়সী এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। পরনে আধ-ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবী। হাতে লাঠি।

ভাবলাম, কৃষক হযতো। ধারে-কাছেই থাকেন। আগন্তুক সম্বন্ধে কৌতূহলী ; দেখতে এসছেন।

কিন্তু না ; নীলকান্ত পরিচয় করিয়ে দিতেই আমি স্তম্ভিত। ইনিই নাকি কলেজের অধ্যক্ষ ইবোতোম্বি সিং! নমস্কার করলাম। আমরা সকলেই।

ইবোতোম্বির নমস্কার আর শেষ হয় না। দু'হাত দিয়ে ধরে লাঠির হাতলটা কপালে ঠেকিয়েছেন। মূর্তিমান একটি জিজ্ঞাসা রচনা করে দাঁড়িয়ে আছেন সেই থেকে।

অভ্যর্থনায় কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। পরম সমাদরে আমাদের পথ দেখালেন। যত্ন করে কলেজের ভেতরে নিয়ে গেলেন।

ভেতরে গিয়ে দেখি, জবুথবু টেবিল একটা, ছোটখাটো চায়ের দোকানে যেমন থাকে।

টেবিলটিকে ঘিরে দীর্ণ-জীর্ণ কয়েকটা কাঠের চেয়ার।

ইবোতোম্বি সিং পরিষ্কার ইংরেজীতে বললেন,—কই! বসুন। দাঁড়িয়ে কেন?

সাবধানে বসলাম। পাছে না চেয়ার ভাঙে।

ইবোতোম্বির ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের পরিবেশ সম্পর্কে গর্বিতই বরং। একবার বললেন,—কেমন দেখছেন? আমার ঘর।

ঘর? মানে অধ্যক্ষের ঘর?—ভালো করে তাকাই এবার। কিন্তু কোথায় ঘর? করিডোর মতো একটা জায়গা; তার একদিকে কাজ-চলাগোছের কাঠের পার্টিশান; এক মানুষ প্রমাণ উঁচু। অন্য দিকে টেবিল আর একটা; ম্যাপ এবং গ্লোব থেকে শুরু করে চক-ডাস্টার-এ পর্যন্ত সুশোভিত।

টেবিলের পাশ থেকে জনকয়েক ছাত্রছাত্রী উঁকিঝুঁকি মারল। বোধ করি, দেখে গেল আমাদের।

ইবোতোম্বি সিং বললেন,—এসেছেন, বড় খুশি হলুম। কিন্তু মুশকিল কী জানেন, অধ্যক্ষের কায়দাকানুন আমি আবার ঠিক জানি না; আসলে মানুষটা আমি চাষী।

ভাবলাম,—তা আর বলতে। প্রথম-দর্শনেই মালুম হয়েছে।

বললাম,—বেশ তো! ভালই। চাষবাস নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের ক'জন আর ভাবেন!

—ঠিক! ঠিক বলেছেন,—ইবোতোম্বি যেন লুফে নিলেন আমার কথা,—ক'জন আর ভাবেন!···কিন্তু আমি ভাবি মশাই! বলতে কী, চাষবাস নিয়েই থাকি।

—সময় পান অত?—গোপালবাবু ছন্দপতন ঘটালেন।

ওদিকে ইবোতোম্বিও উত্তেজিত একটু,—সময় না পেলে চাকরী ছেড়ে দেব! ভারী তো প্রিন্সিপ্যাল-এর কাজ। পরোয়া করি নাকি?

গোপালবাবু জবাব দিলেন,—করেন না, বেশ করেন। কী হবে পরোয়া করে?

ইবোতোম্বি সিং কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাধা পড়ে পাশেই মাঠে একটা গোরু দেখতে পেয়ে লাঠি হাতে ছোটেন।

কাণ্ড দেখে আমরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাই। গোপালবাবুকে শুধোই,—ব্যাপার কী?

—কিছু না,—উনি জবাব দেন,—সামনেই ক্ষেত। গোরু ঢুকে ফসল নষ্ট করছিল। ভদ্রলোক তাড়াতে গেলেন।

অঞ্জলি বললে,—তবু ভালো যে জায়গাটা মোইরাং। আলোক-প্রাপ্ত জায়গা হলে অধ্যক্ষের এই কীর্তিতে ছাত্ররা অন্ধকার দেখত।

সুধীরবাবু বললেন,—হ। কইছেন। আমাগো আগরতলা অইলেও (হলেও) ছাত্ররা ছাইড়া (ছেড়ে) কথা কইত না।

—আর কলকাতা হলে?—প্রশ্নটা আমাকে তাক করে গোপালবাবু ছোঁড়েন।

বললাম,—অধ্যক্ষকে কৃষির উন্নতি ভাবতে হত না। তার আগেই ছাত্ররা অন্য কিছু ভেবে তাঁর বিদায়-অভিনন্দনের ব্যবস্থা করত। তবে সৌভাগ্য এই যে, কলকাতায় এ-ধরনের ফাঁকা জায়গা নেই। একই সঙ্গে অধ্যক্ষ এবং কৃষক হওয়ার মতো সুযোগের অভাব।

—যা বলেছ!—গোপালবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমরাও ওঁর সঙ্গে যোগ দিলাম। এদিকে ইবোতোম্বি সিং এসে গেছেন। গোরু তাড়িয়ে ক্লান্ত। হাঁপাচ্ছেন। তবু এরই মধ্যে এক ফাঁকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন,—কিছু মনে করবেন না। আপনাদের বসিয়ে রেখে··

গোপালবাবু মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—না না। তাতে কী!

—কিছু হয়তো নয়,—বললেন ইবোতোম্বি,—আপনাদের কাছে নয়। কিন্তু অনেকেই চাষবাসকে আবার ভালো চোখে দেখে না। এই যে ষাট একর জমি আছে কলেজের, চাষ না করলে জমিটা পড়ে থাকবে, তা নিয়ে ভাবে না।

বলতে যাচ্ছিলাম,—ভাবা উচিত। নিশ্চয়ই উচিত।···কিন্তু তার আগেই বাধা পড়ে। জনা দুই তিন অধ্যাপক এসে জানান,—মিটিং-এর সব প্রস্তুত। আমরা গেলেই শুরু হয়।

গেলাম। নীলকান্ত যথারীতি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতেই মিটিংও শুরু হল।

অধ্যক্ষের অনুরোধে প্রথম বলতে উঠলেন গোপালবাবু। আমি অন্যমনস্ক তখন। মিটিং-এর পরিবেশ দেখছি। স্পষ্ট চোখে পড়ছে আমার, মাঝারিগোছের একটি হল। শ'তিনেক ছেলেমেয়ে বসে। ছেলেরা একদিকে, মেয়েরা অন্যদিকে। সবাই শান্ত স্তব্ধ। একমনে বক্তৃতা শুনছে।

শুধুমাত্র অধ্যক্ষই উসখুস করছেন একটু। মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাচ্ছেন।

খানিক বাদে বছর ষোল-সতেরোর একটি মেয়ে এল। অধ্যক্ষের কানে ফিস ফিস করে কী বললো। ভাবছি, ছাত্রীটাত্রী হবে হয়তো, জরুরী কিছু বলছে,—এমন সময় দেখি, অধ্যক্ষও কানে কানে কী নির্দেশ দিচ্ছেন ওকে। ডান হাতটা চেপে ধরে কী যেন বোঝাচ্ছেন।

সন্দেহ হল,—তবে কি বাড়ির কেউ? ইবোতোম্বির মেয়ে?

শেষ পর্যন্ত ইবোতোম্বি নিজেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন। মেয়েটি চলে যেতেই আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন,—কী? বুঝলেন কিছু?

বললাম,—না।

ইবোতোম্বি বুঝিয়ে দিলেন,—এক বন্ধুর মেয়ে। তাঁতে শাড়ী

বুনছিল। বাড়িতেই। বুনতে বুনতে ভুল করল হঠাৎ। ছুটে এল।

বললাম,—অ! তাই বুঝি!

—হ্যাঁ মশাই, তাই। প্রায়ই আসে। জ্বালাতন করে; কী করবো!—বলেই উসখুস করতে লাগলেন আবার। ডান পাশের দরজাটা বরাবর মাঠের দিকে তাকালেন।

খুব কাছেই পিওন দাঁড়িয়েছিল একজন। দেয়ালে ঠেস দিয়ে, স্ট্যাচুর মতো। ইবোতোম্বি হঠাৎ ডাকলেন ওকে; বিড়বিড় করে কী যেন নির্দেশ দিলেন।

পিওনটি হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল।

শুধালাম,—কী ব্যাপার?

—আর বলেন কেন!—জবাব দিলেন ইবোতোম্বি,—গোরু ঢুকে ফসল নষ্ট করছে। সেই উৎপাত শুরু হয়েছে আবার!

কিন্তু উৎপাত কি আমরাই কম করছি? গুজগুজ, ফিসফিস করে গোপালবাবুর কম অসুবিধে করছি? তা না হলে বলতে বলতে হঠাৎ উনি থামবেন কেন? কেনই বা মুহূর্তের জন্যে পেছন ফিরে নীরবে আমাদের ভৎসনা করবেন?

গোপালবাবু বলছিলেন, এই মোইরাঙ্ হল মণিপুরের মধ্যমণি। শিল্পে, সাহিত্যে, নৃত্যকলায়—সব দিক দিয়েই। এমন জায়গায় কলেজ-স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। কারণ, আগুন ছাড়া যেমন সমাজ, শিক্ষা ছাড়া তেমনি সংস্কৃতি অচল।........

গোপালবাবু আরও অনেক কিছু বলেছিলেন সেদিন। আমাকেও বলতে হয়েছিল। কিন্তু সে-সব থাক। মোইরাঙ্ কলেজ, কলেজের অধ্যাপক, অধ্যক্ষ এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক বরং।

ছাত্রদের উৎসাহই ছিল প্রচণ্ড। মিটিং শেষ হবার পরও ওদের প্রশ্নবাণ আর থামে না। বিশেষ করে আমি তো বাণে বাণে ঘায়েল হবার দাখিল।

—কলকাতায় এত ছাত্র-অসন্তোষ কেন? মনীষীদের ছবি কেন পোড়ান হচ্ছে? মূর্তি ভাঙা হচ্ছে কেন?—ইত্যাদি অজস্র প্রশ্ন।

ছাত্রীদের মধ্যে একজন সবচেয়ে সুন্দর প্রশ্ন করেছিল,—এত অসন্তোষ কলকাতায়, অথচ ছাত্ররা আমাদের তুলনায় এগিয়ে। এটা কেমন করে সম্ভব?

মিটিং শেষ হতে অধ্যাপকদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হল।

সবাই সদালাপী। সজ্জন। এমনভাবে মিশলেন আমাদের সঙ্গে যে মনে হল, কেউই আগন্তুক নই; দীর্ঘদিন একসঙ্গে একই কলেজে কাজ করছি।

অধ্যাপকদের বেশির ভাগই বাইরের, ভিন্ন প্রদেশের। বিহারের কেউ, কেউ উত্তরপ্রদেশের, আবার কেউ বা আসামের। বিহারী এক অধ্যাপকের কাছে কলেজটির ইতিহাস শুনলাম। চমকপ্রদ ইতিহাস।—কোনো একজনের দানে এ-কলেজ নয়। এ গড়ে উঠেছে জনসাধারণের চাঁদায়। মোইরাঙ্ অঞ্চলে যাঁরই ঘরবাড়ি বা জায়গা-জমি আছে, তিনিই কিছু-না-কিছু সাহায্য করেছেন।··· প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকার তহবিল গড়া হবে, স্থির হল। জনসাধারণের কাছে আবেদনও করা হল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এই শেষের কাজটির দরকার ছিল না। কারণ, চাঁদা দেবে বলে আগে থাকতেই তৈরী সব। কলেজ চাই, এ-বিষয়ে সবাই একমত।··· লোক যেচে এসে টাকা দিল। কাজ শুরু করার জন্যে কলেজ-কমিটিকে তাড়া দিয়ে অস্থির করল। এবং অবশেষে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম নিল এই মোইরাঙ্ কলেজ।···জন্মলগ্নে কলেজ অবশ্যি এখানে ছিল না। তখন ক্লাশ হ'ত মোইরাঙ্ মাল্টি-পারপাস্ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল-বাড়িতে। রাত্তিরে হ'ত।···তারপর মণিপুর সরকার জমি দিলেন। কলেজের এই নতুন বাড়ি গড়ে উঠল। রাত্তিরে নয় আর, দিনে শুরু হল ক্লাশ। ১৯৬৭ সাল থেকে কলেজ তার নিজের বাড়িতে এল।

সেদিন হয়তো বা আরও অনেক গল্প হ'ত অধ্যাপকদের সঙ্গে। গল্পে গল্পে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ত। কিন্তু তা যে হয়নি, সেজন্যে ইবোতোম্বি দায়ী।

হঠাৎ এসে তাড়া দিলেন তিনি,—কই! চলুন। খেতে হবে না?

মনে পড়ল, হ্যাঁ, আজ দুপুরে ইবোতোম্বির বাড়িতেই অতিথি হবার কথা। মণিপুরের শিক্ষা-অধিকর্তা মশাই সে-রকমই ব্যবস্থা করেছেন। আগেভাগে খবরও দিয়ে রেখেছেন অধ্যক্ষকে। অতএব, দেরী নয় আর; শুভস্য শীঘ্রম।

তাড়াতাড়ি অধ্যক্ষের সঙ্গ নিলাম। ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সদলবলে জীপে উঠলাম। বেশি দূরে নয় ইবোতোম্বির বাড়ি। কলেজ থেকে এমনকি এক ফার্লংও নয়। জীপে উঠতে না উঠতেই পৌঁছে গেলাম।

ইবোতোম্বি সকলের আগে গাড়ি থেকে নামলেন। দু'হাত দিয়ে ধরা লাঠির ডগাটি কপালে ঠেকিয়ে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। আবার আর একটি দোদুল্যমান জিজ্ঞাসা গড়লেন যেন।

আমরা একে একে নামলাম। অনুসরণ করলাম ওঁকে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই চোখ একেবারে ছানাবড়া।—

এ কি অধ্যক্ষের বাড়ি? না চাষীর?

ঢুকতেই ডানদিকে একটি দোচালা ঘর। ওখানে তিন তিনটি তাঁত চলছে। সামনেকার উঠোনটায় পা ফেলবার জায়গা নেই। শুধু ধান আর ধান।

উঠোনের একপাশে খড়ের গাদা। ঐ গাদাকে ছুঁয়ে আবার গোয়াল-ঘর। গোটা দুই তিন গোরু জাবর কাটছে।

এদিকে বাড়ি ঢুকেই হাক দিলেন ইবোতোম্বি,—কেইদোওরা (ব্যাপার কী)?

সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছেলে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল,—চুকনা (ভেতরে আসুন)।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আসব বৈকি!—মনে মনে বললাম,—এমন ভরো ভরো আয়োজন! মন-কেমন-করা এমন সুন্দর পরিবেশ! না এসে পারি!

ভেতরে ঢুকে দেখি, সাবেকী ছাঁচের একতলা বাড়ি। বাইরের ঘরে বসবার ব্যবস্থা। কিন্তু ঘর সেটি? না কি গুদাম? মাঝখানে টেবিলের তলায় মণ-খানিক আলু গড়াগড়ি দিচ্ছে। এক কোণে পেল্লাই আকারের একটি লাউ ভীমের গদার মতো শোভা পাচ্ছে; এবং এছাড়া, পাশেই গোটা চার-পাঁচ টিন, একটা খন্তা আর দু'টো শাবল দেখে মনে হচ্ছে, হাতি-খেদা শুরু হবে; লোকজন এলো বলে।

হ্যাঁ, এলো অচিরেই। তবে হাতি-খেদার নয়, ইবোতোম্বির কয়েকজন ভলান্টিয়ার। রাশি রাশি খাবারদাবার নিয়ে ওরা এলো। টেবিলের উপর থরে থরে সাজিয়ে রাখল।

ইবোতোম্বিকে বললাম,—এতো?

কোনো জবাব পেলাম না। ভদ্রলোক ভলান্টিয়ারদের নির্দেশ দিতে ব্যস্ত। অন্য সব জিনিসগুলো কেন আসছে না, তাই নিয়ে চিন্তিত।

এদিকে জিনিস এলে দেখা গেল, টেবিল ওতেই ভর্তি। খাবার আর জায়গা নেই।

অগত্যা ভাগ ভাগ করে বসলাম। দু'ঘরে দু'দল।

কিন্তু খেয়ে কি শেষ করতে পারি?—ভাজা, ডাল, তরকারি তিন-চার রকম, তিন রকম মাছ, পায়েস, দই, মিষ্টি, পিঠে—পারি শেষ করতে?

ইবোতোম্বি তো লজ্জায় সংকোচে একেবারে এতটুকু। খেয়ে উঠতেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন,—আহা! আপনাদের কষ্ট হল! কিছুই ব্যবস্থা করতে পারি নি।

গোপালবাবু বললেন,—যা করেছেন, বাড়ি ডেকে এনে মারবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ইবোতোম্বি হেসে উঠলেন হো হো করে—

—অন্যায়! এ অভিযোগ কিন্তু অন্যায়!—বলেই বিরাট আকারের কয়েকটি পান এগিয়ে দিলেন। খেয়ে দেখি, শুধু আকারে নয়, প্রকারেও এরা অসাধারণ। এ-জিনিস তারিয়ে ভোগ করতে হয়। কিন্তু সময় কই?…লম্বা 'প্রোগ্রাম' আজ; একদিনে গোটা পাঁচ-সাত হাট করার মতো। একটিকে দেখতে না দেখতেই অন্যটির চিন্তা। তাড়াহুড়োতে সওদা-পত্তর ফেলে রেখেই উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা।

থাংজিং মন্দিরের দিকে ছুটলাম এবার।

বিদায়ের সময় ইবোতোম্বি দুঃখ করলেন,—তাড়াহুড়োতে মিসেস্-এর সঙ্গে আলাপ হল না। যদি দয়া করে চাষীর বাড়িতে আর একবার আসেন তো খুশি হই।

বলতে যাচ্ছিলাম,—খুশি আমরাও হই;—

কিন্তু বলা আর হল না। তার আগেই ইবোতোম্বি ছুটলেন।

—কিছু মনে করবেন না। কপির ক্ষেতে ছাগল। তাড়াতে চললাম,—বলেই সামনের এক বাগিচার দিকে এগোলেন তিনি।

অবাক বিস্ময়ে চাষী-অধ্যক্ষটিকে দেখছিলাম, হঠাৎ নীলকান্ত তাড়া দিলেন,—নিন, চলুন এবার।

চলেই তো আছি! থামছি আর কতক্ষণ!—থাংজিং মন্দির যেতে যেতে ভাবি। অধ্যক্ষ ইবোতোম্বি সিংকে ভুলতে পারি না কিছুতেই।

এদিকে পথ ফাঁকা। মাঠে হাওয়া ছুটছে হুহু করে। ভুলিয়ে দেবার গান গাইছে।

বেশি দূরে নয় থাংজিং মন্দির। ইবোতোম্বির বাড়ি থেকে মাইল দু'য়েকও নয়।

মন্দিরে যখন পৌঁছুলাম, তখন গুরুভোজনের দরুন আইঢাই করছে শরীর। এমনকি একটু আগে খাওয়া বাদশাহী পানের আমেজেও ভার ভার ভাবটা ঠিক কাটছে না।

ধীরেসুস্থে এগোলাম। থাংজিং মন্দিরকে দেখে মনে হল, এখানকার শান্ত স্তব্ধ পরিবেশে তাড়াহুড়ো করাটাই যেন বেয়াদপি।

যেন গভীর ঘুমে অচৈতন্য সব। জোরে চললে জেগে উঠবে। চেঁচিয়ে কথা কইলে অসুবিধে হবে।

থাংজিং তো আর নতুন-জানা কোনো দেবতা নন। আদ্যিকালের মোইরাঙ্‌ও তাঁকে জানতো। যুগে যুগে কত কাহিনী, কত কিংবদন্তী তাঁকে নিয়ে।

পুরাণে পাই, বরাহরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হলেন তিনি। মোইরাঙ্‌ সৃষ্টি করলেন। দেখতে দেখতে কত লক্ষ বছর পেরিয়ে গেল! কলিযুগ এলো। ইওয়াং ফাং পালেন হানবা রাজা হলেন মোইরাঙ্‌-এর।

তাঁর আমলে রাজ্যের বাড়-বাড়ন্ত। আয়তনে বাড়ল মোইরাঙ্‌। সুখে-শান্তিতে ভরো-ভরো হল।...প্রজারা আনন্দে দিন কাটায়, রাজার জয়গান করে; কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে ভগবান থাংজিংকে আর স্মরণ করে না।...থাংজিং দেখলেন, বিপদ। মানুষ তো বড় অকৃতজ্ঞ। সুখে থেকে ভগবানকে ভুলে গেছে। অতএব, ওদের একটু শিক্ষা দেয়া দরকার।...তাই তিনি সপ্ত দেবতাকে পৃথিবীতে পাঠালেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ওঁরা মানুষকে যন্ত্রণা দেবেন, দুঃখ দেবেন। তখন অকৃতজ্ঞ মানুষ নিরুপায় হয়ে স্মরণ করবে তাকে।...

এদিকে দেবতারা তো পৃথিবীতে এসে তাণ্ডব শুরু করলেন। মোইরাঙে হাহাকার দেখা দিল। রাত্তিরে ঘুম হয় না মানুষের, দিনে কাজ হয় না। সারাক্ষণ সবাই যেন বিভীষিকা দেখে, সন্ধ্যা নামবার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে কুঁকড়ে ওঠে। মনে হয়, রাতের আঁধারে কা'রা যেন ঘুরে বেড়ায়। তাদের দেখা যায় না ঠিক, অনুভব করা

চেয়েচিন্তে উৎকৃষ্ট

যায়। তারা ঘরবাড়ি ভাঙে, গাছপালা উপড়ে ে. থেকে ফিরলে তোলপাড় করে। প্রথমে সবাই ভাবল, নিশ্চয় কিন্তু ভাগ্য অপদেবতার কীর্তি : ছু'চার দিন বাদেই সব আবার ঠাণ্ডা হ. ন্দলেন, যখন দেখা গেল, উপদ্রব দিন দিন বেড়েই চলেছে, কমছে না ত নে তখন মাথায় হাত দিল সবাই। এদিকে হঠাৎ একদিন জানা গে৹ এসব কিছুর পেছনে ভগবান থাংজিং, অপদেবতা নয়। ভগবান মোইরাঙ্-এর প্রতি বিরূপ। রাজ্যের তাই এ ছুরবস্থা।...রাজা ইওয়াং ফা: এ-খবর শুনে কপালে করাঘাত করলেন। ভয়ে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। অনুচরদের পাঠালেন পুণ্যবতী গাং থং মারিমাইলা ছুহেংলাংমেই থউবার কাছে এই গা' থং ছিলেন মাইবি অর্থাৎ, স্ত্রী পুরোহিত অলৌকিক শক্তির জন্যে সারা রাজ্যে তাঁর খ্যাতি ছিল। স্বয়ং রাজাও তাঁকে সমীহ করতেন। মাইবি আসতেই রাজা ইওয়া ফা তাঁকে বিপদের কথা বললেন। রাজপ্রাসাদ ধুলিসাং হয়েছে, এ সংবাদও দিলেন। মাইবি প্রশ্ন করলেন,—মহারাজ কি চান এখন?...মহারাজ জবাব দিলেন, শান্তি। ভাঙা রাজপ্রাসাদ আবার গড়ে উঠুক, দেখতে চাই। মাইবি বললেন, কাজটা কঠিন। তবু দেখা যাক চেষ্টা করে। রাজা বললেন,—চেষ্টা নয় মা ; এ-কাজ আপনাকে করতেই হবে।... মাইবি এবার আর জবাব দিলেন না কিছু। সপ্ত দেবতাকে খুশি করবেন বলে ধীরে ধীরে বনের পথ ধরলেন।...পথ দুর্গম, বন ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই মাইবির। চলেছেন তো চলেইছেন।...শেষকালে গভীর বনে ঢুকে তপস্যায় বসলেন তিনি। সাধনায় নিমগ্ন হলেন।... সপ্ত দেবতা খুব খুশি এতে। মাইবির সাধনায় দারুণ পরিতুষ্ট। দেবতারা তখন তাঁকে অনুগ্রহ করলেন। মন্ত্রবলে মন্দির নির্মাণের কৌশল শিখিয়ে দিলেন।...এবার মাইবিকে আর পায় কে! দেবতার আশীর্বাদে অপরূপ এক প্রাসাদ গড়লেন তিনি। রাজার মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন। এদিকে রাজা এই খবর শুনে তো

.ন থাংজিং-এর মহিমায় চমৎকৃত একেবারে। সঙ্গে
.র সমস্ত মাইবা (পুরুষ পুরোহিত) ও মাইবিদের ডেকে
. তিনি। নির্দেশ দিলেন, সবাই যেন ভগবান থাংজিং-এর
.রে যান।...রাজার আদেশ,—শিরোধার্য। সবাই ছুটলেন, মন্দিরের দিকে। পরমপুরুষ থাংজিং-এর করুণাভিলাষী হলেন। সেখানে দৈববাণী হল, বর্ণাশ্রম চাল্ কর। মানুষের শ্রেণীবিভাগ করে নতুন সমাজ গড়ো। প্রত্যেক শ্রেণীতেই প্রধান থাকবেন একজন। ভগবানের মহিমার কথা জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর এছাড়া, থাংজিং-এর মন্দিরে আরতি হবে প্রতিদিন। মাইবারা ভগবানের স্তুতিগান করবেন, আর মাইবিরা বাজাবেন ঘণ্টা।

শোনা যায়, এই রেওয়াজ আজও চলে আসছে মণিপুরে। পুরুষ পুরোহিত যখন সন্ধ্যারতি দেন মেয়েরা তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁসর-ঘণ্টা বাজান।

থাংজিং-এর মন্দিরেও নাকি বাজান ওঁরা। ধুমধাম সহকারে সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা করেন। জানি না, দেখি নি সেই আরতি। থাংজিং মন্দিরে যখন পৌঁছুলাম, মন্দির-প্রাঙ্গণ তখন যেন ইওয়াং ফাং-এর অশান্তির যুগে ফিরে গিয়ে খাঁ খাঁ করছে। ভক্ত নেই, জনসমাগম নেই, স্তব্ধ নিঝুম চারিদিক।

নীলকান্ত একবার বললেন,—ভর-দুপুর এখন। বেলা দু'টো। এ-সময়ে প্রভু থাংজিং বিশ্রাম করেন। ভক্তরাও কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না।

ভাবলাম—তা হবে। মূল মন্দিরের দরজা বন্ধ। আমরা ছাড়া আর কেউ নেই আশে-পাশে। বিরাট মন্দির-প্রাঙ্গণ মূক মৌন।

মন্দিরের ঠিক সামনেই কয়েকটা বাঁশ পোঁতা। সাতটি করে কাপড়ের টুকরো ওদের গায়ে।

—সাত কেন ?—নীলকান্তকে শুধাতে জবাব দিয়েছিলেন,—সপ্ত দেবতার উদ্দেশ্যে হয়তো।

—সপ্ত দেবতা? মন্দির-এ..
মানে সেই সপ্ত দেবতা? ইওয়াং ..
দেখেছিলেন?

কে জানে, হবেন হয়তো।...নিঃশব্দে এগি..
বিশাল প্রাঙ্গণটিকে দেখি।

প্রাঙ্গণের চারিদিকে দর্শকদের বসবার জায়গা। হাজার হা
ভক্তের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা।

নীলকান্তর কাছ থেকে শুনলাম,—ভক্তরা যখন আসে, তখন হাজারে হাজারেই আসে। প্রতি বছর মে মাসে বিরাট উৎসব হয় এখানে। ভগবান থাংজিং-এর সম্মানে 'লাই হারৌবা' নাচ হয়। ছেলে নাচে, মেয়ে নাচে; মহিলা, যুবক—সবাই নাচে। অতি সুন্দর পোশাক পরে ওরা! নাচে, গান করে! ভগবান থাংজিংকে একসঙ্গে শত শত ভক্ত শ্রদ্ধা জানায়! ঐ দর্শক-আসনগুলোতে তিল ধারণের জায়গা থাকে না তখন।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ মন্দিরের মুখোমুখি বিশেষভাবে বাধানো একটা জায়গা চোখে পড়ে।

নীলকান্তকে শুধালাম,—এটা?

এ-ও দর্শক-আসন, আগে রাজা বসতেন এখানে। এখন বসেন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ গভর্ণর। 'লাই হারৌবা' নাচ দেখেন।

ভাবি, নাচ—শুধুই নাচ এখানে। এই থাংজিংকে ঘিরে মণিপুরে ভুবনবিখ্যাত নাচ 'খাম্বা থোইবী'রও অভ্যুদয়।

খাম্বা আর থোইবী রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন নাকি। এই মোইরাঙ্‌-এই ছিলেন!...খাম্বা ছিলেন 'বাপ কা বেটা' এমনকি বাপ পুরেনবার চেয়েও শক্তিশালী ও সাহসী।...আর থোই..
রাজকুমারী; পৃথিবীর সব কুমারীর রূপ আর গুণের
ওদের দু'জনে দেখা হল একদিন। সা..
সাক্ষী রেখে শুভদৃষ্টি হল। অথচ ..

...ন সমাজের সম্পূর্ণ বিভিন্ন দু'টি

প্রতিবেশী রাজ্য খুমাল-এর রাজভ্রাতা
পৌত্র, পুরেনবার পুত্র। হোরামইয়েমা রাজার
...ম অতিষ্ঠ হয়ে খুমাল ত্যাগ করেন। মোইরাঙ্-এ এসে
বাস করতে থাকেন।

এই মোইরাঙ্-এই তাঁর বীরপুত্র পুরেনবার জন্ম হয়। দুর্জয় শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর সাহস বিস্ময় উৎপাদন করত সকলের।

একদিন। মোইরাঙ্-এর রাজা চিংখু তেল হেইবা শিকারে গেলেন। সঙ্গে পুরেনবা এবং আরও কয়েকজন।

গভীর জঙ্গল ধরে খুব সাবধানেই চলছিলেন চিংখু তেল হেইবা। এমন সময় মূর্তিমান সবনাশ: একেবারে সামনেই।

চিংখু দেখলেন, পাঁচ পাঁচটা বাঘ ঘিরে ধরেছে তাঁকে। গর্জন করতে করতে তারই দিকে এগোচ্ছে।

বিপদ বুঝে সঙ্গীরা সবাই কেটে পড়ল। থাকলেন শুধু পুরেনবা। তীক্ষ্ণ বর্শা তাঁর হাতে। বাঘদের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন বলে তিনি প্রস্তুত।

দেখতে দেখতে তুমুল লড়াই শুরু হল। ভীমকায় বাঘগুলো একসঙ্গে আক্রমণ করল পুরেনবাকে শত্রুদের হুঙ্কার শুনে তার মনে হল, ঘন ঘোর মেঘগর্জন চলছে, বনভূমি কাঁপছে থেকে থেকে।

কিন্তু তবু কিছুতেই দমবার পাত্র নন তিনি। বর্শা নিয়ে একা রুখে দাঁড়ালেন। আঘাতের পর আঘাত হেনে চললেন পাঁচ পাঁচটি ...বাদকে।

...খতে ওরা লুটিয়ে পড়ল। তাজা লাল রক্তে কর্দমাক্ত
...মি।

... দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন। এইবার

প্রমত্তা খরস্রোতার বুকে চাঁদ নামে যেন।

রূপসীর কোল আলো করে।

মেয়েটির নাম দিলেন থামন্নু।

আরও কিছুদিন পর। প্রমত্তার বুক বেয়ে সূর্য ওঠে। অতি সুন্দর এক ছেলে ঘর আলো করে পুরেনবার।

স্বামী-স্ত্রী অনেক ভেবেচিন্তে ছেলেটির নাম দেন থাম্বা।···দেখতে দেখতে থামন্নু এবং থাম্বা বেড়ে ওঠে। পুরেনবার ঘরে চন্দ্র-সূর্য তাদের সব ঐশ্বর্য আর মহিমা নিয়ে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় যেন।

কিন্তু এত সুখ ঘর ধরতে পারলে তো! এত আলো সইতে পারলে তো!

হঠাৎ একদিন জ্বলে-পুড়ে ছারখার হল সব। পুরেনবার মৃত্যু হল। আর তাঁর স্ত্রীও গেলেন সহমরণে। সতী হলেন।

এবার সংসার চালাবার ভার পড়ল দিদি থামন্নুর উপর।

একরত্তি মেয়ে। কায়ক্লেশে সে সংসার চালায়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান ভানে। সামান্য যা' পায়, তা' দিয়ে বাজারে যায় সওদা করতে।

ভাই থাম্বা বাড়িতেই থাকে। সারাক্ষণ দিদির পথ চেয়ে অপেক্ষা করে।

একদিন। দুপুর গড়ায়, বিকেল পেরোয়, সন্ধ্যে হয় হয়; দিদি আর আসে না।···থাম্বা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দিদির আশায় পথের দিকে তাকায় বার বার।

এদিকে দিদি থামন্নুর তখন থোইবীর সঙ্গে গল্প জমেছে; মোইরাঙ্-এর বাজারে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে দু'জনে।

এই থোইবী ছিল রাজকুমারী, মোইরাঙ্-এর রাজা চিংখু তেল হেইবার ভাইঝি. রাজার ছোটভাই চিংখু আখুবা; মোইরাঙ্-এর যুবরাজ। থোইবী ছিল তাঁর কন্যা। পরমা সুন্দরী। রূপে-গুণে স্বর্গলোক-বিহারিণী উর্বশীটি যেন।

রাজা চিংখু তেল হেইবার ছেলেমেয়ে ছিল না। থোইবীকে তিনি

নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন।

সারাক্ষণ।

সেই থোইবী। একদিন সুযোগ পেয়ে মোইরাং

গেল। সেখানে খামন্বর সঙ্গে ওর পরিচয়। প্রায় সমব

অতএব পরিচয় বন্ধুত্ব অবধি গড়াতে সময় লাগল না।

—তুমি থাক কোথায় গো?—থোইবী খামন্বকে শুধাল।

—থাকি?—ম্লান হেসে জবাব দিল খামন্ব,—ওই যে দেখছো লোকতাক হ্রদ, ওরই ওপারে। ছোট্ট এক কুঁড়ে ঘরে।

—আহা! কুঁড়ে ঘরে থাকে?

—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কী!

—কিছু নয়, কষ্ট আর কি। আচ্ছা, ঘরে কে কে আছে গো তোমার?

—ছোট ভাই খাম্বা আছে।

—আর?

—বাস! আর কেউ নেই।

—মা-বাবা?

—না, নেই।

—আপনজন?

—নেই।

—তোমাদের চলে কী করে?

—বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে।

—আহা! এই বয়সে এত কষ্ট! তোমায় দেখে আমারও যে কষ্ট হচ্ছে গো!—বলেই থোইবী মোইরাং-এর বাজার থেকে এক গাদা জিনিসপত্তর কিনে খামন্বকে উপহার দিল।

খামন্ব বলল,—এত?

থোইবী জবাব দিল,—হ্যাঁ হ্যাঁ, এত। কিছু তোমার; আর কিছু তোমার ভাই খাম্বার।

...কা করে করে অস্থির হয়ে ছিল খাম্বা। যখন
...রাশ জিনিসপত্তর নিয়ে ঘরে ফিরছে, তখন তার
...রইল না।

...ন্তু দিদি,—খাম্বা শুধাল,—এত জিনিস তুমি পেলে ...থায়?

—থোইবী দিয়েছে।—সংক্ষিপ্ত জবাব দিল খামনু।

—থোইবী? কে সে?

—রাজকুমারী।

—তুমি ওকে চিনতে?

—না না, মোটেও না। আজকেই আলাপ হল প্রথম। মোইরাং-এর বাজারে।

—প্রথম আলাপেই উপহার?

—হ্যাঁ রে। বন্ধুত্ব হল যে রে আমাদের। তোর আর আমার কষ্টের কথা শুনে রাজকুমারীর কত কষ্ট হল।

—শুনেই কষ্ট? দেখলে না জানি কী হত?

—কী আবার হত। কষ্ট আরও বাড়ত।

—তোমাদের রাজকুমারীটি তো খুব দয়ালু।

—শুধু কি দয়ালু, সুন্দরীও বটে। দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবি নে।

—সত্যি?

—সত্যি।

—তবে তো দেখতে হয় একদিন!

—দেখবি। সুযোগ আসুক আগে।

এদিকে দিন কয়েকের মধ্যেই সুযোগ এসে গেল।

খামনু গিয়েছিল বাজারে। সেখানে থোইবীর সঙ্গে দেখা।

—মাছ ধরবে আমার সঙ্গে? লোকতাকে যাবে?—হঠাৎ থোইবী প্রস্তাব করল।

খামনু প্রথমটায় জবাব দিল না। রাজকুমারীর পীড়াপীড়িতে আপত্তিও করল না।

মাছ-ধরার দিনক্ষণ তখুনি স্থির হল। থোইবী খামনুকে স্মরণ করিয়ে দিল,—দেখো। আসতে ভুলো না।

খামনু কথা দিল,—না, ভুলবে না।

এদিকে রাজকুমারী যাবেন মাছ-শিকারে, এ-কথা মোইরাংয়ের চিংখু তেল হেইবার কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই রাজাময় রটনা করলেন তিনি,—খবরদার! অমুক তারিখে কোনো পুরুষ যেন লোকতাক হ্রদে না যায়।

রাজার আদেশ। তার ওপর রাজকুমারীর মাছ-শিকার বলে কথা। পুরুষরা সেদিন লোকতাক-এর ধারে-কাছে গেল না।

খাম্বাকে ঘরে রেখে খামনু গিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে যোগ দিল। হ্রদের মাঝখানে ছোট্ট এক দ্বীপ, সেখানে মাছ ধরতে লাগল।

খাম্বা ঘুমিয়ে পড়েছে তৎক্ষণাৎ। স্বপ্ন দেখছে,—প্রভু থাংজিং এসেছেন। আদেশ দিচ্ছেন তাকে, লোকতাকে যাও। তরী ভাসাও গিয়ে।

খাম্বা তখুনি ছুটল। লোকতাক-এর তীরে গিয়ে থাংজিংকে স্মরণ করল।

আশ্চর্য! হ্রদের তীরে অপরূপ তরী। প্রভু থাংজিং-এর করুণাতেই বুঝি।

খাম্বা তাড়াতাড়ি তরীতে উঠল। হ্রদের বুক বেয়ে তর তর করে এগোল।

খানিকদূর এগোতেই অন্য চেহারা হ্রদের। স্নেহময়ী হঠাৎ উগ্রচণ্ডী যেন। জননী ভৈরবী। প্রচণ্ড ঝড়ে দুলে উঠল হ্রদ। অশান্ত ঢেউগুলো ছোটখাটো এক-একটা পাহাড়ের রূপ ধরে খাম্বার নৌকোতে আছড়ে পড়ল। প্রলয় শুরু হল।

খাম্বা কী করবে, কোন্ দিকে যাবে, কিছুই ঠাওর করতে

.য়ে থাংজিংকে স্মরণ করে শুধ্,—প্রভু, পথ

প্রভু তা' হয়েই আছেন। তাঁরই মায়ায় এ ঝড়।

.ন থাম্বায় নৌকোটি ছুলতে ছুলতে ছোট্ট এক দ্বীপে গিয়ে

.কন? আবার কেনই বা খোইবী আর খামনু সেই দ্বীপেই

.ব মাছ ধরতে?

এদিকে দ্বীপে পা দিয়েই খাম্বা স্তম্ভিত।

—কে উনি? ওই অপরূপা?—খোইবী:ক দেখে নিজেকেই প্রশ্ন তার।

তখন খোইবীরও ঠিক একই প্রশ্ন,—কে উনি? ওই অপরূপ?

ছু'জনেই মুগ্ধ সেই মুহূর্তে। ছু'জনেই বিস্মিত। কা'রও আর চোখের পলক পড়ে না। যেন বিশ্বভুবন হারিয়ে যায় দেখতে দেখতে। হ্রদ, দ্বীপ, আকাশ—সব একাকার হয়ে যায়।

সেই প্রথম দেখা।·· সেই শুভদৃষ্টি।

খামনু এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। খোইবীকে বলছে,—চিনলে? ওই ছেলেটিকে?

খোইবী জবাব দিল না কিছু। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

খামনু বলল,—ও আমার ভাই: খাম্বা।

—খাম্বা!—যেন কুসুম-শরে বিদ্ধ হবার ঠিক পরেই খোইবী বজ্রাহত,—কী সর্বনাশ! এখানে কেন সে? রাজার নিষেধ শোনে নি? হ্রদে এলে শাস্তি পেতে হবে, জানে না?

খামনু বললো,—জানে।

—তবে? এখনও দাঁড়িয়ে সে?—বলতে বলতে খাম্বার আরও কাছে এগিয়ে গেল খোইবী। তাকে কাতর অনুরোধ করল,—দোহাই তোমার! ঘরে ফেরো। রাজা জানলে রক্ষে থাকবে না। হয়তো বা গর্দান যাবে।

খাম্বা অনুরোধ রাখল। ঘরে ফিরল তৎক্ষণাৎ।

ঝড়ের নামগন্ধও নেই তখন।

আনন্দে উদ্ভাসিত। এদিকে ঘরে ফি ভু

খাম্বা দেখল, খোইবীকে নিয়ে থামন্নু

আসছে।

—বাড়ি!—কুঁড়েতে পা দিয়েই খোইবীর চোখ মুখ

—এ যে আমারও বাড়ি! এরই জন্যে কত জন্ম আমার

বাড়িতে বিগ্রহ ছিল একটি। ভগবান থুমাল লাক্‌পা

ছিল। খোইবী সেই মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করল,—প্রভু,

দাও। শ্রী-পাদপদ্মে আশ্রয় দাও। এ-বাড়িতে থেকে চিরকাল

যেন তোমার সেবা করি।

—চিরকাল?—হেসে উঠল থামন্নু,—কখনও সম্ভব? তুমি না

রাজকন্যে? কুঁড়ে ঘরে থাকবে কোন দুঃখে?

রাজকন্যে খোইবী জবাব দিল,—দুঃখে নয় ভাই, সুখে থাকবো।

—সত্যি বলছো?

—হ্যাঁ।

—ভেবে বলছো?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! গরীব খাম্বাকেই শেষকালে—

কথা শেষ করতে পারে না থামন্নু। তার আগেই সোনার চুড়ি

জলে ডুবিয়ে দেয় খোইবী। শপথ করে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, গরীব খাম্বাকেই

হৃদয় সমর্পণ আজ থেকে। প্রাণ থাকতে আর কেউ কোনোদিন

আমার ভালোবাসা পাবে না।

যেমন কথা, তেমনি কাজ রাজকন্যের। দিনে দিনে পূর্ণিমাভিসারী

চাঁদের মতো ষোলকলায় বেড়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু চাঁদের নাগাল

কেউ পেল না।

এদিকে খাম্বাও কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছেন। পিতা

পুরেনবার মতোই শৌর্যে ও সাহসে সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

।তা,—থাম্বা প্রথম। 'লামচেল'

। রাজকন্যে থোইবী দেবেন বীরদের

এবার কেউ নেই।

রদের মধ্যে কোংয়াম্বা তখন অগ্রগণ্য।

বাসতেন তিনি। মনে মনে তাকে ঘিরে সুখস্বপ্ন

কোংয়াম্বা যখন দেখলেন, থাম্বা রাজকন্যের অনুরাগী, তখন সে পা-পড়া বিষধর সাপের মতো তিনি শত্রুকে দংশন করতে উদ্যত হলেন। এছাড়া, বিয-সংগ্রহে আগে থাকতেই সচেতন ছিলেন তিনি। থাম্বার শৌর্য-বীর্য ক্রমেই তার কাছে অসহ্য ঠেকছিল।

কী করা যায়, কেমন করে শত্রুকে ছোবল মারা যায়,—দিনরাত এই একই ভাবনা কোংয়াম্বার।

শেষকালে অনেক চেষ্টায় শত্রু-নিধনের পথ মিলল। কোংয়াম্বা খুমাল-এর মেয়েদের কাছে শুনলেন,—নতুন বিপদ। এক বুনো ষাঁড় উৎপাত শুরু করেছে। ইকোপ এবং ওয়াংখে হ্রদের মাঝে থাকে চাষীরা। ষাঁড়টি ওদের ঘরছাড়া করছে।

কোংয়াম্বা দেখলেন, এই সুযোগ। ষাঁড়-ধরার কাজে থাম্বাকে ঠেলে দিলে কারও সাধ্যি নেই যে তাকে বাঁচায়।

সঙ্গে সঙ্গেই এক ফন্দি আঁটলেন তিনি। মোইরাং-রাজকে গিয়ে বললেন,—সম্রাট। প্রভু থাংজিং এর অশেষ করুণা। স্বপ্নে দেখা দিলেন তিনি। জানালেন, ইকোপ এবং ওয়াংখো হ্রদের মাঝখানে আছে এক বুনো ষাঁড়। পরম সুস্বাদু তার মাংস। ভগবান সেই মাংসের ভোগ পেলে তৃপ্ত হবেন।

কোংয়াম্বার এই কথায় রাজা চিংখু তেল্‌হেইবাকে চিন্তিত মনে হল। খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন তিনি। তারপর কম্পিতকণ্ঠে বললেন,—কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা কি করে পূরণ হবে? কে বধ করবে ঐ ষাঁড়?

কোয়াম্বা জবাব দিলেন,—কেন? খ[illegible]
কথা শোনা অবধি অস্থির একেবারে। ও[illegible]
বন্দী করে তাকে।

চিখু তেল হেইবা অবাক হয়ে বললেন,—এখনই?

কোয়াম্বা অভয় দিলেন,—হ্যাঁ। মহারাজ। শুধুমাত্র
অপেক্ষা।

—বেশ। হুকুম দিচ্ছি। খাম্বাকে ডাকাও।

রাজার অনুচররা তখনই ছুটল। রাজার হুকুমের কথা খাম্বাকে
জানাল।

সব শুনে খাম্বা আসল ব্যাপারটা আঁচ করলেন। এ যে শয়তান
কোয়াম্বার কীর্তি, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না তাঁর।

কিন্তু তবু, বীর তিনি। ভয় পেলে চলবে কেন?—সাহসে
বুক বেঁধে যাত্রার তোড়জোড় শুরু করলেন।

[illegible] —ভাই খাম্বা, সে
বললে,—[illegible] ঘোড়াটি [illegible] পিতার
[illegible] ছিল একদিন...।

খাম্বা অবাক। বললেন,—তাই নাকি?

খামনু বুঝিয়ে দিলেন,—হ্যাঁ রে। ঘোড়াটির কানে কানে পিতার
নাম উচ্চারণ করলে দেখবি, সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত হবে।

খাম্বা বললেন,—বেশ! তাই করবো—

বলেই এগোতে যাবেন, এমন সময় খামনু বাধা দিলেন আবার।
খাম্বার হাতে রেশমের একটা দড়ি গুঁজে দিয়ে বললেন,—এই যে,
যত্ন করে রাখিস এটা। ঘোড়াটিকে দেখাস। দেখবি, মন্ত্রের মতো
কাজ হবে। এ দেখা-মাত্রই জানোয়ার তোর বশে আসবে।

আসলে হলও তাই। জানোয়ার বশ হলো। ঘোড়াটির পিঠে
চেপে বীর-বিক্রমে বন থেকে বেরিয়ে এলেন খাম্বা।

রাজা চিংখু তেল হেইবা এতে খুব খুশি। খাম্বাকে প্রচুর

পারিষদদের ডেকে বললেন,—রাজকন্যে
সমর্পণ করতে চাই।

াম্বা স্তম্ভিত। সব কিছুর উল্টো ফল হবে, এ
ভাবেন নি। অগত্যা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন তিনি।
ন করে ছোবল মারার ফিকির খোজেন।

খেতে দেখতে ফিকির একটা জুটেও গেল। সেদিন ধরে-আনা
ড়টিকে ভগবান থাংজিং-এর সামনে বলি দেয়া হয়েছে। মহা
ধুমধাম করে ভোগ দেয়া হয়েছে দেবমন্দিরে। যুবরাজ অর্থাৎ
খোইবীর পিতা চিংখু আখুবা মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ছেন।
খাম্বা আর কোংয়াম্বা সেই তীর কুড়িয়ে দিচ্ছেন দরকারমতো।
···হঠাৎ যুবরাজের চোখ পড়ল খাম্বার জামার উপর।—কী আশ্চর্য!
এ যে তারই জামা!···ক্রোধে ঘৃণায় জ্বলতে লাগলেন যুবরাজ।
ভাবলেন, নিশ্চয় খাম্বা এ-জামা চুরি করেছে।

আসলে চুরি এ নয়। খোইবী তাঁর পিতাকে না জানিয়ে
খাম্বাকে এটা উপহার দিয়েছিলেন।

—কী? এত বড় স্পর্ধা!—আসল জিনিস না জেনেই ক্রোধে
ফেটে পড়লেন যুবরাজ। আর কোংয়াম্বা দেখলেন, এই তো
সুযোগ! এই ফাঁকে যুবরাজকে খুশি করা যাক।

তখনই পোষা কুকুরটির মতো পদলেহন শুরু হল তাঁর।
নানাভাবে যুবরাজের মন পাবার জন্যে তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন।

মন পেলেনও। যুবরাজ হঠাৎ তাকে কথা দিলেন, খোইবীকে
তোমার হাতেই তুলে দেব।

—কার হাতে? কোংয়াম্বার? অর্থাৎ শয়তানের?—খবর শুনে
অন্ধকার দেখেন খোইবী। যেন গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যেতে যেতে
নিজেকেই প্রশ্ন করেন।

কিন্তু না, তবু বাঁচতে হবে তাকে। যেমন করে হোক পিতাকে
বোঝাতে হবে।

একদিন। খাম্বার কাছে গেলেন থোইবী। চেয়েচিন্তে উৎকৃষ্ট কিছু ফল আনলেন। উদ্দেশ্য মহৎ। পিতা মৃগয়া থেকে ফিরলে এই ফল উপহার দেবেন। খুশি করবেন তাঁকে। কিন্তু ভাগ্য মন্দ। উল্টো বুঝলেন তিনি। মৃগয়া থেকে ফিরে যখন শুনলেন, ফলগুলো খাম্বার দেয়া উপহার, থোইবী এনেছে, তখন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। হাতের কাছে যা' পেলেন তা'ই ছুঁড়ে মারলেন রাজকন্যের দিকে।

আঘাত তেমন কিছু নয়, তবে অপ্রত্যাশিত। বেদনায়, লজ্জায়, ভয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারালেন থোইবী।

চিংখু আখুবা দেখলেন, বিপদ। এখনই কিছু একটা করা দরকার। তাই মেয়েকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিলেন তিনি। তার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, মা, ওঠো। খাম্বা-ই জামাতা হবে আমার।

খাম্বা! যেন অমৃত-বর্ষণে অভিসিঞ্চিত হলেন থোইবী। মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেলেন।

কিছুদিন পর। যুবরাজের খুনী চ্যালারা খাম্বার পিছু নিল। বাগে পেয়ে একদিন অকথ্য নির্যাতন করল তাঁকে। হাত-পা বাঁধল। তারপর হাতির পায়ের সঙ্গে জুড়ল।

সবাই মিলে কী উল্লাস তখন। হাতিকে তাড়া দেবার কী ধুম।

হাতি ছোটে, খাম্বার দেহটাকেও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায়। ...খানিকদূর যেতেই জ্ঞান হারালেন খাম্বা। তাঁর সারা দেহ রক্তাক্ত হয়ে উঠল। সকলেরই ধারণা হল, খাম্বার মৃত্যু হয়েছে। লাশটাকে ফেলে দেয়া যাক।

তাই করল ওরা। সামনেকার বনে খাম্বার অসাড় দেহটাকে ছুঁড়ে দিল।

থোইবী স্বপ্ন দেখছেন তখন। দেবতার কৃপায় খাম্বার দুরবস্থার কথা জানছেন। স্বপ্ন ভাঙতেই উঠে বসলেন তিনি। খাম্বাকে মুক্ত করবেন বলে ছুটলেন।... হাতে ছোরা, দেখতে উন্মাদিনীর মত।

থাম্বাকে খুঁজে পেতে সময় লাগল না। বাঁধন কেটে চেতনা ফিরিয়ে আনতেও অসুবিধে হল না তেমন। ভগবান পথ দেখাচ্ছেন। উপায় বাৎলে দিচ্ছেন, আবার বিচারেরও ব্যবস্থা করছেন।

ওদিকে রাজা চিংখু তেল হেইবার কানে গেছে সব। থাম্বার শুভাকাঙ্ক্ষীরা যুবরাজের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন।

রাজা ন্যায়বিচারই করলেন। যুবরাজের কারাদণ্ড দিলেন তৎক্ষণাৎ। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই যবরাজ আবার যে-কে সে-ই। ঠিক সেই আগেকার মতোই হিংস্র নেকড়েটি।

মেয়ে খোইবীকে নির্বাসন দিলেন তিনি। রাজ্যময় রটনা করলেন, ওই কলঙ্কিনীর মুখ দেখাও পাপ।

—পাপ ? রাজ্যের লোক শিউরে উঠল, কোনটা পাপ ? নির্দোষের নির্বাসন ? না কি নির্দোষ-নির্মল প্রেম ?

এদিকে বিদায় নেবার আগে খোইবী গেছেন থাম্বার কাছে।

—প্রিয়তম ! খোইবীর কণ্ঠে রাজ্যের ব্যাকুলতা,—দেখো, মিলন আমাদের হবেই। প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় নিশ্চয়ই আমরা উত্তীর্ণ হবো।

থাম্বা জবাব দেন নি কিছু। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন। দিগন্তের বুকে ক্রমশ মিলিয়ে-যাওয়া জাহাজের মাস্তুলের দিকে মানুষ যেমন করে তাকায়।

খোইবীর তখন দাঁড়াবার সময় নেই। প্রহরীরা সামনে। তাড়া দিচ্ছে অবিরাম।

তিনি চললেন। ভিখারিণীর বেশে। দেশান্তরে।

রাজ্যময় কান্নার রোল। ছেলে-বুড়ো-যুবক-যুবতী—সকলেরই চোখে জল। সবাই ঘর ছেড়ে এসেছে বাইরে। রাজকুমারীকে দেখছে।

এই শেষ দেখা, আর কি ফিরবেন তিনি ?—সকলের মুখে এক প্রশ্ন।

শুধমাত্র রাজকুমারীরই প্রশ্ন নেই কিছু। তিনি নির্বাক, নিরুত্তর। যেন স্রোতের টানে ভেসে-চলা তৃণখণ্ডটি। কোথায় যেতে হবে, কতদূর, কিছুই জানেন না।

দেখতে দেখতে রাজকুমারী গোহবীর সামনে থেকে পরিচিত মুখগুলো মিলিয়ে গেল। অপরিচিত প্রজাদের ভিড়ও ক্ষীণ হয়ে এল ক্রমেই। শহর পেরিয়ে গ্রাম এল, তারপর গ্রাম পেরিয়ে বনপথ এল।

গোহবী এখন ক্লান্ত। একটানা চলে চলে অবসন্ন। ভাবলেন, বিশ্রাম নেয়া যাক একটু। সামনেই আছে গাছ। তার ছায়ায় একটু বসা যাক।

সবে বসেছেন, এমন সময় এসে হাজির। হাঁপাচ্ছেন। ছুটে আসতে হয়েছে বলে নিশ্বাস ফেলছেন ঘন ঘন।—তুমি? বাপ্পাকে দেখে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে গোহবীর প্রশ্ন।

বাপ্পা জবাব দিলেন না কিছু। রাজকুমারীর হাতে একটা লাঠি তুলে দিলেন।

—এ যে লাঠি!—রাজকুমারী আসল ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি।

বাপ্পা বুঝিয়ে দিলেন,—সামনেই খাড়া পাহাড়। পথ ভীষণ দুর্গম। তাতে লাঠি থাকলে চলতে সুবিধে।

এইটুকু সুবিধের জন্যে এতখানি কষ্ট? এতটা পথ ছুটে আসা? —গোহবী একদৃষ্টিতে বাপ্পার দিকে তাকান।

বাপ্পারও পলক পড়ে না চোখে। গোহবীকে দেখছেন তো দেখছেনই। যেন পল পেরিয়ে, দণ্ড, প্রহর, যুগ, শতাব্দী ডিঙিয়ে অনন্তের ওপার থেকে দেখছেন।

এদিকে দেখতে দেখতে ঝাপসা হয়ে আসে সব। দু'চোখ বেয়ে ধারাবর্ষণ নামে। প্রহরীদের তাড়া শোনা যায়,—আর দেরী নয়, যেতে হবে।

—যাচ্ছি।—বলেই থোইবী খাম্বার দেওয়া লাঠিটি সেখানেই পুঁতে রাখেন।

খাম্বা অবাক,—এ কী করছো ?

থোইবী বললে,—প্রেম অনন্ত, ভালোবাসা নির্মল। এবং তা' যদি হয় তো এই লাঠিতেই পাতা গজাবে একদিন : ফুল ফুটবে। আমাদের সম্পর্ক যে অটুট ও অক্ষুণ্ণ, তা'রই প্রতীক হয়ে এ বিরাজ করবে।

খাম্বা জবাব দিলেন না, প্রতিবাদ করলেন না, বজ্রাহত বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন শুধ। দেখলেন, বনস্পতিকে পেছনে ফেলে পথিক যেমন ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, থোইবীও তেমনি অদৃশ্য হয়ে গেল।

যুবরাজের অনুচর কাবো-উপত্যকায় নিয়ে গেল তাঁকে। তুমুরাকপা নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করল। থোইবীর দুঃখের বোঝা ভারী হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

দিনের বেলা বনে যায় সে, কাঠ কুড়োয়। আবার কখনও বা বাজারে গিয়ে মাছ বিক্রি করে। কিন্তু রাত্তিরে সময় যেন আর কাটে না। যেন ঘুম আসে না কিছুতেই। যত সব পুরনো স্মৃতি একসঙ্গে এসে মাথায় ভিড় করে।—খাম্বা কেমন আছে এখন? কী করছে? খামনু? থোইবীকে মনে রেখেছে? না কি ভুলে গেছে এরই মধ্যে?···মা বাবা? মহারাজ চিংখু তেল হেইবা? মেয়েকে ভুলে গেলেন?—আকাশ-পাতাল কত কী ভাবেন থোইবী। নিজের মনকেই কত কী প্রশ্ন করেন।

এদিকে যত দিন যায়, যুবরাজ চিংখু আখুবার মন ততই নরম হতে থাকে। মেয়ের কষ্টের কথা ভেবে ততই কাতর হতে থাকে।

শেষকালে একদিন তিনি মনস্থির করলেন। মেয়েকে ফিরিয়ে আনবেন বলে লোক পাঠালেন কাবো-উপত্যকায়।

খবরটা যথাসময়ে কোংয়াম্বার কানে গেল। রাজকুমারী আসছেন

শুনে তিনি অস্থির। তখনই ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন। মাঝপথে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করবেন তাঁকে।

এদিকে রাজকুমারী থোইবী যখন দেখলেন, ঘোড়ার পিঠে কোংয়াম্বা, তারই দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর সময় লাগল না।

তিনি কোংয়াম্বাকে বললেন,—যদি দয়া করে ঘোড়াটি দেন তো বড় উপকার হয়।

কোংয়াম্বা এককথায় রাজী। বললেন,—বেশ তো।

থোইবী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন এবার। প্রচণ্ড বেগে ছুটলেন।

কোংয়াম্বা কিছুই বুঝতে না পেরে অসহায় একেবারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, ধুলো উঠল, ঘোড়ার ক্ষুরের খট্-খট্ খটা-খট্ শব্দটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হল। যেন চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল থোইবী।

কোথায় গেল সে? মোইরাঙ্? রাজপ্রাসাদ?—কত কী ভাবেন কোংয়াম্বা, থৈ পান না।

এদিকে থোইবী সোজা ছুটে চলেছেন তখন। খাম্বার বাড়িতে গিয়ে থেমেছেন।

পরদিন। এক বৃদ্ধ এলেন রাজপ্রাসাদে। মহারাজা চিংখু তেল হেইবাকে বললেন,—বড় বিপদ। এক বাঘ উৎপাত শুরু করেছে। নিরীহ মানুষদের খুন-জখম করছে নিত্য।

মহারাজা স্বীকার করলেন,—বাঘটাকে বধ করা দরকার।

—কিন্তু কে করবে বধ? দুর্দান্ত নরঘাতকের সামনে কে যাবে?—রাজার প্রশ্ন শুনে অনুচররা এ-ওর মুখের দিকে তাকান।

চিংখু তেল হেইবা তখন ঘোষণা করলেন,—যে ঐ বাঘটিকে বধ করতে পারবে, তিনি তারই সঙ্গে থোইবীর বিয়ে দেবেন।

এবার খাম্বা এবং কোংয়াম্বা দু'জনেই চললেন বাঘ-শিকারে।

দু'জনে ঠিক একই সময়ে বাঘটিকে লক্ষ্য করে তীরও ছুঁড়লেন। কিন্তু দু'টি তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। এদিকে বাঘ ঝাপ দিল কোংয়াম্বাকে তাক করে। মুহূর্তের মধ্যে তার দেহ ছিন্নভিন্ন করল।

থাম্বা দেখলেন, এই সুযোগ। নরঘাতককে এখনই ঘায়েল করা দরকার।

সঙ্গে সঙ্গেই তীর ছুঁড়লেন তিনি। শত্রুর দেহ লক্ষ্য করে আঘাত হানলেন।

শত্রু পালাতে চাইল। কোংয়াম্বাকে ছেড়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকল। থাম্বা তখন মরীয়া। বিদ্যুৎগতিতে আর একটি তীর ছুঁড়লেন। বাঘটিকে বধ করলেন শেষ অবধি। শিকার কাঁধে নিয়ে তখনই ছুটলেন রাজা চিংথু খেল হেইবার কাছে।

খেল হেইবা থাম্বাকে দেখে অবাক। ইনি কি মানুষ, না অন্য কিছু? বিরাট এক বাঘ মেরে নিয়ে এসেছেন অবলীলাক্রমে। ভয় নেই, ক্লান্তি নেই এতটুক।

এগিয়ে গিয়ে থাম্বাকে অভিনন্দিত করলেন তিনি। প্রচুর উপহার দিলেন।

যুবরাজ চিংখু আখুবাও এগিয়ে এসেছেন ইতঃপূর্বে। থাম্বার বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। আর থোইবী?—থাম্বার সঙ্গে তাঁর বিয়ে তখনিই ঠিক হয়ে গেল। পিতা ও পিতৃব্য পাকা কথা দিলেন।

থাম্বার দারিদ্র্য ঘুচল সেইদিন থেকে। দিদি খামন্থর ভালো বিয়ে হল। এবং থোইবী বধূবেশে রাজ্যের সকলের আশীর্বাদ আর ভালোবাসা নিয়ে থাম্বার ঘর আলো করল।

এইবার কিছুদিন সুখ আর সুখ, আনন্দ আর আনন্দ। দুঃখ নেই, অভাব নেই, অভিযোগ নেই। থাম্বা ও থোইবীর দিনগুলো শুধু যেন আলোতে ঠাসা।

কিন্তু তা' কি হয়? আলো থাকবে, আর ছায়া থাকবে না?

সুখ থাকবে, অথচ দুঃখ থ।
না ?

থাম্বা-খোইবীর জীবনেও বিরহ-দি-
খোইবীকে অকারণ সন্দেহ করতে লাগলেন থ।

একদিন থাম্বা ঠিক করলেন, খোইবীর চরিত্রে
পর-পুরুষ সম্পর্কে তার কৌতূহল কতখানি, যাচাই করবে-

সেদিন কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরোলেন
ফিরলেন গভীর রাত্তিরে। খোইবীর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।
এবং তারপর দেয়ালের ফাঁক দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে দিলেন একটা।
উদ্দেশ্য ছিল, খোইবীর মনোযোগ আকর্ষণ। পর-পুরুষের আহ্বানে
তিনি সাড়া দেন কিনা, পরীক্ষা।

খোইবী সে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু উত্তীর্ণ হতে
গিয়ে যে মূল্য দিতে হল তা পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই
মর্মঘাতী।

খোইবী দেখলেন, দেয়ালের ফাঁক দিয়ে কে যেন লাঠি গলিয়ে
দিয়েছে পর-পুরুষ কেউ ঘুর-ঘুর করছে ঠিক আশেপাশেই।

তখন রাগে দুঃখে জ্ঞান হারালেন তিনি। ঘর থেকে থাম্বার
বর্শাটি তুলে নিয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে মারলেন। সেই বর্শা
গিয়ে লাগল থাম্বারই গায়ে। তার মর্মমূল বিদ্ধ করল।

দারুণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি,—খোইবী!
খোইবী!

—কে ডাকে? কার কণ্ঠস্বর? থাম্বা নয়?—খোইবীর মাথায়
বাজ পড়ল যেন। ঝড়ের বেগে তিনি বাইরে এলেন। এসে দেখেন,
হ্যাঁ, থাম্বাই বটে। অসাড়, প্রাণহীন। উৎপাটিত বনস্পতির মতো
লুটিয়ে পড়ে। বর্শাটি বুকে গেঁথে আছে।

খোইবী সেই বর্শা টেনে নিলেন। নিজের বুকে বসি-
তৎক্ষণাৎ।

' ..র অমর প্রেমকথা সেই
.তা বটেই, সারা মণিপুরেরও

এদ্ধাবনতচিত্তে থাম্বা-থোইবীর কথা স্মরণ
, —এমন জনপ্রিয় কাহিনী তামাম মণিপুরে আর
.থোইবীর মতো আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকাও নেই আর।
.ধ, আবদ্ধ নয়, ওঁরা পৃথিবীতে এসেছিলেন শাশ্বত প্রেমকে
প্রৎ. .ণ করতে। কিন্তু পৃথিবীর দুঃখসুখ তো ওঁদের জন্যে নয়। তাই
লীলা শেষ করে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। স্বর্গ থেকে এসেছিলেন,
স্বর্গেই ফিরে গেলেন।

তাই নাকি?—থাংজিং মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে সেদিন ভাবি।
স্তব্ধ, জনশূন্য মন্দির-প্রাঙ্গণটির দিকে ফি:র ফিরে তাকাই।—জবাব
পাই না। শুধু খাঁ খাঁ করে চারিদিক। উত্তুরে হাওয়া আমাদের
ছুঁয়ে ছুঁয়ে লোকতাক হ্রদের দিকে ছোটে। নীলকান্তর তাড়া কানে
আসে,—কই! চলুন! হ্রদ দেখবেন না?

বললাম,—দেখেছি তো! আবার?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার। আসল জিনিসই দেখেন নি।—নীলকান্ত
এমন একটা ভাব করলেন যে, মনে হল, ভেলকি দেখাবেন। ঝাঁপির
ভেতর থেকে আরও কত কী খুলবেন একে একে।

অগত্যা চললাম আবার। লোকতাক হ্রদের গা-ঘেঁষে এগোলাম।

সামনেই সেতুবন্ধ যেন। হ্রদের মাঝখান দিয়ে পথ। সোজা চলে
গেল টিলা-মতো একটা জায়গার দিকে।

টিলার মাথায় বাড়ি। মুকুটের ওপর ছোট্ট আর-একটি মুকুট
'। সুন্দর। অপরূপ।···নীলকান্ত বলেছিলেন, ওই নাকি সেকেণ্ড্
উস; সবে গড়ে উঠছে।

—ভালো। তবে সেকেণ্ড্ না বলে এটিকেই ফার্স্ট বলা

উচিত। কারণ, প্রথমটির তুলনায় বয়সে ছোট হলেও অবস্থানের গুণে এরই জয়-জয়কার।

এদিকে সেতুবন্ধ ধরে অনেকটা এগিয়েছি। দু'পাশে চোখে পড়ছে শুধু জল আর জল।··আরও খানিকটা এগোতেই পাহাড়। আঁকাবাঁকা চড়াই পথ।

গোটা তিন-চার বাঁক ফিরে জীপ থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখি, সামনেই রেস্ট্ হাউস, একতলা, কায়দাদুরস্ত কুঠী, ঝকঝকে তকতকে।

এগোতে যাচ্ছিলাম, রেস্ট্ হাউস-এর দিকেই; নীলকান্ত বাধা দিলেন,—না না, ওদিকে নয়; এদিকে আসুন।

—এদিকে মানে?—আমার প্রশ্নে শিশুর ব্যাকুলতা। যেন লোভনীয় কোনো খেলনার দিকে শিশুদেরই কেউ এগোচ্ছিল; হঠাৎ বাধা পেল।

নীলকান্ত বললেন,—রেস্ট্ হাউস-এ দেখবার কিছু নেই। সামনের ঐ উঁচু জায়গাটায় চ ন, দেখবেন।

অগত্যা সবাই আমরা নীলকান্তর পিছু পিছু চললাম। চড়াই পথ ধরে উঠলাম খানিকটা।

বেশি নয়, সামান্য একটু উঠতেই নীলকান্তর সেই উঁচু জায়গা। দেখতে অনেকটা হাওয়া-ঘরের মতো। সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ একটি; চারিদিক তার খোলা। তার সামনে, পেছনে সর্বত্র অনাবৃত মহিমায় লোকতাক।··অনেক উঁচু থেকে দেখছি, অনেকটা দূর অবধি চোখে পড়ছে। মনে হচ্ছে, লোকতাকে শ্রদ্ধা ও প্রণয়ে মাখামাখি। দূরের পাহাড়গুলোর পাদদেশকে ছুঁয়ে হ্রদের জল; চরণ-বন্দনা করছে যেন। আবার হ্রদের মাঝে মাঝে পাহাড়; জল যেন প্রণয়ে-সোহাগে ঘিরে ধরছে।···এছাড়া, কত দ্বীপ আরও; কচুরিপানায় গড়া। দীর্ঘ দিন ধরে পানা জমতে জমতে রীতিমত কঠিন। বাড়িঘরও আছে দ্বীপগুলোতে। একটা

নয়, অনেক ; অজস্র। শুনলাম, কুঁড়েঘর ওগুলো। চাষী এবং জেলেদের আস্তানা।

জেলেরা ধারে-কাছেই। হ্রদের যত্রতত্র। মাছ ধরছে। নৌকো নিয়ে ছোটাছুটি করছে।

অনেক নৌকো লোকতাকে। সামনেরগুলো স্পষ্ট, আর দূরের ওরা বিন্দুর মতো। যাত্রী-নৌকোও আছে. হ্রদের বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোর মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র যানবাহন।

যানগুলোর দু'একটি চোখের সামনেই ছুটে গেল। মেইল ট্রেন যেন. ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে না ছুঁয়েই ছুটল

লম্বামতো ওরা। দেখতে অনেকটা যেন বাইচ্-এর নৌকোর মতো।

তা বাইচ্ও নাকি কম হয় নি এখানে। উৎসবে, প্রতিযোগিতায়. লড়াইয়ে নৌকোর ছোটাছুটি লেগেই থাকত। লড়াইয়ের সময় প্রধানরা নির্দেশ দিতেন, বদলা নাও। নৌকো দখল করো

এ-অঞ্চলে নৌকো-দখল মানেই দ্বীপ-দখল

মণিপুর-সম্রাট পুনশিবর বেলায় কী হল ?

পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে সম্রাট এলেন মোইরাং দখল করতে। লোকতাক পেরোচ্ছেন, এমন সময় থাঙ্গা দ্বীপের সর্দার রুখে দাঁড়ালেন। শত শত নৌকো পুনশিবর সৈন্যদের ঘিরে ধরল।

কিন্তু দমবার পাত্র তিনি নন তখনই নির্দেশ দিলেন, বদলা নাও। নৌকো দখল করো।

পুনশিবর সৈন্যরা দেখতে দেখতে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে নৌকো দখল করল। আর থাঙ্গা সর্দারের শত শত সৈন্যের অবস্থা দাঁড়াল জালে আটক-পড়া মাছের মতো।

এই থাঙ্গা দ্বীপটি পাহাড়ে আকীর্ণ। সুন্দর যেমন, তেমনি আবার সুরক্ষিতও। তাই রাজা-উজীরদের নজর হামেশাই এর উপর পড়ত।

মণিপুর-রাজ গর।
অষ্টাদশ শতকের মাঝা
এর ঢেউ গুণতেন।
অথচ এমনটি হবার কথ।
না হলে থাঙ্গায় আসতেন না।
নিজের হাতে ধরে সিংহাসনে বসি.
বেইমানি না করলে কেন তিনি এখা:
এক গাদা সুপুরি গাছ লাগিয়ে কেন ম
লোকতাক-এর ঢেউ গুণবেন বসে বসে ?
ওদিকে চিং সা কিন্তু পিতার এই নিশ্চিন্ত
বরদাস্ত করে নি। থাঙ্গা দ্বীপে অপেক্ষমান গরীব নি.
নৌকোকে দেখিয়ে হঠাৎ একদিন আদেশ দিয়েছিল,
এই মুহূর্তে ঘিরে ফেল ওদের।
নৌকো বেহাত হতেই গরীব নওয়াজ বুঝলেন. পাত্
গুটোতে হবে এবার. দ্বীপ ছাড়তে হবে
তাই বলছিলাম, এ-অঞ্চলে নৌকো-দখল মানেই দ্বীপ-দখল।
এদিকে গোটা অঞ্চলটা গোপালবাবুর খুব মনে ধরেছে। নীলকান্তকে বার বার বলছেন,—থাকলে হত এখানে। অন্ততঃ দিন কয়েক।
—না. এখন আর তা হয় না,—নীলকান্ত দুঃখ করলেন,—অন্য 'প্রোগ্রাম' আগে থাকতেই 'রেডি'।
অঞ্জলি বললে, 'প্রোগ্রাম' করে চলার এই বিপদ। সব কিছু চাখতে গেলে ভালো কিছু ছাড়তেই হবে।
সুধীরবাবু ছবি তোলায় ব্যস্ত ছিলেন এতক্ষণ। এইবার কথা বললেন,—হ, কইছেন।

তাড়াতাড়ি এগোতে হল আবার। 'প্রোগ্রাম রেডি'।

.এর দিকে। খানিক-

.মারিয়াল। সংকীর্ণ এক

ন।

.য়ে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ-এর

.নেই প্রথম বিজয়-নিশান ওড়ান ওঁরা।

হাসিমুখে তখন বলেন, জয় হিন্দ্!

একান্তর দেখাদেখি আমরাও বললাম একবার।

র ডান দিকে তাকালাম। দু'টি স্তম্ভ ওখানে,

; একটি, অন্যটি অপেক্ষাকৃত বড়।

কয়েক ফুট মাত্র উঁচু। এক-মানুষ সমানও হবে না।

.র পরিমাপে এর উচ্চতা হিমালয়ের চেয়েও বেশি। কারণ,

এখানেই প্রথম উড়েছিল। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে আজাদ

্ ফৌজ এখানেই প্রথম পুঁতেছিল বিজয়-পতাকা।

আজাদ হিন্দ্-এর সেই কাহিনী আমাদেরই গর্বের কাহিনী। মুক্তি-পথিক ভারতের অগ্নিশুদ্ধির কাহিনী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সে কাহিনীর মহানায়ক।

১৯৪১ সালের জানুয়ারি। ব্রিটিশ-কারাগার থেকে অন্তর্ধান করলেন সুভাষ। জার্মানী গেলেন। সেখান থেকে জাপান হয়ে সিঙ্গাপুর।

ব্রহ্মদেশে জাপানের কর্তৃত্ব তখন। সিঙ্গাপুরের প্রবাসী ভারতীয়রা তখন সুভাষের অগ্নিমন্ত্রে সঞ্জীবিত।

সুভাষ ওদের নিয়েই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গড়লেন। প্রতিষ্ঠা করলেন আজাদ হিন্দ্ সরকার। প্রবাসী ভারতীয়রা দলে দলে যোগ দিল। ব্রহ্মের বন পাহাড় কাঁপিয়ে বিদ্যুৎগতিতে এগোল 'মুক্তি-যোদ্ধার দল।

ইংরেজ সরকার সেয়ানা। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ-এর অভিযানকে

জাপ-আক্রমণ বলে প্রচার করলেন। কারণ, ব্যাপার যদি ভারতীয়রা জানতে পারে তো প ঘটবে। ভারতবাসীরাই এগিয়ে আসবে মু ত করতে।

ওদিকে মুক্তিযোদ্ধারা দুর্বার। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকে এগিয়ে চলে। রক্তস্নান করতে করতে আঘাত হানে শত্রুঘাঁটিতে।

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি। আরাকান ফ্রন্টে ইংরেজ সৈন্য বিপর্যস্ত। পুরো এক ডিভিসন সৈন্য অবরুদ্ধ। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এগোচ্ছে। মণিপুরের দুর্ভেদ্য ইংরেজ ঘাঁটি 'সেন্ট্রাল ফ্রন্ট্'কে চুরমার করবে বলে স্বপ্ন দেখছে।

স্বপ্ন প্রায় সফল হল। ৮ই মার্চ তিন ডিভিসন মুক্তিযোদ্ধা শত্রু-সৈন্যের উপর চরম আঘাত হানল। ইংরেজ সেনাপতি স্কুনেস পা-ভাঙা নেকড়ের মতো পালালেন। তিন ডিভিসনেরও বেশি সৈন্য ইম্ফল-উপত্যকায় পশ্চাদপসরণ করল।

মুক্তিযোদ্ধারা ওতেও খুশি নয়। কারণ, ওই ইম্ফল-উপত্যকাই প্রথম লক্ষ্য ওদের। ওরা চায়, ইম্ফল-ডিমাপুর রোড অবরোধ করে ইম্ফলের ব্রিটিশ রসদাগার হাত করতে।

ইম্ফল প্রায় হাতের মুঠোয় এসেছিল ওদের। ইম্ফল-ডিমাপুর রোড দখল করে কোহিমা ও ইম্ফলের উপর ওরা প্রচণ্ড চাপ দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, উপযুক্ত রসদের অভাবে শেষরক্ষা করতে পারে নি। মোইরাঙ্ এবং বিষ্ণুপুরসহ মণিপুরের প্রায় দেড় হাজার বর্গ-মাইল জায়গা ছ' মাস অবধি দখলে রেখে ওরা পিছু হটে।

মোইরাঙ্ সাক্ষী এই সব কিছুর। এগোবার যেমন, পিছু হটবারও তেমনি। রক্তস্নানের যেমন, রক্তমাখা বিজয়-নিশানেরও তেমনি।

দাঁড়িয়ে আছি সেই নিশান-চিহ্নিত পবিত্র-ভূমিতে। পাথরে বাঁধানো স্তম্ভটিকে দেখছি।

উল্টোদিকে আর একটি স্তম্ভ। ঠিক তেমনি বাঁধানো। স্মৃতি-

...রা অমর হয়েছেন, সেই মৃত্যুঞ্জয়ী

...া নিবেদিত।

...স্মৃতিস্তম্ভটির দিকে। এক দৃষ্টিতে। বার বার

...? এইটুকু নিবেদনে কি এত বড় আত্মোৎসর্গের

...ডোবা কেটে কি সমুদ্রের মহিমাকে বোঝানো

যারা গেল, তারা কিভাবে গেল?—শ্বাপদাকীর্ণ আরণ্যকপথ; খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই। চলতে চলতে মুখ থুবড়ে পড়ছে কেউ।···কেউ আবার মুখ তুলে যখন লালকেল্লার স্বপ্ন দেখছে, তখন শত্রুপক্ষের বুলেটে হঠাৎ বিদীর্ণ হচ্ছে তার বক্ষ। সঙ্গীদের দাঁড়াবার সময় নেই। আহতদের ফেলে রেখেই চলল। মৃতদের ছুঁড়ে ফেলে দিল দেশলাই-এর খালি বাক্সের মতো।

পাহাড়ীয়া ঝরনাগুলোর সামনে কী ভিড়! কী ভিড়!···আহত মুক্তিযোদ্ধারা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। তৃষ্ণা মেটাচ্ছে।···দেখতে দেখতে ঝরনার জল লাল হল। মিঠে জল লোনা ঠেকল কা'রও কা'রও কাছে। কেউ আবার ঝরনাধারার উপরেই ঢলে পড়ল। দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল।

সঙ্গীদের চোখ খোলা। ধারার প্রবাহ রুদ্ধ হলে চলবে না। অন্যরা জল পাবে না দরকারমতো।···বন্ধুকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিল ওরা; পথের ওপর পড়ে-থাকা একখণ্ড পাথর বা একটা গাছকে সরাবার মতো।

কিন্তু কত সরাবে? পাহাড়ে ধস নামলে তখন-তখনই কি সব ঠিক হয়?

ঝরনার ধারা রুদ্ধ হল শেষ অবধি। আর ওদিকে সারা ভারতের হৃদয়তন্ত্রীতে নতুন জলতরঙ্গ বাজল,—জয় হিন্দ্!

জয় হিন্দ্! আবার বলি আমরা। আই. এন. এ.-র মরণবিজয়ীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।

সামনে নেতাজী মেমোরিয়াল। দোতলা সুদৃশ্য একটি বাড়ি। মাঝারি আকারের।—

ধীরে ধীরে এগোই সেদিকে। মেমোরিয়াল-এ ঢুকি।

একতলায় লাইব্রেরী। ওখানে নেতাজী এবং আই. এন. এ. সম্পর্কিত অজস্র বই। আত্মজীবনী 'ভারত পথিক' থেকে শুরু করে শৈলেশ দে'র 'আমি সুভাষ বলছি' পর্যন্ত। এছাড়া, নানা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম নিয়ে লেখা বইও অজস্র।

দোতলার চেহারা অনেকটা মিউজিয়াম গোছের। ঘরে ঘরে সুভাষচন্দ্রের ছবি। তাঁর জীবনের নানা ঘটনা, নানা মুহূর্ত সেখানে প্রতিবিম্বিত।

ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। হঠাৎ এক ব্রোঞ্জ-মূর্তি চোখে পড়ে। ঘরের এক কোণে একেবারে

দেখি, যোদ্ধার বেশে নেতাজী সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন।

মূর্তিটি জীবন্ত ঠেকল না। মাথা এবং বুকের দিকটা অস্বাভাবিক বড় মনে হল।

অবিশ্যি সন্দেহ নেই, বুক সত্যি বড় ছিল নেতাজীর। হৃদয় যেমন, মস্তিষ্কও তেমনি অনন্যসাধারণ ছিল, কিন্তু সেই বড়ত্ব বা অনন্যত্ব কি আকার দিয়ে বোঝাবো?

দুর্ভাগ্য নেতাজীর দেশবাসীর। মূর্তির মধ্যে ভাস্কররা তাঁকে ধরতে পারছেন না। একজন তো শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে ঘোড়ার ল্যাজের উপর অতিরিক্ত নজর দিতে গিয়ে ল্যাজে-গোবড়ে হয়েছেন। অন্য জন গড়ের মাঠে খেলা দেখিয়ে ছেড়েছেন নেতাজীকে। তাঁর পোশাক-আশাকের ওপর এত বেশি নজর দিয়েছেন যে, দৃপ্ত ভাবটুকু প্রায় কিছুই ফোটেনি। বরং হঠাৎ দেখলে মনে হয়, শীল্ড ফাইন্যাল বা লীগের গুরুত্বপূর্ণ কোনো খেলা দেখছেন নেতাজী। সৈন্যদের মরণ-পণ সংগ্রাম পরিচালনা করছেন না।

এখানেও নান্ট্!—গোপালবাবুর বিস্ময় সবচেয়ে বেশি,—তা অভাব। নি? এই দুর্গম পাহাড়ে?

ঘটনাচক্রে তা পাহাড়েই থাকেন। হয় চূড়াচাঁদপুরে, আর ছিলেন। মূর্তি-ঙ।—নীলকান্তের জবাবে বিস্ময় বা উৎকণ্ঠার নামগন্ধ সঙ্গে। কিন্তু ব

পারি নি। অঞ্জলির উৎকণ্ঠা আকাশছোঁয়া। নীলকান্তকে তাক তবে ছুঁড়তুন প্রশ্নবাণ,—করেন কী ভদ্রলোক? ছেঁড়া পায়জামা বলা কোট দেখে সন্দেহ হচ্ছে!

—সন্দেহই স্বাভাবিক;—নীলকান্তর জবাবে রহস্য ঘনীভূত,—কারণ, আপাততঃ উনি কিছুই করেন না। পথে পথে ঘোরেন এইরকম। খেয়াল হলে স্লোগান দেন, জয় হিন্দ্!

বললাম,—ভালো খেয়াল। স্লোগানটিও সুন্দর। কিন্তু তবু, কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে সব কিছু আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, সেকেণ্ড্ লেফ্টেনাণ্ট্, জয় হিন্দ্—কিছুই যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—বুঝবেন।—জবাব এলো অপর দিক থেকে,—কিন্তু তার আগে ইন্দ্রজিৎ সিং-এর অতীত দিনগুলোর খানিকটা অন্ততঃ জানতে হবে।

বললাম,—খানিকটা কেন, অনেকটাই বলুন। শুনবো বলে প্রস্তুত।

—ইন্দ্রজিৎ সিংও প্রস্তুতই ছিলেন,—নীলকান্ত শেষ থেকে শুরু করেন কাহিনী,—কিন্তু কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল! ইংরেজ সৈন্যের অতর্কিত আঘাতে হঠাৎ বিধ্বস্ত হল তার বাহিনী। ইন্দ্রজিৎ ক্লান্ত-দেহে ভগ্ন-মনে ঘরে ফিরলেন।...ঘর বলতে সিঙ্গাপুর। পরিজনরাও ওখানে। স্ত্রী, দু'টি শিশু ও এক ভাইকে নিয়ে সংসার। ...ঐ সিঙ্গাপুর থেকেই নেতাজীর ডাকে সাড়া দেন তিনি। আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দেন।...কিন্তু সিঙ্গাপুরে ফিরে গিয়ে কী দেখলেন

তিনি ?···এইখানে একটু থামলেন নীলকান্ত। এক মুহূর্ত জিরিয়ে নিয়ে শুরু করলেন,—তিনি দেখলেন, সব শেষ। ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ আত্মীয়-পরিজন নিখোঁজ। শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে চুরমার সব কিছু। ইন্দ্রজিৎ তখন নতুন করে মণিপুর অভিযানের স্বপ্ন দেখলেন। সৈন্য-সংগ্রহে মন দিলেন। কিন্তু কে শুনবে পাগলের আহ্বান? যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। অগত্যা ইন্দ্রজিৎ একাই এগোলেন। মোইরাং এলেন আবার। এ-জায়গাটার সঙ্গে তাঁর অনেক স্বপ্ন জড়িয়ে এখানে ইংরেজদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করেছেন তিনি সৈন্য চালনা করতে করতে ভারতের স্বাধীনতা-স্বপ্ন দেখেছেন এদিকে ভারতও স্বাধীন হল. কিন্তু ইন্দ্রজিৎ এর পরিবর্তন হল না আর তয় মোইরাং আর না-ভয় চূড়াচাঁদপুরে হা মশাই তাকে দেখে গেল, সৈন্য-সংগ্রহে ব্যস্ত, নতুন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন নাকি। কী জানেন আপনাদের দেহেও লড়াইয়ের কথা মনে আসে ইন্দ্রজিৎ-এর ভাবেন, নতুন লোক রিক্রুট তো করি তারপর 'জয় হিন্দ্' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ি আবার

শুধালাম,—ইন্দ্রজিৎ সে হামেশাই বুঝি ঝাঁপান এইরকম· 'জয় হিন্দ্' বলেন?

—তা বলেন—নীলকান্তর সাফ জবাব,—এমন কি নিজের ভাইকেও রেহাই নেই।

—ভাই?—গোপালবাবু প্রশ্ন করেন এবার,—তিনি বেঁচে ছিলেন শেষ অবধি?

নীলকান্ত জানান,—হাঁ তিনিও আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। মোইরাং আসছিলেন ইন্দ্রজিৎ-এর পিছু পিছু। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ সেটা জানতেন না। যখন জানলেন, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। নতুন উৎসাহে সৈন্য 'রিক্রুট' করতে শুরু করেছেন তিনি

শুধালাম,—তারপর ?

নীলকান্ত জবাব দিলেন,—তারপর দু'ভাইতে দেখা মোইরাঙে। ছোট ভাই দলজিৎ অনেক চেষ্টা করলেন দাদাকে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু দাদার সেই এক কথা,—'জয় হিন্দ্'! অর্থাৎ, যাবে তো চলো; নতুন করে লড়াই শুরু করো আবার।…ঐ দলজিৎ-এর কাছ থেকেই এ-কাহিনী আমি শুনেছি। একবার মোইরাঙে ঘটনাচক্রে আলাপ তাঁর সঙ্গে।

বললাম,—ঘটনাচক্র আমাদের বেলায়ও। তা না হলে ইন্দ্রজিৎ সিং-এর মতো একটি চরিত্র মেঘের আড়ালেই থাকবার কথা।

—মেঘ! বলেই আকাশের দিকে তাকালেন নীলকান্ত। আমরাও তাকালাম। ওখানে লাল রঙের ঘনঘটা তখন। সূর্য-বিদায়ের মুহূর্তে যেন রক্তাভ আবিরের ছড়াছড়ি।

ভাবলাম, এখন আমাদের বিদায় নিতে হবে। চূড়াচাঁদপুর থেকে ইম্ফল—দীর্ঘ এই সাঁইত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে আবার।

পরদিন। পাড়ি আরও দীর্ঘ। ইন্দো-বার্মা রোড ধরে ভোর না হতেই অভিযান।

নীলকান্ত যথারীতি সঙ্গে। ইম্ফল থেকে আমাদের নিয়ে বেরিয়েছেন সেই সাত-সকালে।

শিক্ষা-বিভাগের জীপ; মণিপুর-উপত্যকা ধরে অশিক্ষিত জানোয়ারের মতো ছুটছে।

না ছুটলে নাকি উপায় নেই। ইম্ফল থেকে বার্মা-সীমান্ত অবধি দীর্ঘ সাতষট্টি মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সেদিনই আবার ফিরে আসা যাবে না।

ভাবলাম, ভালো। ছুটুক। তবে জানোয়ারের মতো পথ ছেড়ে বিপথে না যায়! আশেপাশে খাদ বা জল-জঙ্গল না থাকুক,

ক্ষেত-খামার এবং গাছপালা তো আছে। বামাল সমেত ফাঁদে ফেলার পক্ষে ওরাও যথেষ্ট।

এগোচ্ছিলাম দেখতে দেখতে। বেলা বাড়ছিল। হঠাৎ খোংজোম্ নামে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়াল গাড়ি। নীলকান্ত বললেন,—নামতে হবে। এইখানে।

—ইখানে?—সুধীরবাবুর মৃদু আপত্তি,—মুডে (মোটে) ত তেইশ মাইল আইছি। অবশ্য মাইল-স্টুন যদি মিছা (মিথ্যে) না অয় (হয়)।

বুঝলাম, ভূগোলের খাঁটি অধ্যাপক। মাইল-স্টোন দেখতে দেখতে আসছেন। সঠিক কিছু ভরসা না পেলে এখনই নামতে নারাজ।

কিন্তু না, নীলকান্তর অনুরোধে শেষ অবধি সবাইকে নামতে হল, এবং নেমে লাভও হল যথেষ্ট

খানিকদূর এগোতেই দেখি, টিলা একটি। অতি সুন্দর। লতাপাতার আড়ালে বিশ্বস্ত প্রহরীটি যেন।—দাঁড়িয়ে আছে, নিয়ত লক্ষ্য রাখছে পথের ওপর।

নীলকান্ত বললেন,—এখানেই: ঠিক এই পাহাড়টির পাদমূলেই—

শুধালাম,—কী?

—মেজর জেনারেল পাওনা লুটিয়ে পড়েছিলেন একদিন।

—পাওনা? কে তিনি?

—মণিপুরের গৌরব। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দেন।

—সে লড়াই বীরের লড়াই; মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শত্রুর মোকাবিলা। একটু থেমে আবার শুরু করেন নীলকান্ত,—১৮৯১ সাল। ইংরেজরা বর্মার পথ ধরে মণিপুরের দিকে এগোচ্ছে। আর এদিকে মেজর জেনারেল পাওনা রুখে দাঁড়িয়েছেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতা-

রক্ষায় বাধা দিচ্ছেন শত্রুদের। দু'পক্ষে তমুল লড়াই হল। পাওনার সৈন্যরা আঘাত খেল একের পর এক। কিন্তু তবু পিছু হটল না; পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করল না দুশমনদের।···পাওনা শেষ অবধি লড়ে গেলেন। এই পাহাড়টির পাদমূলেই মরতে মরতে অমর হলেন তিনি।

মনে পড়ল। এতক্ষণে :—হ্যাঁ, পাওনা নামটি আগেও শুনেছি। ইম্ফলে পাওনা বাজার রোড ধরে ঘুরেছিও কম নয়।

কিন্তু কোথায় ইম্ফল, আর কোথায় এই বুনো অপরিচিত পথ! —খোংজোম্ পেরিয়ে যেতে যেতে ভাবি। দীর্ঘ আরও পাঁচ মাইল পথ যেন চোখের পলকে পাড়ি দি।

পাল্লেল থেকে পথের চেহারা ভিন্ন, পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠে জীপ, এঁকেবেঁকে চলে।

শুনলাম, এ-জায়গাটিরও নাকি ঐতিহাসিক গুরুত্ব। স্বামী লক্ষ্মীনাথন-এর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এখানেই নাকি প্রথম মুক্তাঞ্চল গড়েন।

মনে হল, ঠিক জায়গাটি বেছে নিয়েছিলেন ওঁরা। দুর্গম ও সুরক্ষিত বুঝে উপযুক্ত অঞ্চলটিকেই মুক্ত করেছিলেন।

পাহাড়, শুধুই পাহাড় এদিকে। এ-পাহাড় বেয়ে এগোনো আর তরঙ্গ-সংকুল সমুদ্র ডিঙোন একই কথা। এর সামনে এসে শত্রুকে থমকাতেই হবে। মুখ থুবড়ে পড়ে-মরার ভয়ে স্তব্ধ হতেই হবে একবার।

এদিকে স্তব্ধ বুঝি আমরাও। বহুরূপী হিমালয়-সঙ্গীদের দেখে স্তম্ভিত।···কখনও ছায়া-ঢাকা পথ ধরে ক্লান্ত পথিকের মতো এগোচ্ছি; আবার কখনও উন্মুক্ত শিখর-বরাবর নিঃশঙ্ক অভিযাত্রীর মতো উঠছি। কখনও খাদ বেয়ে সরীসৃপের মতো, কখনও আবার বনপথ ধরে শ্বাপদের মতো ছুটছি আমরা।

পাল্লেল ছাড়িয়ে মাইল সাতেক এগোতেই প্ল্যাটফর্ম-মতো

একটি জায়গা। প্রায় গোটা মণিপুর-উপত্যকা এখান থেকে চোখে পড়ে।

আরও কয়েক মাইল এগোলে তেঙ্গ্‌নৌপল, ইন্দো-বার্মা রোডের সবচেয়ে উঁচু অঞ্চল। এইখান থেকে মণিপুর-উপত্যকা আরও স্পষ্ট, আরও মনোরম।

তবে উপত্যকার সবটুকু একসঙ্গে চোখে পড়ে না। জায়গায় জায়গায় মেঘ আছে বলে ছেঁড়া-ওড়নায়-ঢাকা রূপসীর মতো

তেঙ্গ্‌নৌপল থেকে মোরে—দীর্ঘ এই চব্বিশ মাইল পথ দুর্গম, আঁকাবাঁকা। এ-পথ ধরে চলা মানে, পাতাল থেকে স্বর্গে আসা-যাওয়া বার-কতক, একবার উৎরাই ধরে পাতালে নামা এবং পরক্ষণেই আবার চড়াই বেয়ে স্বর্গে ওঠা।

মোরে পৌঁছে মনে হল,—স্বর্গেও নয়, পাতালেও নয়, মর্ত্যেই আছি সরকারের শুল্ক-বিভাগের কর্মচারীরা পথ আগলে দাঁড়িয়ে

এই মোরেই হল ভারত-বার্মার সীমান্ত। এখানে খরস্রোতা ছোট্ট এক নদীর উপর সেতু আছে একটি: ভারত এবং বার্মাকে যুক্ত করেছে।

সেতুটির উভয় তীরে ঘন জঙ্গল। দেখতে ঠিক একই রকম।

ভাবলাম, যাবো নাকি? বার্মার দিকটা ঘুরে দেখে আসবো?

এদিকে শুল্ক-বিভাগের কর্মীরাও খুব সদয়। কেউ কেউ উপযাচক হয়ে আলাপ করলেন। ভুল হিন্দী আর ভাঙা ইংরেজী মিশিয়ে যা বললেন, তার মানে দাঁড়ায়,—বেশ তো! যান না একটু, দেখে আসুন। কেউ কিছু বলবে না।

যাবার উদ্যোগ করি শেষ অবধি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোপালবাবু বাধা দেন,—না, থাক। পারমিট ছাড়া যাওয়া ঠিক হবে না।

অগত্যা ফিরতে হল, বার্মার মাটিতে পা না দিয়েই।

ফেরবার পথে তেঙ্গ্নৌপল-এর কাছাকাছি একটি জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া। অবশ্য তখন দুপুর নেই আর ; তিনটে বেজে গেছে।

পরদিনও ঠিক তাই। উখরুল দেখে দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে বেলা প্রায় তিনটে।

অথচ খাবার ইচ্ছে ছিল না। কারণ, সকাল দশটায় ভুরি-ভোজন করেছি। নীলকান্তর বাড়িতে 'ব্রেক্‌-ফাস্ট্'-এর নামে যা খেয়েছি, তা'কে এক কথায় লাঞ্চ এবং ডিনারের সঙ্গম বলা যায়।

অসাধারণ বন্ধুবৎসল এই নীলকান্ত। মণিপুরে এসে অবধি অনুক্ষণ তাঁরই ছায়ায় আমরা। আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘুরছেন, দেখাচ্ছেন, বোঝাচ্ছেন সব কিছু। অথচ ক্লান্তি নেই ; বিরক্তি নেই এতটুকু। বরং সব সময় একটা সংকুচিত ভাব। না জানি কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমাদের !—ভেবে ভেবে যেন ভদ্রলোক সন্ত্রস্ত।

বার্মা-সীমান্ত থেকে ফিরছি, সেই একই সন্ত্রাস আর সংকোচ তাঁর চোখে-মুখে। হঠাৎ বললেন,—যদিও খুব কষ্ট হবে আপনাদের, খুব অসুবিধে হবে, তবুও—

—আমরা ভীষণ কৃতজ্ঞ ;—নীলকান্তকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে গোপালবাবু বলতে লাগলেন—কারণ, বন্ধু নীলকান্ত সিং যা করেছেন আমাদের জন্যে, যা যা করছেন, সচরাচর কেউ কা'রও জন্যে তা করে না।

বললাম,—ঠিক। শতকরা একশো ভাগ ঠিক।

—তবুও,—নীলকান্ত শুরু করেন আবার,—কাল সকালে দয়া করে যদি আমার বাড়িতে আসেন, ব্রেক্‌-ফাস্ট্ করেন একটু তো বড় খুশি হই !

বললাম,—বেশ তো ! যাবো।

গোপালবাবু, সুধীরবাবু এবং অঞ্জলিও সায় দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

নীলকান্ত জানালেন,—আমি নিজে যাবো। নিয়ে আসবো আপনাদের।

পরদিন। ঠিক এলেন তিনি; শিক্ষা-বিভাগের জীপটি সঙ্গে। আমাদেরই বরং বেরোতে দেরী হল। তাঁর বাড়ি পৌছুতে প্রায় ন'টা বাজল।

নীলকান্তর বাড়ির সঙ্গে মোইরাঙ্ কলেজের অধ্যক্ষ ইবোতোম্বির বাড়ির কোন মিল নেই। ইবোতোম্বিরটি যদি হয় খামার, নীলকান্তরটি তবে গ্রন্থাগার।

ঘরে ঢুকতেই দেখি, বই—শুধুই বই চারিদিকে। চকিতে একবার দেখে নিলাম, বাংলা বইও অনেক।

ভালো করে দেখবার সময় ছিল না কারণ, নীলকান্তর অভ্যর্থনার ঠ্যালায় সবাই অস্থির। —

—আসুন, দয়া করে এদিকে আসুন আপনারা।—বলতে বলতে বই-ভর্তি বড় একটি ঘর পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন তিনি। আমাদের আহ্বান জানালেন,—কই! আসুন।

আমরা তাড়াতাড়ি তাঁকে অনুসরণ করলাম। পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে বসলাম গিয়ে।

সেখানেও বই। সামনে, পেছনে, চারিদিকে। তবু জিনিসের মধ্যে ছোটোখাটো শো-কেস একটি, রঙ্-বেরঙের পুতুলে ভরা।

এবারে বই নয় আর, পুতুলগুলোকেই দেখছিলাম। নীলকান্ত সেটা লক্ষ্য করে বললেন,—দেখছেন? নানা দেশের সব পুতুল আছে এখানে।

শুধালাম,—খুব ঘুরেছেন বুঝি? দেশ-বিদেশ, নানা জায়গায়?

—তা ঘুরেছি;—বলেই শো-কেস খুলে একে একে পুতুলগুলোকে বের করলেন তিনি। বলতে লাগলেন —দেখুন, এই হল লণ্ডনের 'ড্যান্সিং ডল', এই প্যারিসের 'মিউজিক মাস্টার', এই 'রাশিয়ান ব্যালে-আর্টিস্ট', আর এই 'সুইস্ স্কেইটার'।

বললাম,— অদ্ভুত ! সত্যি অদ্ভুত !

অঞ্জলি বললে,—খুব বুঝি পুতুল কেনেন আপনি ? যেখানে যান সেখানেই ?

নীলকান্ত জবাব দিলেন,—হ্যাঁ, ঠিক তাই। পুতুলই কিনি ; বিদেশ-ভ্রমণের 'টোকেন' হিসেবে। কম পয়সায় আর কী-ই বা কিনবো !

—যা কিনেছেন, তা'ই বা কম কী।—গোপালবাবু কথা বললেন এতক্ষণে,—ঘুরেছেন তো নেহাৎ কম নয় !

নীলকান্ত কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই অঞ্জলির মন্তব্য,—অথচ দেখুন, কিছুই জানতাম না আমরা ! পুতুল নিয়ে কথা না উঠলে কোনদিনই হয়তো জানতাম না।

সুধীরবাবু সায় দিলেন,—হ জাননের (জানবার) আর জু (উপায়) কই !

এদিকে কথা বলতে বলতে খেয়ালই করি নি ; হঠাৎ দেখি, পাঁচ-সাত জনের এক মিছিল ; আমাদের সামনে। পুরোভাগে মণিপুরী এক ভদ্রমহিলা ; হাতে খাবারের বোঝা।

দেখলাম, অন্যদের হাতেও রাশি রাশি খাবার। সবাই এমন ভাবে দাঁড়িয়ে যে, মনে হচ্ছে, দেব-মন্দিরে এসেছেন ; ভোগ দেবেন

খাবারগুলো আমাদের ঠিক পাশেই বড় একটা টেবিলে রাখা হল। নীলকান্ত মণিপুরী ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন,—আমার স্ত্রী, মিসেস সিং

সবাই উঠে দাঁড়ালাম। নমস্কার করলাম ওঁকে।

উনি প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন,—খুরুমজারী।

এতক্ষণে বছর চৌদ্দ বয়সী একটি ছেলে সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।—

—খুরুমজারী ! খুরুমজারী ! খুরুমজারী !—আলাদা আলাদা করে সকলকে নমস্কার করছে।

শুধালাম,—কে ও?

নীলকান্ত বললেন,—আমাদের বড় ছেলে, বিজয়।

মিসেস নীলকান্তও সায় দিলেন,—আচ্ছুম্বা (ঠিক)। মাচ্ছা নিপা (ছেলে)।

সেদিন আরও অনেক কথা হল ওঁদের সঙ্গে। বাংলা, ইংরেজী, মণিপুরী ও হিন্দীর চৌমাথায় দাঁড়িয়ে অনেক গল্প হল। ছবি তোলা হল কয়েকটা। কিন্তু সে সব থাক। খাবারের ফিরিস্তিটা দেয়া যাক বরং। সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলা যাক যে, লুচি তরকারী সুজি মিষ্টি মাছ ডিম ফল ইত্যাদি মিলিয়ে যা ওঁরা খাইয়েছিলেন, তাকে ব্রেক-ফাস্ট্ বলে না, বলে লাঞ্চ এবং ডিনারের সঙ্গম।

সকাল দশটা নাগাদ এত কিছু খেয়ে দুপুরে খাবার ইচ্ছে ছিল না। উখরুল দেখে ফেরার পথে আদৌ না খেলেও চলতো।

কিন্তু গোপালবাবু নাছোড়বান্দা। বললেন,—দারুণ ঠাণ্ডা উখরুলে। কিছু খেয়ে গরম হও শিগ্গীর।

উখরুল ঠাণ্ডা ঠিকই। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ছ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচুতে। আবহাওয়াও অনেকটা দার্জিলিং-এর মতো। কিন্তু তাই বলে 'দারুণ' কিছু নয়।

উখরুলের কথা মনে পড়ে। অতি সুন্দর শৈল-নিবাস একটি। ইম্ফল থেকে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ। প্রথমে প্রায়-সমতল এবং পরে আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই ধরে যাই ওখানে। তাঙ্খুল নাগাদের দেখি, আর দেখি পাহাড়ের গায়ে গায়ে অদ্ভুত সব লিপি।

উখরুল অঞ্চলটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। ঢেউ-খেলানো পাহাড়, ঘন সবুজ বন আর রঙ-বেরঙের ফলফুলে মিলিয়ে অপরূপ। এমন জায়গায় এসেই ছুটলে হয় না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হয় অন্ততঃ কিছুদিন।

কিন্তু আমাদের হাতে সময় অল্প। তাই বসার চেয়ে ছোটাকেই

আমরা মূলমন্ত্র করেছি। উখরুলে পা পড়তে না পড়তেই ড্রাইভারকে বলেছি,—ইম্ফল। ধুনা চাল্লু (জোরে চলো)।

তাই করল সে। যথাসম্ভব জোরেই চলল। কিন্তু পথ দুর্গম, ভীষণ আঁকাবাঁকা। তাই খুব একটা লাভ হল না ওতে। সন্ধ্যের আগে ইম্ফল পেঁছুন গেল না।

অথচ ঠিক ছিল, সময় মতো পেঁছুলে সেদিনই আমরা 'জওহরলাল নেহরু মণিপুর ড্যান্স্ অ্যাকাডেমী' দেখতে যাবো।

অগত্যা পরদিন গেলাম ওখানে। ড্যান্স্ অ্যাকাডেমীতে যখন পেঁছুলাম, তখন বেলা প্রায় চারটে।

সুন্দর পরিবেশ। ঝকঝকে তকতকে অ্যাকাডেমী-ভবন। সেক্রেটারী রাজকুমারী বিনোদিনী দেবী অভ্যর্থনা করলেন আমাদের।

ভদ্রমহিলা মণিপুরী। কিন্তু কথা বলছিলেন পরিষ্কার শুদ্ধ বাংলায়।

অবাক লাগল। তাঁর ঘরে বসে গল্প করার সময় এ-নিয়ে প্রশ্নও তুললাম একবার।

বিনোদিনী হেসে জবাব দিলেন,—কেন? মণিপুরীর কি বাংলা বলতে নেই?

বললাম,—একশোবার আছে।

—তবে?

—বাঙালীরও আছে অবাক হবার অধিকার।

—কেন?

—আপনার বাংলা হুবহু বাঙালীর মতো বলে।

—ও! এই কথা। আসলে কী জানেন, প্রায়শ্চিত্ত করেছি। বাংলাটা শিখে ফেলেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে।

শুধালাম,—প্রায়শ্চিত্ত? মানে?

—মানে,—বিনোদিনী বলতে লাগলেন। আমার বাবা মণিপুর-মহারাজা রবীন্দ্রনাথকে একদিন অপমান করেন। কবি

মণিপুর আসতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বাবা দেন নি। তাই শেষ অবধি প্রায়শ্চিত্তটা আমিই করলুম। শান্তিনিকেতন কলা-ভবনে গেলুম পড়তে। হ্যাঁ, বাংলা আমি ওখানেই শিখেছি।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হঠাৎ বুঝি সংকুচিত হলেন বিনোদিনী। তাঁর স্বরূপ গৌর মুখে কে যেন আবির ছিটিয়ে দিল।

গোপালবাবু সেটা লক্ষ্য করে থাকবেন। হঠাৎ বললেন—না না, রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। ও নিয়ে সংকোচের কিছু নেই। কারণ, মণিপুরকে যা দেবার দূরে দাঁড়িয়েও তা উনি ঠিকই দিয়েছেন।

বিনোদিনী বললেন,—আপনি 'চিত্রাঙ্গদা'র কথা বলছেন?

গোপালবাবু জবাব দিলেন,—হ্যাঁ, ঠিক তাই 'চিত্রাঙ্গদা'র কথাই।

—যখন বললেন তো বলি,—বিনোদিনী সংকোচের ভাবটা কাটিয়ে উঠেছেন এতক্ষণে,—ঐ চিত্রাঙ্গদার নাচ তো বটেই, গানগুলোও আমার দারুণ প্রিয়। কয়েকটি গান অনুবাদ হয়েছে এরই মধ্যে। খোদ মণিপুরীতে।

নীলকান্ত বললেন,—এরও দরকার ছিল। কারণ, অপমানিত কবি কাছাড় থেকে ফিরে গিয়েছিলেন একদিন। খোদ মণিপুরে এসে নাচ দেখবার সুযোগ পান নি।

শুধালাম,—কাছাড়ে নাচ দেখেছিলেন কবি? আসল মণিপুরী নাচ?

নীলকান্ত বললেন,—দেখেছিলেন। তবে আসল কিনা জানি না। কারণ, কবির ধারণা ছিল, আসল জিনিসটি দেখতে হলে খোদ মণিপুরে আসা চাই।

বিনোদিনী সায় দিলেন—হুঁ, তাই বটে! তবে তখনও অবধি এক জায়গায় সব জিনিস দেখবার সুযোগ ছিল না। সেই সুযোগ হল পরে, এই ড্যান্স্ অ্যাকাডেমী যখন গড়ে উঠল তখন।

এইবার অ্যাকাডেমী নিয়ে কথা উঠল। একে একে অনেক কিছু বললেন বিনোদিনী। নীলকান্তও যোগ দিলেন। সে-সব জড়ো করলে অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়।—

মণিপুর আসলে নাচের দেশ, গানের রাজ্য। এখানকার ছেলে বুড়ো যুবক যুবতী,—সকলেরই নাচ-গানের সঙ্গে কিছু না কিছু যোগ আছে। তবে আগে এ-রাজ্যিতে নিয়মিত নাচ শেখাবার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। লোকে গুরুর বাড়ি গিয়ে নাচ শিখত। আবার গুরুরাও যখন-তখন শেখাতেন না, যাঁকে-তাঁকে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। হয় কোনো ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে, আর না-হয় রাজা-উজীরদের আমন্ত্রণে নাচের তালিম দিতেন। ফলে, জনসাধারণ সুযোগ পেত কমই, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাবে ইচ্ছে থাকলেও অনেকে নাচ শিখতে পেত না।

শিখবার সুযোগ পেল এই সেদিন, জওহরলাল নেহরুর প্রচেষ্টায়।

১৯৫২ সাল। প্রথমবার মণিপুর-দর্শনে এলেন নেহরু। মহারাজা বোধচন্দ্র সিং প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনার বিরাট আয়োজন করলেন। রাজপ্রাসাদ জমজমাট। রাসনৃত্য হবে। রাজ-অতিথি জওহরলাল দেখবেন।

যথাসময়ে রাস শুরু হল। জ্যেষ্ঠা রাজকন্যে কৃষ্ণের ভূমিকায়। অপরূপ তাঁর নৃত্যভঙ্গী। কলাকুশলের দিক দিয়ে রাধা এবং সখীরাও কম যান না। রাসের স্বপ্নরঙীন বর্ণাঢ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে সবাই ব্যস্ত।

নেহরু অবাক হলেন। রাসোৎসবে তিনি ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাধুর্যের, রূপের সঙ্গে অপরূপের সম্মিলন দেখলেন যেন। ভাবলেন, এ-জিনিস ভারতের একেবারে নিজস্ব। একে ধরে রাখতে হলে সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান চাই, উপযুক্ত উদ্যোগ-আয়োজন চাই।…ব্যস, সেই থেকেই মণিপুর ড্যান্স্ অ্যাকাডেমী গড়ার পরিকল্পনা তাঁর

মাথায় এলো।···কেউ কেউ বললেন, অ্যাকাডেমী শিলঙে গড়ে তোলা উচিত।··নেহরুর আপত্তি,—না, শিলঙে নয়। মণিপুরী নাচ শিখতে হবে মণিপুরেরই পারিপার্শ্বিকে।

নেহরু প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে বারো হাজার টাকা দিলেন। মণিপুর সরকারও সাহায্য করলেন সাধ্যমত। ১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল বাবুপাড়া থিয়েটার হল ভাড়া করে 'ড্যান্স্ কলেজ'-এর কাজ শুরু হল।

তারপর মণিপুর সরকার জমি দিলেন। দিল্লীর সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমীর উদ্যোগে কলেজ এর নিজস্ব ভবন গড়ে উঠল। নেহরুর মৃত্যুর পর তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে কলেজ-এর নতুন নামকরণ হল 'জওহরলাল নেহরু মণিপুরী ড্যান্স্ অ্যাকাডেমী'।

কালক্রমে মণিপুরের উল্লেখযোগ্য সব রকম নৃত্যশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা হল এখানে। রাস, লাই-হারৌব ও সংকীর্তন থেকে শুরু করে লোকনৃত্য এবং এমনকি উপজাতীয়-নৃত্যও বাদ গেল না।

বিনোদিনীকে শুধিয়েছিলাম,—এখানকার শিক্ষকদের সম্পর্কে খুব কৌতূহল আমার, কিছু বলবেন?

—শিক্ষক নন শুধু, ওঁরা গুরু।—জবাব দিয়েছিলেন বিনোদিনী,—প্রতিভার এক একটি খনি। ওঁরা অনেকেই আসেন এখানে। নাচ শেখান। পদ্মশ্রী গুরু আমুবি সিং, অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী গুরু আতোম্বা সিং মাঝে মাঝে আসেন। ভারত-বিখ্যাত শিল্পী প্রিয়গোপালকে সাহায্য করেন।

নীলকান্ত বলেছিলেন,—প্রিয়গোপালই এখানকার অধ্যক্ষ। যদি আলাপ করতে চান তো বলুন, নিয়ে যাচ্ছি। খুব সম্ভব এখনও আছেন তিনি, অ্যাকাডেমীতে, নিজের ঘরেই।

বিনোদিনী বললেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আছেন, একটু আগেও দেখেছি।

এবার উঠলাম আমরা। প্রিয়গোপাল-সন্নিধানে যাবো বলে প্রস্তুত হলাম।

বিনোদিনী দুঃখ করলেন,—কিন্তু আমার কথা যে শেষ হল না!

বললাম,—আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে!

বিনোদিনী বললেন,—গেলে লাভ হ'ত আমারই; কিন্তু উপায় নেই। পাঁচটায় এক জায়গায় যাবার কথা।

বললাম,—তবে তো দেরী করে দিলাম!

—করেছেন, বেশ করেছেন।—হেসে জবাব দিলেন বিনোদিনী,—আমার বাড়ি এসে একদিন এর চেয়েও বেশি দেরী করিয়ে দিন। খুশি হবো।

—কিন্তু হাতে যে সময় অল্প!—এবার দুঃখ করার পালা গোপালবাবুর।

বিনোদিনীও ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন,—তা হোক। সময়টাকে টেনে একটু বড় করে নেবেন। দয়া করে পরশু সকালে আসবেন আমার বাড়িতে। চায়ের নিমন্ত্রণ রইল।

এবার আর 'না' বলার জো নেই। বিনোদিনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রিয়গোপাল-এর ঘরের দিকে এগোলাম। সামনেই ঘর। বিনোদিনীর থেকে কুড়ি গজও দূরে নয়।

ঘরে ঢুকে আমরা অবাক। ধোঁটা-তিলক-কাটা, প্রায় বৃদ্ধ, অতি সাধারণ একটি লোক চুপচাপ বসে। আমাদের দেখে ঢুল ঢুল চোখে একবার তাকালেন। বসতে বললেন ইঙ্গিতে।

ভাবছিলাম, ইনিই কি অধ্যক্ষ? ভারত-বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী প্রিয়গোপাল? ··ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল যেন। একমাত্র নীলকান্ত ছাড়া সবাই আমরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম।

এদিকে লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছেন এতক্ষণে। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে ফাঁকা চেয়ারগুলো দেখিয়ে আবার আমাদের বসতে বলছেন।

বসলাম। নীলকান্ত ইংরেজীতে পরিচয় করিয়ে দিলেন,—ইনি অধ্যক্ষ প্রিয়গোপাল। আর এঁরা—বলেই এত দীর্ঘ ফিরিস্তি দিলেন

আমাদের সম্পর্কে যে, প্রিয়গোপাল শেষ অবধি শুনছেন বলে মনে হল না। বরং মনে হল, সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক তিনি; এমন কিছু ভাবছেন, যা'র সঙ্গে আমাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

অগত্যা আলাপ জমাবার শেষ উদ্যোগ করলেন নীলকান্ত। প্রাণপণে প্রিয়গোপাল-এর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে বললেন,—এঁরা 'মণিপুরী ড্যান্স্' সম্পর্কে খুব আগ্রহী। কিছু জানতে চান।

—জানবার তো কিছু নেই!—ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে প্রিয়গোপাল-এর সাফ জবাব,—সবই উপলব্ধি করার। হৃদয় দিয়ে অনুভব করার।

গোপালবাবু সায় দিলেন,—ঠিক। ঠিক কথা। শিল্পের মূল কথাই হল এই।

প্রিয়গোপাল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাধা পড়ে। দু'টি তরুণ এসে অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে তার সামনে দাড়ায়। ওদের পরনে চোঙা প্যাণ্ট্ ও নক্শি কাটা হাওয়াই সার্ট।

প্রিয়গোপাল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন তরুণ দুটিকে দেখে। মনে হল, খোদ মণিপুরী ভাষায় দারুণ গাল-গালাজ করলেন।

তরুণরা কিছুই বলল না। মাথা নীচু করে সব শুনল। ধীরে ধীরে আবার চলে গেল।

ওরা চলে যেতেই প্রিয়গোপাল অন্য মানুষ। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—কী? বুঝলেন কিছু?

বললাম,—না।

—কী করে আর বুঝবেন!—প্রিয়গোপাল নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দেন যেন,—মণিপুরী নাচ যে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তা বাইরে থেকে এসে জানবেন কী করে?

শুধালাম,—ছেলে দু'টি কি শিক্ষার্থী? ড্যান্স্ কলেজে নাচ শিখছে?

প্রিয়গোপাল রাগে গজ গজ করতে করতে জবাব দিলেন,—শিক্ষার্থী নামেই। আসলে কলেজে ওরা আসে ঢং দেখাতে। ইয়ার্কি মারতে।

প্রশ্ন করলাম,—কেন? কিছু করেছে ওরা?

—করে নি তো শুধু শুধু ওদের বকবো?—বলেই প্রিয়গোপাল এমনভাবে তাকালেন আমার দিকে যে, মনে হল, অন্যায়টা আমিই করেছি।

—ওদের পোশাক-আশাক দেখেও বুঝলেন না, রোগ কোথায়? —একটু থেমে প্রিয়গোপাল শুরু করেন আবার,—চোঙা প্যাণ্ট্ আর নক্‌শি-কাটা হাওয়াই সার্ট পরে কি সংকীর্তন নাচ হয়?

—তা কী করে হবে!—এবার নীলকান্ত জবাব দিলেন আমাদের হয়ে,—সংকীর্তনে ধুতি চাই।

—শুধু চাই নয়, আলবত চাই।—প্রিয়গোপাল বলতে লাগলেন, —পোশাকের সঙ্গে দেহের এবং দেহের সঙ্গে মনের মিল থাকা চাই। না হলে সত্যিকারের নাচ হয়? কখনও হয়েছে?

বললাম,—শুধু নাচ কেন, মন তৈরী না হলে সব শিল্পই অর্থহীন।

প্রিয়গোপাল বললেন,—যা বলেছেন! অথচ এই সহজ কথাটা ছাত্রদের আমি বোঝাতে পারি নে। ওরা সংকীর্তনের সময় সাহেবী পোশাক পরবে। রাস-এর আগে লুকিয়ে সিগারেট খাবে।

শুধালাম,—আজ বুঝি সংকীর্তন ছিল ওদের?

প্রিয়গোপাল জবাব দিলেন,—হ্যাঁ, ছিল। আমি আড়াল থেকে দেখে ওদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। পোশাক নিয়ে বলছিলাম এতক্ষণ।

গোপালবাবু বললেন,—ওরা বিনয়ী বলতে হবে। চুপচাপ শুনে গেল। টুঁ শব্দটি করল না।

—শব্দ করলে বরং খুশি হতাম।—প্রিয়গোপালের জবাবে বিরক্তি —আসলে ওরা কী ধাঁচের জানেন? শব্দও করবো না, পোশাকও ছাড়বো না।...রাসও করবো, সিগারেটও খাবো।

এবার সবাই আমরা একসাথে হেসে উঠলাম ; এবং এমনকি প্রিয়গোপালও যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে।

হাসির বেগ খানিকটা কমলে অঞ্জলি প্রশ্ন করল শিল্পীকে,—শুনেছি, পৃথিবীর বহু দেশে আপনি ঘুরেছেন। মণিপুরী নাচ দেখিয়েছেন বহু জায়গায়। আচ্ছা, বিদেশ-ভ্রমণ করে কী ধারণা হয়েছে আপনার ? মণিপুরী নাচ সকলেরই খুব পছন্দ ?

—নিশ্চয় !—অদ্ভুত এক প্রশান্তি ফুটে ওঠে প্রিয়গোপাল-এর চোখে-মুখে,—সকলেরই পছন্দ। আর কেনই বা হবে না ? শিল্প রসোত্তীর্ণ হলে তা দেশকালের বাধা ডিঙোতে বাধ্য।

গোপালবাবু সায় দিলেন,—ঠিক, ঠিক।

—একবার কী হয়েছিল জানেন ?—প্রিয়গোপাল উচ্ছ্বসিত এবার,—নিউইয়র্ক শহরে ফাংশান করছি। রাসনৃত্য চলছে। আমি শ্রীকৃষ্ণ।...হঠাৎ এক 'অ্যাগনস্টিক' গ্রীনরুমে ছুটে এলেন। 'গড্ গড্' বলে জড়িয়ে ধরলেন আমায়। যত বলি, আমি 'গড্' নই, ড্যান্সার প্রিয়গোপাল, ততই ভদ্রলোক চীৎকার করেন, 'গড্ গড্'। ..শেষকালে অনেক কষ্টে রেহাই পাই সেবার। রাসনৃত্যের বাকী অংশটুকু সেরে গ্রীনরুমে এসে শুনি, ভদ্রলোক নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়েছেন : বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেবার কথা ভাবছেন।

বললাম,—আশ্চর্য !

প্রিয়গোপাল বললেন,—না না, এর চেয়েও অনেক আশ্চর্যের আমি সাক্ষী। কিন্তু সে-সব থাক। ডান্স্ অ্যাকাডেমী দেখবেন, চলুন !

চললাম। প্রিয়গোপাল-এর পিছু পিছু। ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর পেরোলাম একটা। দেখতে দেখতে এসে ঢুকলাম মাঝারি আকারের এক 'হল্'-এ। স্টেজ আছে ওখানে, দর্শক-আসনও আছে। সুন্দর সুদৃশ্য হল।

প্রিয়গোপাল বললেন,—দেখুন ! এখানেই 'ফাংশান' হয় আমাদের। অ্যাকাডেমীর যা কিছু 'গেদারিং' সব হয়।

গোপালবাবু 'হল' দেখে খুব খুশি। বললেন,—কী সুন্দর ব্যবস্থা আপনাদের! কী চমৎকার আয়োজন! কিন্তু দুঃখ রইল, 'ফাংশান' দেখতে পেলাম না।

প্রিয়গোপাল বললেন,—'ফাংশান' না দেখেন তার 'রিহার্সাল' দেখবেন। ছেলেমেয়েরা এখনও বোধ করি আছে। চলুন।

চললাম আবার। 'হল' থেকে বেরিয়ে আবার 'করিডোর' ধরলাম।

খানিকদূর যেতেই ছোট ছোট ঘর কয়েকটা। বাঁ পাশে আমাদের। আবার ডান পাশেও। মাঝখানে ঘাসে-ঢাকা উঠোন।

প্রিয়গোপাল ঘরগুলোকে দেখিয়ে বললেন,—এই হল আমাদের 'ক্লাশ-রুম'।

শুধালাম,—'ক্লাশ-রুম'? খুবই ছোট তাহলে! ছাত্রছাত্রীর ভিড় নিশ্চয় কম?

প্রিয়গোপাল সায় দিলেন,—ঠিক ধরেছেন। ভিড আমরা বাড়তে দিই না। 'কোয়ান্টিটি' নয়, 'কোয়ালিটি'র ওপর জোর দি।

গোপালবাবু খুব খুশি এ-কথায়। বললেন,—ঠিক করেন। শিল্পের জগতে 'কোয়ালিটি'ই হল আসল।

—আসল-নকল জানি নে,—প্রিয়গোপাল-এর ক্ষোভ আকাশ-ছোঁয়া,—তবে 'কোয়ালিটি' আর থাকছে না মশাই। সব এসে জুটছে 'ক্যারিয়ার'-এর ফিকিরে।—

বলতে বলতে একটি লোকের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। কী যেন নির্দেশ দিলেন।

আমরা একটি ফাঁকা ঘরে গিয়ে বসলাম। মিনিট চার-পাঁচেকের মধ্যেই ঐ লোকটি কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে ডেকে নিয়ে এলেন। সঙ্গে মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলা।

প্রিয়গোপাল বললেন,—ওরা রাসনৃত্য দেখাবে আমাদের। 'স্ট্যাণ্ডার্ড' কত নেমে গেছে, তা দিব্যি বুঝিয়ে দেবে।

প্রিয়গোপাল-এর এই উক্তিতে ক্ষোভ এ দিলেন,—ইনিই গৃহস্বামী। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা সামনে বলেই আমরা 'হ্যাঁ-না' ।

এদিকে দেখতে দেখতে হারমোনিয়াম্ এবং করজোড়ে দাঁড়িয়ে আসে। রাসনৃত্য শুরু হয়। মাঝবয়সী ভদ্রমহিলাটি হা—খুরুমজারী। বাজিয়ে গান ধরেন। একটি ছাত্র করতাল হাতে নেয়; অ. লোকটি ছাত্রছাত্রীদের ডেকে এনেছিলেন, তিনি বাজান খোল।

বছর চোদ্দ বয়সী একটি মেয়েকে মাঝখানে রেখে কয়েকজন তরুণী নাচ শুরু করে প্রথমে তারপর ছেলেরাও যোগ দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দিব্যি জমে ওঠে আসর।

কিন্তু প্রিয়গোপাল যেন খুশি নন পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন, আর থেকে থেকে বিরক্তি প্রকাশ করছেন।

হঠাৎ দারুণ বেগে উঠলেন তিনি,—কেইদৌরা (ব্যাপার কী) ?

ছাত্রছাত্রীরা মুহূর্তের মধ্যে নাচ থামাল। স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে গেল সব।

প্রিয়গোপাল আবার হাঁক দিলেন,—এই ওযারা (আমি ক্লান্ত)—বলেই শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় যে নেমেছিল তার খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে ধমকালেন,—কেইদৌরা ?

ব্যাপার দেখে আমরা রীতিমত অপ্রস্তুত। কী করবো, কী বলবো, কিছুই ঠাওর করতে পারছি না। এমন সময় হঠাৎ দেখি, প্রিয়গোপাল নিজেই নাচ শুরু করেছেন। হাতে-কলমে তালিম দিচ্ছেন ছাত্রদের।

আমরা অবাক। বলতে কী, নাচের বয়স প্রিয়গোপাল-এর নেই। রোগা, ছোটোখাটো মানুষটি। বয়সের ভারে আরও যেন খাটো হয়েছেন। কিছুটা ঝুঁকে পড়েছেন সামনের দিকে।—

কিন্তু তাতে কী! তদ্গত হয়ে নাচ শুরু করলেন প্রিয়গোপাল। চোখে-মুখে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দেবোপম এক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুললেন।

গোপালবাবু 'অভিভূত। সময়ের রথে চড়ে ধীরে ধীরে। পছু আপনাদের! দেখতে দেখতে জয় সিং-এর স্বর্ণযুগে যেন ফিরে দেখতে পেয়ে হল, রাস দেখছি, মহারাস। দিব্যকান্তি নয়ন-নিনৃত্যদোদুল শ্রীকৃষ্ণ একেবারে সামনেই।

খানিকক্ষণ বাদে নাচ থামালেন প্রিয়গোপাল। হাঁপাতে লাগলেন।

গোপালবাবু এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। বললেন,—এইবার বুঝেছি, 'অ্যাগ্‌নস্টিক' কেন 'গড্ গড্' বলে চীৎকার করেছিল।

—আমি গড্ নই, ড্যান্সার প্রিয়গোপাল —রসিকতা করলেন অধ্যক্ষ, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হল, শিল্পীর স্বর্গলোক থেকে আবার তিনি মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন আর্টিস্ট্ থেকে প্রিন্সিপ্যাল হয়ে উঠলেন আবার।

সেদিন 'ড্যান্স্ অ্যাকাডেমী' থেকে বেরোতে প্রায় সন্ধ্যে। নীলকান্ত বললেন,—যাক, সময়মতোই বেরিয়েছি। 'সংকীর্তন ড্যান্স্' এখনও হয়তো শুরু হয় নি।

শুধালাম,- সংকীর্তন? সে আবার কোথায়?

নীলকান্ত বললেন,—আগে তো চলুন। তারপর মালুম হবে

চললাম অগত্যা। বিনা বাক্যব্যয়ে। গাড়ি বীর টিকেন্দ্রজিৎ রোড হয়ে এগোল। সরু এবড়ো-খেবড়ো একটা পথ ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল।

খানিকদূর ছুটে মোড় ফিরল একবার। পশ্চিমদিক বরাবর খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

নীলকান্ত বললেন,—আসুন! অনুগ্রহ করে নামুন এইবার।

নামতে গিয়ে দেখি, আরও দু'-তিনটে গাড়ি। আশেপাশে দাঁড়িয়ে। খুব সামনেই বিশিষ্ট মণিপুরী একজন; করজোড়ে আমাদের অভ্যর্থনা করছেন।

নীলকান্ত সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিলেন,—ইনিই গৃহস্বামী। এঁরই বাড়িতে সংকীর্তন হচ্ছে আজ।

গৃহস্বামীটি বিনয়ের অবতার। ঠিক তেমনি করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বার বার স্বাগত জানিয়ে বলছেন,—খুরুমজারী! খুরুমজারী!

আমরাও পাল্টা স্বাগত জানাই। প্রত্যভিবাদন করে বলি,—খুরুমজারী!

নীলকান্ত চলতে শুরু করেছেন এতক্ষণে। গৃহস্বামীর সঙ্গে কুশল-বিনিময় করে সংকীর্তন-সভার দিকে এগোচ্ছেন।

এই নীলকান্ত মানুষটি সত্যি অদ্ভুত। গোটা মণিপুর যেন তাঁর নখদর্পণে। তামাম মণিপুর তাঁর বন্ধু। 'ড্যান্স্ অ্যাকাডেমী', মণিপুর সাহিত্য পরিষদ, হোটেল, স্কুল, কলেজ—সব কিছুর সঙ্গেই কোনো না কোনোরকমভাবে তিনি জড়িত। এমনকি 'কালচারাল ফোরাম',—মণিপুরের বুদ্ধিজীবীদের মিলনকেন্দ্র—যা নাকি আজ সকালে দেখেছি, তা'রও কী এক গুরুত্বপূর্ণ পদে নাকি তিনি অধিষ্ঠিত। এখানে এসে আবার দেখি, সংকীর্তন-সভার উদ্যোক্তাটিকে তিনি আগে থাকতেই চেনেন।

তাড়াতাড়ি এগোই আমরা। উদ্যোক্তার অনুরোধে নীলকান্তকে অনুসরণ করি।

বাড়ি ঢুকে দেখি, আসর জমজমাট। উঠোন-ভর্তি লোক। পুবদিকে নাটমণ্ডপের মতো ঘর একটি। সংকীর্তন-শিল্পীরা ওখানে পোশাক-আশাক নিয়ে তৈরী হচ্ছেন। উঠোনের মাঝখানে সামিয়ানা টাঙানো। তলায় গিজ গিজ করছে লোক। সামিয়ানার চূড়া-বরাবর খানিকটা মাত্র জায়গা ফাঁকা। আসল-সংকীর্তনের জন্যে বরাদ্দ।

আমরা উত্তরদিকের একটি ঘরে বসলাম। ঠিক ঘর নয়, সেটিও মণ্ডপমতো দেখতে।···কিছুক্ষণ বাদে গৃহস্বামী এলেন। অদ্ভুতরকম সুস্বাদু কিছু পানের মশলা দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের।

ওদিকে সংকীর্তন শুরু হয়েছে। জনা বারো-চৌদ্দ ভক্ত শিল্পী আসরে এসে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ওদের পরনে ধবধবে সাদা ধুতি, মুখে ফোঁটা-তিলক, গলায় কণ্ঠী, হাতে করতাল।

প্রথমে ওঁরা বন্দনা করলেন দেবদেবীকে এবং তারপর সভায় আগত দর্শকবৃন্দকে। তারপর আকুল প্রার্থনা চলল খানিকক্ষণ। ভক্ত শিল্পীরা আত্ম-নিবেদনের মধ্য দিয়ে যেন মহিমময় হয়ে উঠলেন।

প্রার্থনার পর করতাল-বাদন। প্রথমে ধীর মন্দাক্রান্তা লয়ে; এবং তারপর ক্রমশঃ দ্রুত। করতাল বাজাচ্ছেন শিল্পীরা; আর অদ্ভুত এক বৃত্ত রচনা করে ঘুরছেন। করতালের তাল যেমন দ্রুত হচ্ছে, ওঁদেরও ঘোরার গতি তেমনি বাড়ছে।

খানিকক্ষণ এইভাবে চলবার পর আবার প্রার্থনা-সঙ্গীত শুরু হল। এবার আর সবাই একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা। একজন সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেন তো অন্যরা তন্ময় হয়ে তাঁকে তারিফ করেন। হাতের মুদ্রা এবং মুখচোখের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন।

যিনি গাইছেন, তাঁর যেন ভ্রূক্ষেপই নেই কোনোদিকে। চোখ বন্ধ, আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে এক একবার। কান্নার ভারে দেহ যেন এলিয়ে পড়ছে।

দেখলাম, সত্যি কাঁদছেন কেউ কেউ। কৃষ্ণপ্রেমে গদগদ হয়ে মাটিতে এক একবার লুটিয়ে পড়ছেন। সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম সেরে উঠছেন আবার। আবার পড়ছেন।

গোপালবাবু বললেন,—নিজেকে এভাবে কষ্ট দেয়া কেন? ভক্তির মূল কথা তো শুদ্ধি, আত্ম-নিবেদন! তা কি এভাবে লুটিয়ে না পড়লে হয় না?

এ-প্রশ্নের কেউই জবাব দিলাম না কিছু। সবাই তখন ভক্ত-শিল্পীদের আত্মনিবেদন দেখতে ব্যস্ত।

এদিকে গৃহস্বামী এসেছেন সংকীর্তনের আসরে। শিল্পীদের

চাদর উপহার দিচ্ছেন। হাতে হাতে নয়, বুকে পিঠে জড়িয়ে দিচ্ছেন। গান গাইতে গাইতে, সংকীর্তনের আসরে ঘুরতে ঘুরতে যখনই থামছেন এক একজন শিল্পী, হয় নুয়ে পড়ে, আর না-হয় নতজানু হয়ে প্রণাম নিবেদন করছেন, ঠিক তখনই গৃহস্বামী তাঁকে চাদর উপহার দিচ্ছেন।

নীলকান্ত বললেন,—এই নাকি মণিপুরের রেওয়াজ। যাঁদের সঙ্গতি আছে, তাঁরা নাকি ভালো জিনিসই দেন।

ভাবলাম, ভালো জিনিস ইনিও দিচ্ছেন, এই গৃহস্বামী। মনে হচ্ছে, প্রতিটি চাদরই দামী।

আবার ভাবলাম, এ-সংসারে কে কা'র দাম বিচার করে! এই যে এতগুলো ভালো জিনিস উনি দিচ্ছেন, এর টাকা পেলেন কোথায়? গরীবকে মেরে টাকা আসে নি তো? আসল ভক্তদের অভুক্ত রেখে সংকীর্তনের এই আসর বসে নি তো?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়েছিলাম বোধ করি। চমক ভাঙল, গৃহস্বামীরই ডাকে,—আসুন, প্রসাদ নেবেন একটু।

আর একটু! প্রসাদ নিতে গিয়ে দেখি, রাজসূয় আয়োজন! ফল লুচি তরকারী ডাল হালুয়া মিষ্টি—বাদ নেই কিছুই। তবে পরিবেশনের কায়দাটা একটু অদ্ভুত ডাল থেকে ফল পর্যন্ত সব কিছুই কলাপাতার ঠোঙায়।

প্রচুর খেলাম। একে আপ্যায়নের ঘনঘটা, তায় আবার সুস্বাদু রান্না—'খাবো না, খাবো না' করেও গুরুভোজন হয়ে গেল।

খাবার পর নীলকান্ত বললেন,—রাত এখন সাড়ে ন'টা। সংকীর্তন শেষ অবধি দেখলে ভোর হবে। চলুন, ফেরা যাক।

বললাম,—ফেরাই নিরাপদ। যা খেয়েছি!

সেদিন অনেক কষ্টে, গৃহস্বামীকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে সংকীর্তনের আসর থেকে ছুটি পেলাম। কিন্তু হোটেলে পৌঁছুতে

রাত সেই দশটা। এবং তারপরেও আবার গল্প: 'ডিপ্লোম্যাট'-এর বারান্দায় বসে।

নীলকান্ত হোটেলের ঠিক উল্টোদিকে পলো-খেলার মাঠটিকে দেখিয়ে বলছিলেন,—এই যে ময়দান দেখছেন, এই রকম রাত-বিরেতে এর দিকে তাকান দায়।

শুধালাম,—কেন?

—মনপ্রাণ হু-হু করে।

—কেন?

—বীর টিকেন্দ্রজিৎকে এখানেই ফাঁসি দেয়া হয়।

—টিকেন্দ্রজিৎ!—গোপালবাবু বললেন,—হ্যা হ্যা, শুনেছি বটে তাঁর নাম। তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন। বীর ছিলেন।

নীলকান্ত শুধালেন,—আর কিছু শোনেন নি?

বললাম,—কী করে আর শুনবো?

নীলকান্ত ঘড়ির দিকে তাকালেন। গোপালবাবুও বাধা দিলেন একবার,—না, আজ থাক। অনেক রাত হল।

কিন্তু কে কা'র কথা শোনে। 'সংক্ষেপে বলি', বলে নীলকান্ত দীর্ঘ এক কাহিনী শুরু করলেন এবং উঠলেন রাত এগারোটায়।

নীলকান্তর কাছ থেকে শোনা সেই কাহিনী কোথাও কাট-ছাঁট করে, আবার কোথাও বা ইতিহাসের তথ্য জুড়ে সংক্ষেপে বলছি। কারণ, টিকেন্দ্রজিৎকে বাদ দিলে স্বাধীনতা-সংগ্রামী মুক্তি-পাগল মণিপুরের অনেকখানিই বাদ চলে যায়। মণিপুর-ইতিহাসের সবচেয়ে বিচিত্র ও রহস্যময় অধ্যায়টি অ-বলা থেকে যায়।

১৮৮৬ সাল। চন্দ্রকীর্তির মৃত্যুর পর মণিপুরের সিংহাসনে বসলেন শূরচন্দ্র।

চন্দ্রকীর্তির ছয় রাণী এবং দশ পুত্র। শূরচন্দ্র প্রথমা রাণীর

গর্ভজাত প্রথম সন্তান। প্রথমার অন্যান্য সন্তানরা হলেন পাকাস্না, কেশরজিৎ এবং গোপালসম্না।

দ্বিতীয়ার পুত্র সন্তান দু'টি—কুলচন্দ্র এবং গান্ধার সিং। টিকেন্দ্রজিৎ তৃতীয়ার গর্ভজাত একমাত্র পুত্র। চতুর্থ রাণীর পুত্রও একটি—ঝালকীর্তি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাণীর পুত্র যথাক্রমে অঙ্গৌম্না ও জিল্লাঙম্বা।

শূরচন্দ্র সিংহাসনে বসবার পর যুবরাজ হলেন কুলচন্দ্র। কিন্তু এ-ব্যবস্থা রাজপুত্রদের অনেকেরই মনঃপূত হল না। ফলে, দু'টো দলে বিভক্ত হলেন ওঁরা। এক দলে প্রথমা রাণীর চার পুত্র এবং অন্য দলে যুবরাজ কুলচন্দ্র, টিকেন্দ্রজিৎ, অঙ্গৌম্না ও জিল্লাঙম্বা।

চন্দ্রকীর্তির পুত্রদের মধ্যে টিকেন্দ্রজিৎই ছিলেন সবচেয়ে শৌর্য বীর্যবান। যেমন অশ্বারোহণে তেমনি অস্ত্রচালনায় তাঁর জুড়ি ছিল না। শিকারে তাঁর নিশানা ছিল অব্যর্থ। বনে জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়াতেন তিনি। সাক্ষাৎ যমদূতের মতো বাঘগুলোকে একা ঘায়েল করতেন। তার স্বভাব ছিল উদার এবং স্বাধীন প্রকৃতির। গরীবের দুঃখে তিনি যেমন কাতর হতেন, কারও কোনো অন্যায় দেখলেও তেমনি রুখে দাঁড়াতেন। তাই ঝালকীর্তির মৃত্যুর পর তিনি যখন মণিপুরের প্রধান সেনাপতি হলেন, তামাম রাজ্যে তখন খুশির জোয়ার।

টিকেন্দ্রজিৎ বীরের দায়িত্ব-পালনে বরাবরই অগ্রণী ছিলেন। শূরচন্দ্রের হয়েও কয়েকবার লড়াই করেন তিনি; প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেন। কিন্তু বিপদ বাধল তাঁরই অনুগামী জিল্লাঙম্বাকে নিয়ে।

পাকাস্নার সাথে মন-কষাকষি চলছিল এই জিল্লাঙম্বার। সামান্য ব্যাপারেও খিটিমিটি বাধছিল। শেষ পর্যন্ত পাকাস্না মহারাজ শূরচন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। জিল্লাঙম্বার বিরুদ্ধে তাঁর কাছে নালিশ করে বললেন, ঐ শয়তান যেন দরবারে বসবার সুযোগ না পায়। রাজপুত্রের সুযোগ-সুবিধা থেকেও যেন বঞ্চিত হয় ও।

শূরচন্দ্র শেষ অবধি সহোদরের পক্ষ নিলেন। আর ওদিকে রাগে জ্বলতে লাগলেন জিল্লাঙম্বা। টিকেন্দ্রজিৎ-এর সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করলেন তিনি। শূরচন্দ্র ও পাকাসনার বিরুদ্ধে বললেন।

টিকেন্দ্রজিৎ বহু ব্যাপারেই পাকাসনাকে পছন্দ করতেন না। তাই এ-ব্যাপারে তাঁর সহানুভূতি জিল্লাঙম্বার দিকেই গেল। আর ওদিকে জিল্লাঙম্বারও প্রতিশোধের ফিকির খুঁজতে সময় লাগল না।

১৮৯০ সালের এক সেপ্টেম্বর-রাত্রি। মহারাজ শূরচন্দ্র সারাদিনের কাজ সেরে শয্যা নিয়েছেন। রাজপ্রাসাদ স্তব্ধ। এমন সময় হঠাৎ জিল্লাঙম্বা ও অঙৌম্বা কিছু সংখ্যক অনুগামী নিয়ে প্রাসাদ আক্রমণ করলেন। মহারাজা শূরচন্দ্রের জানালা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন একের পর এক।

শূরচন্দ্র ভয়ে দিশাহারা। খিড়কির দরজা দিয়ে তখনই পালালেন তিনি। ইংরেজদের সাহায্যের আশায় রেসিডেন্সীর দিকে ছুটলেন।

সাহায্য তেমন কিছু মিলল না। শূরচন্দ্রকে শেষ অবধি আশ্রয় নিতে হল কাছাড়ে। এদিকে চারিদিকে রটে গেল, অনুজ কুলচন্দ্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেছেন শূরচন্দ্র।

টিকেন্দ্রজিৎ এ-খবরে খুব খুশি। তিনি ঠিক এইটেই যেন চাইছিলেন। কারণ, শূরচন্দ্রকে তাড়াবার ব্যাপারে পরোক্ষভাবে তাঁর অনেকখানি হাত ছিল।

যাই হোক, কুলচন্দ্র রাজা হলেন অচিরে। ভারতের ইংরেজ-অধিকর্তাকে জানিয়ে দিলেন, মণিপুর-সম্রাট এখন তিনিই। এদিকে শূরচন্দ্রও চুপচাপ বসে নেই। ভারত-সরকারকে জানালেন, সিংহাসন তিনি ত্যাগ করেন নি; মণিপুরের ইংরেজ-প্রতিনিধি (পলিটিক্যাল এজেন্ট্) মিঃ গ্রীমৃউড্ তাঁকে ভুল বুঝেছেন।

ভারত-সরকার পড়লেন বিপদে। শূরচন্দ্রকেই সিংহাসনে বসাবার পক্ষপাতী ছিলেন এঁরা। কিন্তু মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট্ মিঃ

গ্রীম্‌উড্‌ ও আসামের চীফ কমিশনার মিঃ কুইনটন মত দিলেন কুলচন্দ্রের অনুকূলে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, কুলচন্দ্রই সিংহাসনে বসবেন। তবে টিকেন্দ্রজিৎকে মণিপুর থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কারণ, তিনি প্রধান সেনাপতি থাকা-কালে রাজপ্রাসাদে বিদ্রোহ ঘটেছে এবং সে-বিদ্রোহের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

এইবার সমস্যা দেখা দিল টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে। আসামের চীফ কমিশনার মিঃ কুইনটন ভারত-সরকারকে পরামর্শ দিলেন, (১) কুলচন্দ্র এবং টিকেন্দ্রজিৎ-এর উপস্থিতিতে একটি দরবার অনুষ্ঠিত হোক। (২) টিকেন্দ্রজিৎকে সেই দরবারে গ্রেপ্তার করা হোক এবং তারপর (৩) ভারতবর্ষে তাঁর নির্বাসনের ব্যবস্থা হোক।

ভারত-সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। স্থির হল, মিঃ গ্রীম্‌উড্‌-এর নেতৃত্বে রেসিডেন্সীতে দরবার অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে দরবারের খবর শুনে মণিপুরীরা সন্দিগ্ধ। সবাই বলাবলি করেন, রাজপ্রাসাদে হচ্ছে না কেন দরবার? আসামের চীফ কমিশনার রেসিডেন্সীতে আসছেন কেন? অত ইংরেজ অফিসার আর বন্দুকধারী প্রহরীই বা কেন?

যা'ই হোক, নির্দিষ্ট দিনে তো দরবারের ব্যবস্থা হল। রেসিডেন্সীর বন্ধ ঘরে টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তারের আয়োজন চলল পুরোদমে।

এদিকে টিকেন্দ্রজিৎ ও মহারাজা কুলচন্দ্র এসে গেছেন। সেই থেকে অপেক্ষা করছেন রেসিডেন্সীর দরজায়। কিন্তু কা'রও কোন সাড়া নেই। কেউ এগিয়ে আসছেন না মহারাজা ও তাঁর প্রধান সেনাপতিকে অভ্যর্থনা জানাতে।

টিকেন্দ্রজিৎ দেখলেন, রেসিডেন্সীর দরজা-জানালা সব বন্ধ। ভেতরে কী চলছে, বাইরে থেকে আদৌ তা বোঝবার জো নেই।

আসলে ভেতরে তখন টিকেন্দ্রজিৎকেই গ্রেপ্তারের উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল। আয়োজন সম্পূর্ণ না করে তাঁকে আহ্বান জানাবার কোন উপায় ছিল না ইংরেজদের।

রেসিডেন্সীর ইংরেজরা প্রায়-প্রস্তুত। এমন সময় এক মণিপুরী মুসলমান অফিসার আড়াল থেকে রেসিডেন্সীর ভেতরের ব্যাপারটা দেখে ফেললেন। টিকেন্দ্রজিৎকে খবর দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

আসল ব্যাপার দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। টিকেন্দ্রজিৎ অবিলম্বে রেসিডেন্সী ত্যাগ করলেন।

চীফ কমিশনার মিঃ কুইনটন-এর তখন মাথায় হাত।

—টিকেন্দ্রজিৎ ছাড়া দরবার হবে না।—সোজাসুজি ঘোষণা করলেন তিনি।

মহারাজা কুলচন্দ্র বললেন,—আমি থাকলেও না?

কুইনটন দূত-মারফৎ জানিয়ে দিলেন,—না। টিকেন্দ্রজিৎ সঙ্গে না থাকলে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না আমরা।

তখন দূত ছুটল টিকেন্দ্রজিৎ-এর আস্তানায়। ফিরে এসে জানাল,—না। তিনি আসতে পারবেন না। অসুস্থ।

কুইনটন তখন কুলচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দিলেন,—পরদিন সকাল আটটায় দরবার। মহারাজা যেন তাঁর ভাইদের নিয়ে ঠিক হাজির থাকেন।

কিন্তু না, পরদিন কেউ হাজির হলেন না। কুলচন্দ্র চীফ কমিশনারকে জানিয়ে দিলেন, টিকেন্দ্রজিৎ অসুস্থ।

মিঃ কুইনটন ও মিঃ গ্রীম্‌উড্‌ মাথায় হাত দিলেন আবার। চিড়িয়া ফাঁদে পড়ল না দেখে প্রমাদ গনলেন।

অগত্যা টিকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করার নতুন ফন্দি-ফিকির চলল। মিঃ গ্রীম্‌উড্‌ তাঁর এক সহকর্মীকে নিয়ে কুলচন্দ্রের কাছে গেলেন। ভারত-সরকারের সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে খোলাখুলি জানিয়ে বললেন,—টিকেন্দ্রজিৎকে আমাদের হাতে অর্পণ করুন।

কুলচন্দ্র বললেন,—অসম্ভব।

গ্রীম্‌উড্ তখন বললেন,—এক কাজ করুন তবে। টিকেন্দ্রজিৎকে আমরাই গ্রেপ্তার করছি; আপনি লিখিতভাবে অনুমতি দিন।

কুলচন্দ্র বললেন,—না, তা হয় না।

গ্রীম্‌উড্ এবার সরাসরি টিকেন্দ্রজিৎ-এর কাছে গেলেন। তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বললেন।

টিকেন্দ্রজিৎ স্তব্ধ, গম্ভীর। গ্রীম্‌উড্-এর স্পর্ধা দেখে বিস্মিত।

অনন্যোপায় হয়ে ফিরে এলেন গ্রীম্‌উড্। সহকর্মী মিঃ কুইনটনকে সব বললেন।

কুইনটন ক্ষেপে উঠলেন এবার। যে-কোনো প্রকারেই হোক, টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তারের জন্যে তৎপর হলেন। সামরিক অফিসারদের গোপন সভা ডাকা হল। কুইনটন পরামর্শ দিলেন, বলপ্রয়োগ করে হলেও টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করতে হবে। রাজপ্রাসাদের যে অংশে তিনি থাকেন তা অবরোধ করতে হবে।

তাই করা হল। এক নিশুতি রাতে ব্রিটিশ ফৌজ ঘিরে ফেলল তার বাড়ি। দুপক্ষে তুমুল লড়াই হল ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ লেঃ ব্র্যাকেনবারি নিহত হলেন। সৈন্যরা শেষ অবধি টিকেন্দ্রজিৎ-এর বাড়ি দখল করল। রক্তস্নান করতে করতে জয়ধ্বনিতে মুখর করল আকাশ-বাতাস। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ কোথায়?

তন্ন তন্ন করেও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। গ্রীম্‌উড্ ও কুইনটন বুঝলেন, চিড়িয়া আবার পালিয়েছে। এদিকে পরদিন ভোর না হতেই নতুন বিপদ! মণিপুরী সৈন্যরা রেসিডেন্সী আক্রমণ করল। গ্রীম্‌উড্ ও কুইনটন-এর ঘরের জানালা তাক করে গুলি ছুঁড়ল একের পর এক।

ব্রিটিশ মুরুব্বিরা দেখলেন, বিপদ! সর্বনাশ একেবারে টুঁটি চেপে ধরতে উদ্যত!

অগত্যা অনেক কষ্টে আত্মগোপন করলেন ওঁরা। এবং তারপর

অনেক চেষ্টা-উদ্যোগের পর কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ-এর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হলেন।

বৈঠকে সেই পুরনো দাবী ইংরেজদের। টিকেন্দ্রজিৎকে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে।

ওদিকে টিকেন্দ্রজিতেরও একটিই দাবী। ইংরেজদের অস্ত্রসমর্পণ করতে হবে।

বলা বাহুল্য, কা'রও কোনো দাবীই পূরণ হল না। অগত্যা আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ইংরেজ মহারথীরা রেসিডেন্সীর দিকে রওনা দিলেন।

সশস্ত্র মণিপুরীরা এতক্ষণ আলোচনা-কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করছিল। ইংরেজদের চালচলন সম্পর্কে ওদের সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছিল। যখন ওরা দেখল, ইংরেজরা নিরস্ত্র, চীফ কমিশনার ও পলিটিক্যাল এজেন্ট্-এর দলবল এগোচ্ছেন, তখন সুযোগ বুঝে শত্রুদের অনুসরণ করল ওরা। প্রচণ্ড কলরবে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল।

ব্রিটিশ অফিসাররা দেখলেন, সঙ্গে অস্ত্র নেই ওঁদের, অথচ সশস্ত্র মণিপুরীরা সংখ্যায় ওঁদের বহুগুণ। তাই যুদ্ধ না করে পালাবার চেষ্টা করলেন ওঁরা। ছুটলেন দুর্গের দিকে।

কিন্তু ছুটে বা পালিয়েই বা যাবেন কোথায়? মণিপুরীরা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। বল্লমের আঘাতে পলিটিক্যাল এজেন্ট্ মিঃ গ্রীম্‌উড্ নিহত হয়েছেন।

নিরুপায় হয়ে চীফ কমিশনার মিঃ কুইনটন তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। 'থাঙ্গাল মেজর' টিকেন্দ্রজিৎ-এর সঙ্গে পরামর্শ করে এরই মধ্যে ওঁদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।

এই 'থাঙ্গাল মেজর' ছিলেন সত্যিকারের এক বীর যোদ্ধা। আসলে সেনাপতি ছিলেন তিনি। থাঙ্গাল গ্রামের বিদ্রোহী নাগাদের শায়েস্তা করার পর থেকে তাঁর নাম হয় 'থাঙ্গাল'।

মণিপুরীদের সাহস ও বীর্যবত্তার ইতিহাসে এই 'থাঙ্গাল মেজর'-এর নাম ধ্রুবতারার মতই উজ্জ্বল। টিকেন্দ্রজিৎ-এর সঙ্গে কোনো কোনো ব্যাপারে তাঁর মতভেদ থাকলেও যেখানে দেশের বৃহত্তম স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে উভয়েই ছিলেন একমত।

চুয়াত্তর বছর বয়সেও এতটুকু ক্লান্তি ছিল না থাঙ্গাল-এর। মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সংগ্রামে বরাবরই তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। তাই শত্রুপক্ষের মুরুব্বিদের হত্যার ব্যাপারে তিনি যখন টিকেন্দ্রজিৎ-এর পরামর্শ চাইলেন, টিকেন্দ্রজিৎ তখন তাঁর বিরোধিতা করেন নি। বরং একমতই হয়েছিলেন।

ওঁদের নির্দেশে মিঃ কুইনটন ও তার চারজন ইংরেজ সহকর্মীর প্রাণদণ্ডাদেশ অচিরেই কার্যকরী হল। মণিপুরীরা রেসিডেন্সী দখল করল। মিসেস গ্রীমউড্ কয়েকজন ইংরেজ অফিসার ও অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে কাছাড়ের দিকে পালালেন। আর ওদিকে ভারত ও বার্মার অধিপতি ইংরেজরা ঠিক করলেন, আর দেরী নয়; বদলা নিতেই হবে। তামাম মণিপুর দখল করতে হবে এবার।

দখলের কাজ অবিলম্বে শুরু হল। লেঃ গ্রাণ্ট বার্মার দিক থেকে এগোলেন। কোহিমা ও শিলচর থেকে এগোল আরও দু'টি ব্রিটিশ সৈন্যদল। সকলেরই লক্ষ্য ইম্ফল, মণিপুরের রাজধানী।··· আগে রাজধানী দখল করতে চান ওঁরা; তারপর গোটা মণিপুরকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধতে চান।

মণিপুরীরা সাধ্যমত বাধা দিয়েছিল। লড়াই করেছিল প্রাণপণ; কিন্তু পারে নি। ইংরেজরা ১৮৯১ সালের ২৪শে এপ্রিল মণিপুর-রাজপ্রাসাদ দখল করল।

প্রাসাদে কেউ নেই তখন। পরাজয় নিশ্চিত বুঝে আগে থাকতেই সব পালিয়েছে।

শেষ অবধি বন্দী হলেন বিদ্রোহীরা। মহারাজা কুলচন্দ্র, টিকেন্দ্রজিৎ, থাঙ্গাল মেজর ও অঙৌম্বার বিচার হল।

ঠিক বিচার নয়, বিচারের নামে প্রহসন। কেননা, আগে থাকতেই সব ঠিক ছিল। টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গাল মেজর-এর ফাঁসি হবে, ইংরেজরা জানতেন।

শেষ পর্যন্ত ঠিক তা'ই হল; ফাঁসির আদেশ ওঁদের দু'জনের ক্ষেত্রে; আর কুলচন্দ্র ও অঙৌম্বার ক্ষেত্রে নির্বাসন।

দেখতে দেখতে ফাঁসির দিন ঘনিয়ে এল। ১৮৯১ সালের ১৩ই আগস্ট শেষ-সূর্যোদয়ের বার্তা নিয়ে এল টিকেন্দ্রজিৎ-এর জীবনে। ঐ দিনই ফাঁসি হবার কথা। তাঁর এবং থাঙ্গাল মেজর-এর।

ইম্ফলের পলো-খেলার মাঠে পাশাপাশি দু'টি বধ্যমঞ্চ তৈরী হয়েছে। দুই দেশপ্রেমিকের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে অপরাহ্ণে, ঠিক একই সময়ে।

কিন্তু কোথায় অপরাহ্ণ! অনেক আগে থেকেই খেলার মাঠ লোকে লোকারণ্য। ছেলে বুড়ো যুবক যুবতী—সবাই বধ্যমঞ্চকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। কথা নেই কা'রও মুখে। সবাই স্তব্ধ নির্বাক।

নির্দিষ্ট সময়ে টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গাল মেজরকে বধ্যমঞ্চে আনা হল। নারীকণ্ঠের আকুল প্রার্থনা শোনা গেল চারিদিক থেকে, —ছেড়ে দাও ওদের। দেশপ্রেমিকদের মুক্তি দাও।

মণিপুরে নিয়ম ছিল, কাউকে প্রাণদণ্ড দেয়া হলে তা মকুব হতে পারে, যদি নাকি নির্দিষ্ট সংখ্যক নারী এজন্যে আবেদন করেন।

নারীর সংখ্যা নির্দিষ্টের চেয়ে অনেক বেশিই ছিল। আবেদনেও আকুলতা কম ছিল না। কিন্তু কোনো কাজ হয় নি ওতে; ফাঁসির আদেশ রদ হয় নি। পূর্বনির্দিষ্ট সময়েই টিকেন্দ্রজিৎ ও থাঙ্গাল মেজরকে হত্যা করা হয়েছিল।

দীর্ঘ এই কাহিনী বলে খানিকক্ষণ চুপচাপ নীলকান্ত। আমরাও চুপ। কারও মুখে কোন কথা নেই। সামনেই পলো-খেলার মাঠ

খাঁ-খাঁ করে। 'ডিপ্লোম্যাট হোটেল'-এর পাশে জনশূন্য 'বীর টিকেন্দ্রজিৎ রোড কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে ওঠে। খেলার মাঠের মাঝখানে জমাট অন্ধকার সেদিনের সেই দলা-পাকানো হতাশার সাক্ষী দেয়।...হঠাৎ উত্তুরে হাওয়া ছুটে আসে। দীর্ঘশ্বাস হয়ে যেন। আমরা চমকে উঠি। গোপালবাবু নীরবতা ভাঙেন,—আর নয় নীলকান্ত। রাত হল। এগারোটা। এবার হয় ঘরে ফিরুন, আর না-হয় চলুন আমাদের সঙ্গে। হোটেলেই থাকবেন।

—হোটেলে ?—যেন অনেকক্ষণ বাদে চমক ভাঙে নীলকান্তর,—না না, তা কী করে হয় ? ঘরে বসে আছে সবাই। ভাবছে।

এবার উঠলেন তিনি। যেন অনিচ্ছাসত্ত্ব। ধীরে ধীরে ঘরের দিকে এগোলেন।

পরদিন। সকাল থেকেই আমরা ব্যস্ত। টুকটাক কেনাকাটা চলছে। গোছগাছ চলছে কিছু কিছু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মণিপুর ছাড়তে হবে। নাগাল্যাণ্ড থেকে 'পীস-সেণ্টার'-এর গাড়ি আসবে আজ। বিকেল নাগাদ আসবে। 'পীস-সেণ্টার'-এর ডিরেক্টার ডঃ আরাম 'তার' করেছেন।

স্থির হয়েছে, আমরা তাঁরই নির্দেশমত পরদিন সকালে রওনা হব। শুধু যাবার মুখে বিনোদিনীর বাড়িতে নামব একবার। নিমন্ত্রণ রক্ষা করব।

কিন্তু নিমন্ত্রণের শেষ থাকত যদি ! মণিপুরে এসে অবধি একটা বেলাও যদি চুপচাপ কাটত !

সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ নীলকান্ত এলেন। এসেই নির্দেশ দিলেন,—চলুন, ঘুরে আসি।

শুধালাম,—কোথায় ?

—ইম্ফল সেমিট্রি। আপনাদের বঙ্গাল ভাষায় কবরখানা।

—কেন ? কী আছে ওখানে ?

—আগে তো চলুন ; তারপর মালুম হবে।—বলেই প্রচণ্ড তাড়া দিলেন নীলকান্ত।

অগত্যা বেরোতে হল। বলতে গেলে দুপুর রোদ্দুরেই ছুটতে হল আবার। অথচ ছুটবার বা বেরোবার ইচ্ছে কা'রও ছিল না। এমনকি গোপালবাবুও চাইছিলেন ঘরে বসে বিশ্রাম নিতে।

কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম, তা'তে সবাই আমরা বিস্মিত। ডিপ্লোম্যাট হোটেল থেকে এক মাইলেরও কম দূরে এমন একটা বিশ্রামের জায়গা আছে, তা আবিষ্কার করে অভিভূত একেবারে।

গোপালবাবু তো 'সেমিট্রি'তে পা দিয়েই ঘোষণা করলেন,—আশ্চর্য ! বিশ্রামের আসল জায়গাটাই এতদিন দেখি নি।

ভাবলাম, আসলই বটে। শান্ত স্তব্ধ এই 'সেমিট্রি'তে মৃত্যুর নীরবতা। সাড়া নেই কোথাও, কোলাহল নেই, তামাম এলাকাটা গাঢ় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন যেন। ঘন সবুজ ঘাসের চাদর মুড়ি দিয়ে সমাহিত।

চাদরের মাঝখানে বুটি কতকগুলো। লাইন-বাঁধা সারি সারি সমাধি।·· বড় নয়, উঁচু নয় ওদের একটাও। ঘাসের গায়ে গায়ে লাগানো। লম্বায় বড জোর তিন-চার হাত ; চওড়ায় আট-দশ ইঞ্চি। অর্থাৎ কিনা, যতটুকু না হলেই নয়।

শোনা গেল, আসল ব্যাপারটাও ঠিক তাই,—যতটুকু না হলেই নয়।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমল। ইম্ফল-রণাঙ্গনে তুমুল লড়াই চলছে। ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা প্রচুর। কেউ নিখোঁজ, আবার কা'রও বা দেহের হদিস মিলছে।

মৃতদেহগুলো তাড়াহুড়ো করে এখানেই আনা হ'ত। সারি বেঁধে কবর দেয়া হ'ত অতি দ্রুত।

সেই কবর। সেই সারি সারি সমাধি। প্রতিটিরই মাথার কাছে

একটি করে পাথর। ওখানে সৈনিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—নাম, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ইত্যাদি।

এগিয়ে যাই। তারিখগুলো পড়ি। তরুণ কিছু সৈনিকের ছবি মনে আসে। ওদের বেশির ভাগেরই বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশ।

এমন অকালে চলে গেল ওরা? স্বদেশ আর স্বজন থেকে এত দূরে এসে?—আকাশ-পাতাল ভাবি। ভুলে যাই যে, ওরাই একদিন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গে লড়াই করেছে। ফৌজের অগ্রগতিকে প্রতিহত করেছে ওরাই।

আর অগ্রগতি!—হঠাৎ অন্যমনস্ক হই বুঝি। এখানে এই ঘুমের দেশে সব কিছুকে একাকার হতে দেখি। জয়-পরাজয়, শত্রু-মিত্র—সব কিছুকে।

এখানে এসে একটাই পরিচয় আমাদের;—আমরা মানুষ, মরণশীল। আমাদের আসল সাম্য মরণে, আর কিছুতে নয়।

এদিকে খেয়ালই করি নি, এতক্ষণে এগিয়ে এসেছি খানিকটা। কয়েক শো সমাধিকে পাশ কাটিয়ে অতি সুন্দর এক ফুল-বাগিচার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

নীলকান্ত বললেন,—দেখছেন, 'সেমিট্রি'র ফুল কেমন বাহারী?

বললাম,—হতেই হবে। সার ভালো যে!

গোপালবাবু সায় দিলেন,—যা বলেছ! পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সার।

এগিয়ে আসছিলাম। ফুল-বাগিচা পেরিয়ে, বড় একটি 'ক্রস'কে পেছনে ফেলে এগোচ্ছিলাম। সুধীরবাবু ছবি তুলছিলেন; হঠাৎ এক যুবক আমাদের পথ-রোধ করল। একগুচ্ছ ফুল তুলে ধরে বলল,—স্যার, ওন্‌লি টেন্ পয়সে স্যার,—দিজ্ ফ্লাওয়ার্স।

অবাক হয়ে যুবকটির দিকে তাকালাম।—ময়লা প্যাণ্ট্-কোট পরনে; চেহারায় অনেকটা সাহেবী আদল। গোপালবাবু এতক্ষণে এগিয়ে গেছেন ওর দিকে। শুধোচ্ছেন,—ওন্‌লি টেন্ পয়সে?

—ইয়েস স্যার !—ও জবাব দিচ্ছে,—কর ইউ ওন্‌লি।

গোপালবাবু তাড়াতাড়ি ফুলগুলো কিনে নিলেন। যুবকটি 'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বলে চলে গেল। কিন্তু আমার কৌতূহল আকাশ-ছোঁয়া।—

বার বার ভাবি, যুবকটির চেহারায় সাহেবী আদল কেন? কী চায় ও? 'ওন্‌লি টেন্ পয়সে'?

নীলকান্তকে এ-নিয়ে প্রশ্নও করি একবার,—চেনেন নাকি?

—ঠিক চিনি না,—জবাব দেন তিনি,—তবে দেখেছি ওকে বহুবার। ওর সম্বন্ধে শুনেছিও।

—কী শুনেছেন?

—সে অনেক কথা,—নীলকান্ত আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যান। 'সেমিট্রি'র 'গেইট্'-এ পৌঁছেই 'ভিজিটার্‌স্ বুক'টি দেখিয়ে বলেন,—নিন, লিখুন কিছু।

লিখলাম। ইংরেজীতে—এখানে যারা শায়িত তাদের আত্মা চিরশান্তিতে বিশ্রাম করুক।

নীলকান্ত বললেন,—ঠিক, ঠিক লিখেছেন। এই বিশ্রামটুকুই ওদের দরকার। কারণ, ওরা অনেকেই অতৃপ্ত: কামনা-বাসনায় দগ্ধ হতে হতে মরেছে।

—এই যে যুবকটিকে দেখলেন,—একটু থেমে আবার শুরু করেন নীলকান্ত,—এর নাম জন্‌সন্ সিং; এক ইংরেজ সৈনিকের 'পজ্‌থিউমাস চাইল্‌ড্'। জন্‌সন্-এর বাপ যুদ্ধে মারা যায়। মা এই মণিপুরেরই মেয়ে।

শুধালাম,—ও এখানে কেন? এই 'সেমিট্রি'তে?

নীলকান্ত বললেন,—কেন আবার! 'সেমিট্রি'রই টানে। ওর বাপ এখানে শুয়ে!

বললাম,—আশ্চর্য! যে বাপকে ও দেখে নি, তার জন্যে টান?

নীলকান্ত বললেন,—ঠিক টান নয়, শ্রদ্ধা-মেশানো কৌতূহল

স্বন্দর থকে শক্তিশালী কিছু বলতে পারেন। বাপ 'চার্চ'-এ গিয়ে আপাততঃ চাষ এবং ব্যাপার অনেকদূর এগিয়েছে, আঁচ পেয়ে রেহাই দিয়েছিল ওদের। বিভিন্ন প্রান্তে

শুধালাম,—কিন্তু ফুল বিক্রীর সঙ্গে এর কী যোগ দের

নীলকান্ত জবাব দিলেন,—শুধু ফুল বিক্রী নয়, আ

কিছুই করে জনসন্। পয়সা জমায়। মাকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড শহ. নাকি! পিতৃপুরুষের ভিটে দেখবে।

মনে হল, আশ্চর্য। অদ্ভুত। চোখে না দেখলে এমন একটি চরিত্রের অস্তিত্ব কিছুতেই বিশ্বাস করা যেত না। অবাস্তব, অবিশ্বাস্য মনে হ'ত জনসন্ সিংকে। এবং সেই সঙ্গে নকলোকেও।

নাগা নকলো। ধীরে ধীরে তার কথা বলছি।

নকলোর সঙ্গে প্রথম পরিচয় নাগাল্যাণ্ড যাবার আগের দিন। বিকেলবেলা। কোহিমা থেকে 'পীস-সেণ্টার'-এর গাড়ি নিয়ে সে এল।

এসেই ফরমাস,—ম্যয় ভুখা হুঁ। খানা লাগাও।

বলতে কী, খানা ও না বললেও লাগানো হ'ত; এতটা দূর থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওর তর সইলে তো! পরিচয় হতেই এমনভাবে তাকাল আমাদের দিকে, যেন কতকালের চেনা।

আমরাও তাকালাম। মনে হল ইস্পাত দেখছি এক টুকরো; ঘষা-মাজা, ধারাল। ভাবলেশহীন নির্বিকার নিরাসক্ত চেহারা। বয়স কুড়ির কম নয়, পঁচিশের বেশি নয়। চুল খাড়া খাড়া, নাক থ্যাবড়া-মতো, চোয়াল চোয়াড়ে। পরনে ছুঁচল জুতো, সরু প্যাণ্ট্ আর জীবজন্তুর ছবি-আঁকা বাহারী সার্ট।

হিন্দীতে কথা হল। নাম জিজ্ঞেস করতেই বলল,—নকলো।

গোপালবাবু সহানুভূতি জানালেন,—আহা! অনেকটা পথ এসেছ। নিশ্চয় কষ্ট হয়েছে খুব?

—ইয়েস স্যার !—ও জবা

গোপালবাবু তাড়াতাড়ি জবাব না দিয়ে বলল,—ম্যায় ভুখা 'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বলে

ছোঁয়া।— বলেন,—কী খাবে? মাছ? মাংস? ডিম?

বার বাক্যগুপ্ত জবাব দিল,—সব কুছ। ঔর ড্রিংক্স্।

চায় ও গোপালবাবু নিজে বসে থেকে ওকে খাওয়ালেন। মাংস, ডিম—সব কিছুই; শুধুমাত্র ঐ শেষের জিনিসটি বাড়া।

সে-জিনিস নিজের চেষ্টাতেই সংগ্রহ করেছিল নকলো। গোপালবাবুকে শুধু বলেছিল,—রুপয়ে নিকালো। কম-সে-কম দশ!

গোপালবাবু দশ টাকা দেন নি। পাঁচ দিয়েছিলেন। আর ওতেই নকলোর কাজ হাঁসিল। খানিক বাদে টাকা উস্থুল করে ও ফিরে এল; মুখে ভুর ভুর গন্ধ।

গোপালবাবু ব্যস্ত ছিলেন তখন। 'ডিপ্লোম্যাট হোটেল'-এর মালিক শান্তিলালের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।—

না, মালিকের ছেলে রামলাল এখনও ফেরে নি। কথাবার্তা ওকে নিয়েই।

গোপালবাবু বলছিলেন,—ফিরবে ঠিক। দু'চার দিন সবুর করুন; ঠিক ফিরবে।

শান্তিলাল আশা ছেড়ে দিয়েছেন একরকম। একরাশ হতাশা উদ্‌গিরণ করতে করতে বলছেন,—ভগ্‌বান জানে!

—ভগ্‌বান জানে!—পরদিন বিদায় দেবার সময়ও ঠিক একই কথা শান্তিলালের। হোটেলের ব্যবস্থায় আমরা খুশি, গোপালবাবু আমাদের তরফ থেকে এ-কথা বলতেই আকাশের দিকে হাত তুলে এই উক্তি।

গোপালবাবু ভরসা দিতে ভোলেন নি। বলেছিলেন,—

কয়েক বাদেই আসছি আবার। ইম্ফলের পথে শক্তিশালী কিছু পথে কিন্তু দেখব, রামলালই 'রিসিভ্' করবে। আপাততঃ চাষ এবং হাজির থাকছে ঠিক।

শান্তিলাল এ-কথায় আশ্বস্ত কিনা ঠিক বোঝা গেল না। ভিন্ন প্রশ্ন করে কিছু বোঝবার আগেই 'পীস-সেন্টার'-এর জীপ হাজির আমাদের করে।

আকাশে ভোর থেকেই মেঘের আনাগোনা আজ। শহর ইম্ফলের চারিদিকে পাহাড়গুলো সেই থেকে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। ঠাণ্ডা হাওয়া। পুরো বাদ বেশ।

অথচ নকলোর যদি ভ্রূক্ষেপ থাকত। পাহাড়ীয়া ঠাণ্ডাকে ও ছোকরা পরোয়া করত যদি!—

সবে-ধন সেই সুতীর জামাটি গায়ে ওর। দিব্যি বহাল-তবিয়তেই ও স্টিয়ারিং ধরে বসে। এক একবার বৃষ্টির ছাঁট এসে গায়ে লাগছে, শীতে কাঁপুনি ধরছে আমাদের। কিন্তু নকলো নির্বিকার। যেন ঝড়-বাদলের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার এই সুযোগ একে হাতছাড়া করলে আসল রসই মাটি

একবার বললাম,—নকলো, তোমার ডানদিকের ওই পর্দাটা ফেলে দাও। ছাঁট কম লাগবে।

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। নকলো আমার কথা শুনেছে মনে হল না। যেমন চালাচ্ছিল, ঠিক তেমনি চালাল গাড়ি।

অগত্যা গোপালবাবু তাড়া দিলেন আবার,—নকলো, পর্দাটা ফেলে দাও।

এইবার কথা কানে গেছে মনে হল। নকলো হঠাৎ ফিরে তাকাল আমাদের দিকে। এমন এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল যে, ভাবলাম, বেশি কিছু বললে আমাদেরই বুঝি ফেলে দেবে ও।

নীলকান্ত পাশেই ছিলেন। বললেন,—থাক; বেশি কিছু বলবেন না। চেষ্টা।

—ইয়েস স্যার !—

গোপালবাবু তাড়াতাড়ি চুপচাপ। নকলো আপন মনে গাড়ি
'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বলে দৰিয়া গায়ে লাগছে এসে।
ছোঁয়া।— ভাঙলেন গোপালবাবু। নীলকান্তকে বললেন,
বার বল তো? বিনোদিনীর বাড়ি নকলো চেনে তো ঠিক?
চায় কান্ত অভয় দিলেন,—চিনিয়ে দিয়েছি। বেরোবার মুখে
রেখেছি সব কিছু।

এদিকে দেখতে দেখতে বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ে। চারিদিক ঘষা
কাঁচের মতো হয়ে ওঠে। স করে নকলো।

খানিকটা যেতে নীলকান্তর খেয়াল হয়। নকলোকে ভয়ে ভয়ে
পথ বাতলে দেন তিনি। সাবধানে এবং সবিনয়ে বিনোদিনীর বাড়িটি
চিনিয়ে দেন।

বাড়ি পৌঁছে দেখি, বিনোদিনী আমাদেরই অপেক্ষায়। জীপ
থামতে-না-থামতেই ছাতা নিয়ে ছুটছেন।

অবাক হলাম। এ আবার কেমনতরো রাজকুমারী? পুরো
গণতান্ত্রিক নাকি? অতিথিকে অভ্যর্থনা করবেন বলে নিজে ছাতা
হাতে ছোটেন?

কিন্তু না, ছোটাছুটির এবং অভ্যর্থনার তখনও বাকী ছিল।
বিনোদিনী আমাদের নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বৃষ্টিতে
ভিজেছি বলে এতবার করে দুঃখ করলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমার মনে
হল, যাক! ভালই হয়েছে। এই বৃষ্টিটুকুরও বুঝি দরকার ছিল।
না হলে রাজকুমারীর এমন সলাজ, সনম্র, অতিথিপরায়ণ মূর্তিটি
পেতাম কোথায়?

পাওয়াই বটে। বিনোদিনীর ড্রইং-রুমে বসে মনে হল, শান্তি
নিকেতন আশ্রমে আছি। রবীন্দ্র-সংস্কৃতির আঁচ পাচ্ছি চারিদিকে
ঘরে সোফার তুলনায় তাকিয়ার ছড়াছড়ি। উঁচুমতো প্রশস্ত
আসনে ফরাস পাতা। দেয়ালের প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে

পাটি। এখানে-সেখানে অতি সুন্দর থকে শক্তিশালী কিছু
বিনোদিনী নিজেই এঁকেছেন। আপাততঃ চাষ এবং

ঘরে রবীন্দ্রনাথের বইও প্রচুর। আর ও

শুধিয়েছিলাম,—গানও করেন? রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভিন্ন প্রান্তে

বিনোদিনী জবাব দেন নি কিছু। নীলকান্ত ওঁর হয়ে শরদের
—করেন মানে! রবীন্দ্রনাথের বহু গান মণিপুরীতে
করেছেন। গেয়েছেন।

শুধালাম,—তাই নাকি?

বিনোদিনী মিষ্টি হেসে জবাব দিলেন,—ওঁর কথা বিশ্বাস করবেন না। সব কিছু বাড়িয়ে বলেন। আসলে যা, তা'র তিন গুণ করে।

বললাম,—তিন গুণের এক গুণ তাহলে সত্যি?

বিনোদিনী প্রবলভাবে মাথা নেড়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি তার আগেই বলে বসল, – এক গুণ কেন, পুরো তিনই সত্যি। তিন সত্যি।

—গোটেও নয়,—প্রায়-চল্লিশ বিনোদিনী হাস্যে-লাস্যে কিশোরী হয়ে উঠলেন যেন। 'শেল্ফ্' থেকে একখণ্ড 'গীতবিতান' তুলে নিয়ে অঞ্জলির দিকে এগিয়ে এলেন হঠাৎ। বই খুলতে খুলতে বললেন, এই যে! দেখুন; 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে' গানটি।···না সুর, না তাল—কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

অঞ্জলি বলল,—এর সুর টোড়ী ভৈরবী' তাল কাহারবা। কঠিন কিছু তো এতে নেই!

—নেই? কেমন? ঠিক তো?—বিনোদিনী রহস্যময়ী এবার।

অঞ্জলি বললে,—হ্যা, ঠিক।

বিনোদিনীর বাঁকা প্রশ্ন তৎক্ষণাৎ,—তাহলে আপনি গান জানেন, এ-ও ঠিক?

এবার অঞ্জলির কিশোরী হবার চেষ্টা। কিন্তু না, বৃথা চেষ্টা।

—ইয়েস স্যার !—ও জন

গোপালবাবু তাড়াহুড়োধে গান তাকে গাইতেই হল। একটা 'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বলে

ছোঁয়া।— বা য়ে উঠেছিল মাঝখানে। ঘন ঘন হর্ণ বাজিয়ে বার বা। কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি; বিনোদিনীর চায় —

একফাঁকে বাইরে গেলেন তিনি। নকলোকে ডেকে এনে ড্রইং-রুমে বসিয়ে দিলেন।

আমরা অবাক, বিস্ময়বিস্ফারিত।

বিনোদিনী সেটা লক্ষ্য করে বললেন,—

সাহিত্যের ঐকতান সঙ্গীত-সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়।

হ্যা, নকলোর সম্মানে কাজ হল। মন্ত্রের মতো। তাড়া দেয়া তো দূরের কথা, সে নিজেই জমে গেল গানে। আপন মনে তাল দিল। বিশেষ করে 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে' গানটি চলার সময়।

বিনোদিনীও গাইলেন। মণিপুরীতে। প্রথমে 'কোন্ ক্ষেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়', তারপরে 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই।

আমরা সবাই খুশি গান শুনে। গোপালবাবু তো উচ্ছ্বসিত। বললেন,—অপূর্ব। আপনার প্রথম গানটি আজকের পরিবেশের সঙ্গে একেবারে মিলে গেল।

শুধালাম,—শেষেরটি?

—ও তো মিলেই আছে,—গোপালবাবুর সাফ জবাব,—সব পরিবেশে, সব জায়গায়।

বিনোদিনী প্রতিবাদ করলেন,—বাজে কথা। আমি অন্তত: মেলাতে পারি নি।

অঞ্জলিকে দেখিয়ে বললেন,—দিদি গাইলে এ-গান তিন গুণ সুন্দর হ'ত।

—বাজে কথা !—বলল অঞ্জ... ক থেকে শক্তিশালী কিছু

আমরা একসঙ্গে হেসে উঠলাম। আপাততঃ চাষ এবং

এরপর চা-জলখাবার এল। গল্প চলল

বিনোদিনীর স্বামী ডাক্তার ; বোম্বে থাকেন। দুই ...বিভিন্ন প্রান্তে পড়ে।

...পরদের

বললাম,—দুঃখ রইল, কাউকে দেখলাম না।

বিনোদিনী বললেন,—আমার দুঃখ, প্রাণ ভরে দিদির গা... শুনলাম না।

বিদায় নেবার সময় নীলকান্তকে বললেন,—আপনিও যাচ্ছেন তো ?

নীলকান্ত অবাক,—কোথায় ?

—নাগাল্যাণ্ডে। ওঁদের সঙ্গে।

—না, যাচ্ছি না। পরশু কলেজ খুলছে আমাদের।

—কলেজ ?—বলেই বিনোদিনী তালিম দিলেন অঞ্জলিকে,—দোহাই আপনার! গাড়িতে উঠেই গান ধরবেন। দেখবেন, ম্যাজিক। কলেজ আর বাড়ির কথা ভুলে বসে আছেন বন্ধুটি। দিব্যি নাগাল্যাণ্ড চলে গেছেন।

বললাম,—আপনাকেও তো অফিস যেতে হবে এখন ?

বিনোদিনী জবাব দিলেন,—না। আজ আর যাচ্ছি না। মুড্‌ নেই।

বললাম,—ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখে দেব কিন্তু! হুবহু এই কথাটাই।

বিনোদিনী বললেন,—লিখবেন : এই সঙ্গে আরও একটা কথা : মণিপুরে আবার আসার জন্যে বিনোদিনী অনুরোধ করেছিল। বলেছিল, একবার দেখে মানুষকে যেমন, দেশকেও তেমনি ঠিক বোঝা যায় না।

—ইয়েস স্যার ।—

গোপালবাবু তাড়াহুড়ো বোঝা যায় না। এই ক'দিনে

'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বলে ন!

ছোঁয়া।— বা র বাড়ি থেকে ফেরবার সময় বার বার মনে

বার ব

চায় নকলো তাড়া দিল,—আভি যানা ? নাগাল্যাণ্ড ?

নী-বাংলা মিশিয়ে বললাম,—হুঁ। যানা তো বটেই। তবে একান্তজীকে তাঁর ঘর পৌঁছে দিয়ে।

—ঘর ?—একটু যেন বিরক্ত নকলো,—কিধার হ্যায় ও ?

বললাম,—নজদিক। সামান্য একটু ঘুরে যেতে হবে।

—নেহী! নেহী যায়গা।—প্রবল আপত্তি নকলোর।—যানে সে দের হো যায়গা।—বলেই দুম করে প্রচণ্ড এক 'ব্রেক' কষে গাড়িটাকে সে দাঁড় করিয়ে দিল।

অগত্যা পথেই নেমে গেলেন নীলকান্ত। বিদায় নেবার সময় বার বার বললেন,—ঠিক আছে। দেখা হবে আবার। কয়েকদিন বাদেই তো ফিরছেন।

বলতে যাচ্ছিলাম,—হ্যাঁ, ফিরছি। যথাসময়ে আপনাকে জানাচ্ছিও সব কিছু—

কিন্তু বলা আর হল না। তার আগেই গাড়ি ছুটিয়ে দিল নকলো। নাগাল্যাণ্ডের পথে তীরবেগে ছুটল।

লজ্জায় দুঃখে সবাই আমরা এতটুকু হয়ে গেলাম। নীলকান্ত—যিনি এ ক'দিন ধরে এত কিছু করেছেন আমাদের জন্যে, তাঁর এই অপমান কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারলাম না।

ওদিকে নকলো খোস-মেজাজে দিব্যি। সামনেই এক পাহাড়কে তাক করে যেন ঘুষি বাগিয়ে এগোচ্ছে।

শ্ল দিক থেকে শক্তিশালী কিছু
কছে। আপাতত: চাষ এবং

ঞ্জার বিভিন্ন প্রান্তে
া কুকী-সর্দারদের
করেন নি।
ব বিনে
শক্তর

পাহাড়রা স্পষ্ট এখন। মেঘ কেটে গিয়ে আশেপাশে চিকচিক করছে গাছপালা। বৃষ্টিস্নান চলছে। মণিপুর-উপত্যকা আলো-ঝলমল।

ভাবছি, নাগাভূমিও কি আলোকিত এখন? না কি পাহাড়ে মেঘের জটাজাল? আদিম রহস্যের ধূমায়িত হাতছানি

ভাবছি আর ছুটছি: মণিপুর-উপত্যকার প্রায়-সমতল পথ ধরে।—

দেখতে দেখতে ইম্ফল পেছনে পড়ে থাকল। রাজপথে সাইকেল-যাত্রীর সংখ্যা কমল ক্রমে ক্রমে। চারিদিক ক্রমেই যেন নিঃশব্দ, নিঝুম হয়ে এল।

গোপালবাবু গল্প তুললেন,—রাণী গাইদিল্যু এদিকেই থাকতেন না? ঠিক এইরকমই কোনো পাহাড়ীয়া মণিপুরে?

বললাম,—ঠিক জানি না। তবে শুনেছি ওঁর কথা। অনেক।

গোপালবাবু বললেন,—আমিও শুনেছি। মণিপুরী নাগারা ওঁকে নাকি দেবতার মতো ভক্তি করত। ইংরেজরা সাক্ষাৎ ডাইনী ভাবত ওঁকে।

—ডাইনী?—অঞ্জলি প্রশ্ন করল এবার। গল্পও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জমে উঠল।

অনেক গল্প, অনেক কাহিনী গাইদিল্যুকে নিয়ে।

শোনা যায়, অষ্টাদশী গাইদিল্যু স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। ইংরেজদের হটিয়ে দিয়ে কাবুই-নাগাদের বন্ধন-মুক্তির স্বপ্ন। আর ওদিকে ইংরেজরা নিত্য-নতুন ফিকির খুঁজত। অত্যাচারে-উৎপীড়নে

ক্ষুরে তুলত নাগাদের।

়ানাং ছিলেন কাবুই-আন্দোলনের নেতা। ইংরেজরা তাঁকে দিল। ভাবল, নেতাকে মারলে আন্দোলনেরও মৃত্যু

—ইয়েস স্যার !—ও জ

গোপালবাবু তাড়াহুড়ো বোকাড়াল বিপরীত। যাদোনাং-এর

'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বলে ন! া হলেন তাঁরই শিষ্যা গাইদিলু।

ছোঁয়া।— বা র বাগ্মিতায় গুরুর চেয়েও উন্নত ছিলেন তিনি।

বার ক ও, বিচ্ছিন্ন নাগাদের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন।

চায় নকলো ইংরেজরা এ-জিনিস সুনজরে দেখে নি। নাগাদের

নী-বাংলা বলে সৈন্য পাঠিয়েছিল। ১৯৩১ সালে কাবুই-অঞ্চলে

সকান্তজীয়েছিল প্রচণ্ড।

—ঐ যুদ্ধে প্রচুর হতাহতের পর বন্দী হলেন গাইদিলু। কিন্তু ইংরেজরা বেশিদিন তাঁকে আটকে রাখতে পারল না। 'লাম্বু'র (সরকারী চৌকিদার) চোখে ধুলো দিয়ে একদিন তিনি পালালেন। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। নাগারা ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে লড়াই করেন গাইদিলু। কখনও ঝোপ-ঝাড়ে, আবার কখনও বা পর্বতের আড়ালে দাঁড়িয়ে শত্রুসৈন্যের মোকাবিলা করেন।

নাগারা 'রাণী' বলে গাইদিলুকে। 'রাণী'-র সব নির্দেশ শিরোধার্য করে।

ইংরেজরা ওদিকে ব্যতিব্যস্ত। গাইদিলুকে ধরবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করে। একের পর এক নাগা-গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত বন্দী হলেন গাইদিলু। ইংরেজ-আদালতের বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল।

না, ভারতবর্ষে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে নি তখন। কেউ খবরই রাখে নি যে, আশ্চর্য অদ্ভুত এক তরুণী কারাগারের বদ্ধ-ঘরে দিন কাটাচ্ছে। তার চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন, বুকে মুক্তির আগুন। যৌবনের মণিময় দিনগুলোকে রুদ্ধদ্বার কারাকক্ষেই খরচ করে ফেলছে সে। ডাইনী নয়, করুণাময়ী এক ঝরনাধারা নির্মম-নিষ্ঠুর পাষাণ-প্রাচীরের দেয়ালে মুখ থুবড়ে পড়ে আর্তনাদ করছে।

'ডাইনী নয়' গোপালবাবুও বললে দিক থেকে শক্তিশালী কিছু
সেদিন অনেক গল্প করলেন। ''কছে। আপাততঃ চাষ এবং
নকলোর ভ্রূক্ষেপ নেই কোনোদিকে
চালাচ্ছেই। পারলে বন-পাহাড়ের উপর দিয়েহজ্যর বিভিন্ন প্রান্তে
বন এদিকে ঘন সবুজ। পাহাড় ঘোর শ্যা কুকী-সর্দারদের
প্রসাধনে অপরূপা। স্বরেন নি।

পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ধূসর-বরণ ছিটেফোঁটা মেঘ।ব বিনে দেখলে নিশান বলে মনে হয়। ঠিক ছোট-বড় অগুনতি নিশক্ষর যেন;—চলছে, উঠছে, নামছে, কখনও বা মিলে-মিশে একাকার হচ্ছে।

দেখতে দেখতে একটি কুকী-গ্রাম পেরিয়ে এলাম। দরিদ্র শ্রীহীন গ্রামটিকে ডানপাশে রেখে সোজা এগোলাম আমরা। ওখানে উলঙ্গ কিছু শিশু দাঁড়িয়ে ছিল। হাত নেড়ে, লাফালাফি করে কী যেন বলতে চাইছিল আমাদের।

আমরা ব্যস্ত। দীর্ঘ দুর্গম পথ সামনে কা'রও কথা শোনবার অবকাশ পাইনি। আর তাছাড়া, পাহাড়ীয়া ছেলেমেয়েরা গাড়ি দেখলে এমনিতেও হৈ-হুল্লোড় করে অনেক সময়, ওতে কান দিলে চলে না।

কিন্তু না, শেষ অবধি কান দিতে হল। আরও খানিকদূর যেতেই বিশ-পঁচিশ জন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেমেয়ে পথরোধ করল আমাদের।

ব্যাপার কী? সবাই গাড়ি থেকে নামলাম। নকলো সকলের আগে। পাহাড়ীয়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে।

—কী ব্যাপার?—নকলোকে শুধাতেই হিন্দী-ইংরেজী মিশিয়ে ও যা বলল তার মানে দাঁড়ায়, কী নাকি গণ্ডগোল হয়েছে। সামনেই; মাও-অঞ্চলে।

—ইয়েস স্যার !—[illegible] বোর নাগা বনাম মিলিটারী ?

গোপালবাবু তাড়াতাড়ি [illegible] গিয়ে বলল,—ঘাবড়াও মৎ ! যাও 'থ্যাঙ্ক্‌ ইউ' বলে [illegible] বাড়ি ছোঁয়া !— [illegible] বার কথা নয়। গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে কি ?

বার [illegible] নকলো [illegible] দিল না এ-কথার। সোজা গাড়িতে উঠে স্টার্ট চায় [illegible] নী-বাংলা [illegible] রাও হুড়মুড় করে ঢুকলাম। আবার এগোলাম [illegible] কাস্তজীরো পথ ধরে।

—সামনেই আর একটি কুকী-গ্রাম। পথের পাশে ঠিক প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে এলাম সেটিও।

কুকী-গ্রামগুলোকে চিনতে অসুবিধে নেই। 'Kuki Village'—পরিচয়জ্ঞাপক এই সাইনবোর্ড রয়েছে কোনো কোনোটির প্রবেশ-পথে।

কুকীদের সম্পর্কে অনেক শুনেছি মণিপুরে। ওরা নাকি নাগা বা মণিপুরী থেকে স্বতন্ত্র এক জাতি। শত শত বছর আগেও দু'-চারটি কুকী পরিবার এদিকে আসত। তবে তখনও ঠিক দলবদ্ধ হয়ে ওঠে নি ওরা, গোষ্ঠী গড়ে নি।

দলবদ্ধভাবে ওরা মণিপুরে প্রথম এল ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে। বহু জায়গা থেকেই নাগাদের উচ্ছেদ করল ওরা। মণিপুরে বিজয়-কেতন ওড়াল।

১৮৪৫ সালে চরমে পৌঁছুল এই কুকী-সমস্যা। মণিপুর-সম্রাট নরসিং মাথায় হাত দিলেন। কারণ, ঠিক তখনই সিংহাসনে বসেছেন তিনি। রাজ্যে প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহের আশঙ্কা করছেন।

নরসিং দেখলেন, তাঁর নিজের অবস্থাই টলমল। এ-অবস্থায় কুকীদের দমন করতে যাওয়া মানে, বিপদ ডেকে আনা। তাই তিনি পলিটিক্যাল এজেণ্ট্‌ কুলক সাহেবের শরণাপন্ন হলেন। কুকী-সমস্যার কথা যথাসম্ভব বুঝিয়ে বললেন তাঁকে।

কুলক কুকীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখলেন, ওরা

গৃহহীন; সহায়-সম্বলহীন। দক্ষিণ দিক থেকে শক্তিশালী কিছু জাতির তাড়া খেয়ে ওরা মণিপুরে ঢুকেছে। আপাততঃ চাষ এবং বাসের জমি পেলেই ওরা সন্তুষ্ট।

কুলক জমি দিলেন ওদের। মণিপুর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ওদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন। শোনা যায়, কুকী-সর্দারদের এমনকি নিজের পকেট থেকে টাকা দিতেও তিনি কসুর করেন নি।

কুকীরা সেই থেকে মণিপুরের সঙ্গে একাত্ম। কতবার বিনে মাইনেতে এ-রাজ্যের প্রহরীর কাজ করেছে ওরা! বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করেছে!

কিন্তু এখন আর ওভাবে রক্ষার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, আক্রমণ এখন বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে। বিদ্রোহী নাগারাও স্বাতন্ত্র্য চাইছে এখন। ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করছে—কুকীরা এসব কিছুর মধ্যে পারতপক্ষে থাকতে চায় না। হোক দুর্ধর্ষ প্রকৃতির, ওদের বেশির ভাগই চায় শান্তিতে বসবাস করতে।

কিন্তু কোথায় শান্তি! খানিকদূর এগোতেই দেখি, এক কুকী নারী। পথের ঠিক পাশেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। কাঁদছে হাপুস নয়নে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি দাঁড় করাল নকলো। নেমে গিয়ে নারীটির সঙ্গে কী সব যেন কথা বলল।

ফিরে আসতেই শুধালাম,—ক্যা হুয়া?

ও যা বলল তার মানে দাঁড়ায়, হয়েছে বেশ কিছুই। ঐ কুকী নারীর স্বামীকে মিলিটারী ধরে নিয়ে গেছে। মিলিটারীর সন্দেহ, বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে যোগ আছে ওর। অথচ ও বেচারী নাকি কিছুই জানে না। ধরা-পড়ার সময় ও নাকি চাষের ধান্ধায় মাঠে

খবরটা শুনে মর্মাহত হলাম সবাই। কিন্তু তবু দাঁড়াবার উপায় নেই। যে জায়গায় এসে পড়েছি, তা থেকে পিছু হটবার পথ নেই আর।

অগত্যা রোরুদ্যমানার পুরো নালিশ না শুনেই এগোতে হল। ইম্ফল-কোহিমা পথ ধরে ছুটতে হল আবার।

আশ্চর্য! পথের কোথাও হিংসা বা অশান্তির চিহ্নমাত্র নেই। দিব্যি হাসিখুশি বন-পাহাড়।

ঠিক সামনেই। পাহাড়ের গা-বেয়ে এক ঝরনা। কলকল খলখল করে হাসতে হাসতে নীচে নামছে। অশোক, অর্জুন আর মেহগনির ছায়া পথে পথে। যেন ওরা আসন বিছিয়েছে। পথিকদের বসবার অপেক্ষা শুধু।

খানিকটা নীচে উপত্যকা। সবুজের সমারোহ ওখানে। আনন্দের জোয়ার।—

অথচ কে না জানে, এ-পথে আনন্দ বড় ক্ষণস্থায়ী। যুগে যুগে হাজার অশান্তির সাক্ষী এ-পথ। •

ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট্ জন্স্টন সাহেবের কথাই ধরা যাক। এ-পথ ধরে যেতে যেতে যেতে কত কী বিপদ-আপদের মুখোমুখি হন তিনি।

তখন অবিশ্যি পথ এমন পীচ-ঢালা ছিল না। ছিল কাঁচা, পায়ে-হাঁটা। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এদিক দিয়ে আসত-যেত পথচারীরা। তবে জন্স্টন-এর ঝুঁকিটা তুলনায় বুঝি আরও বেশি ছিল। কারণ, তিনি যাচ্ছিলেন সসৈন্যে, কোহিমায় নাগা-বিদ্রোহীদের দমনে।

১৮৭৯ সাল। কোহিমায় আগুন জ্বলল। হঠাৎ ওখানকার ইংরেজ শাসনকেন্দ্র আক্রমণ করল আঙ্গামী নাগারা। শাসনকর্তা দমন্ত সাহেব নিহত হলেন। সঙ্গীসাথীরা প্রমাদ গণলেন। প্রাণ-ভয়ে পালালেন কেউ, আবার কেউ বা নাগাদের হাতে বন্দী হলেন।

তাড়াতাড়ি ইম্ফলে ইংরেজ রেসিডেন্সীতে খবর এল। জন্স্টন সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করল কোহিমার পর্যুদস্ত ইংরেজরা।

পলিটিক্যাল এজেন্ট্ জন্স্টন ইংরেজদের সম্পর্কে আগে থাকতেই অবহিত ছিলেন। যখন শুনলেন, শত্রুদের হাতে ওরা অবরুদ্ধ, তখন

কালবিলম্ব না করে তিনি সৈন্য-সংগ্রহে মনোযোগ দিলেন। মণিপুর সম্রাট চন্দ্রকীর্তির সহযোগিতায় অচিরেই প্রায় দু'হাজার সৈন্য সংগৃহীত হল। দুর্গম বন-পাহাড় ধরে বিরাট এক সরীসৃপের মতো এগিয়ে চলল সেনাবাহিনী।

এদিকে পথ নেই ভালো। পায়ে হেঁটে খানিকদূর গিয়ে সৈন্যরা স্তব্ধ। অসুস্থ কেউ। আবার কেউ বা পথ-শ্রমে দারুণ ক্লান্ত।

জনস্টন নানাভাবে উৎসাহিত করেন ওদের। মুমূর্ষু সৈন্যদের উদ্যম ফিরিয়ে আনবেন বলে উঠে-পড়ে লাগেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বহু সৈন্যকেই জীর্ণ-শীর্ণ ঝরাপাতার মতো পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হল।

সেই পথ! কালক্রমে জনস্টন সাহেবের চেষ্টায়ই রূপবদল হল তার। ১৮৮১ সালের জানুয়ারি মাসে পথ-গড়ার কাজ মোটামুটি শেষ হল।

বেশি কিছু উচ্চাশা ছিল না জনস্টন-এর। তিনি চেয়েছিলেন ইম্ফল ও কোহিমার মধ্যে অন্তত: গরুর গাড়ি চলাচলের উপযোগী পথ গড়ে উঠুক।

আগে মণিপুরের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় সবই চলতো কাছাড়ের পথ ধরে। পরবর্তীকালে এ-পথটি যত উন্নত হল, বাণিজ্যের গতি-পথও ততই এদিকে সরে এল। কাছাড় নয়, এই ইম্ফল-ডিমাপুর পথের দিকেই ব্যবসায়ীরা ঝুঁকল।

এ-পথ সারাক্ষণ কর্মব্যস্ত আজ। ব্যবসায়ী তো বটেই, মিলিটারী ও সিভিল সকল শ্রেণীর মানুষের এ-ধরে আনাগোনা।

দেখতে দেখতে বিরাট এক মিলিটারী 'কন্‌ভয়' আমাদের গা-ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। উল্টো দিক থেকে আচম্‌কা আসে ওরা। কোনোরকম জানান না দিয়েই।

এজন্যে দোষ অবিশ্যি মিলিটারীর নয়, পথের। সামনেই বিরাট এক উৎরাই; যা ধরে ট্রাক কেন, ডব্‌ল্‌-ডেকার বাস এলেও চড়াইয়ে-থাকা আমাদের মতো যাত্রীদের চোখে পড়বার কথা নয়।

চোখে প্রথম পড়ল লাল নিশানঅলা অগ্রবর্তী ট্রাকটি চড়াই বেয়ে খানিকটা উঠবার পর। নকলোর ভ্রূক্ষেপ নেই। গাড়ি ঠিক তেমনি চালাল। ঠিক আগের মতনই।

ভাবলাম, তবু ভালো। উল্টো দিক থেকে এসেছে 'কন্‌ভয়'। পেছন দিক থেকে এলে মুশকিল ছিল। নকলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারত। কারণ, ও যা মানুষ, 'কন্‌ভয়'কে 'ওভার-টেক্‌' করতে না দিয়ে হয় নিজেই যেতে চাইত সকলের আগে; আর না-হয় পথ আগলে রেখে কিছু একটা বিভ্রাট বাঁধাত।

অবিশ্যি শেষ অবধি বিভ্রাট এড়ান গেল না। কাংপোক্‌পি এবং মারাম-এর মাঝামাঝি জায়গায় পেছন দিক থেকে এল আর এক 'কন্‌ভয়'। আমাদের 'ওভার-টেক্‌' করে এগোতে চাইল।

নকলোর এতে আপত্তি। কিছুতেই সে 'কন্‌ভয়'কে পথ ছেড়ে দেবে না। শেষকালে এমন জোরে চালাল গাড়ি যে, একবার ভাবলাম, পথ ছেড়ে চিরকালের মতো না সরে দাঁড়াতে হয়। প্রায় সাত-আট শো ফুট নীচের উপত্যকাটিতে হঠাৎ না ঝাঁপ দিতে হয়।

নকলো ঝড়ের বেগে ছুটল, 'কন্‌ভয়'কে পেছনে ফেলে মরীয়া হয়েই একরকম।

আমরা তখন কাঠের পুতুলের মতো বসে; গাড়ি দুললে দুলছি, বাঁক ফিরলে বাঁকছি। ঝড়ের মুখে নিমজ্জমান নৌকোর যাত্রীর মতো চারিদিক অন্ধকার, ঝাপ্‌সা দেখছি।

খানিকক্ষণ বাদে 'কন্‌ভয়' থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌছুল নকলো। দুই পাহাড়ের মাঝামাঝি এক সমতল পথ ধরে চলবার সময় সিগারেট ধরাল।

ভাবলাম, যাক! ফাঁড়া কেটেছে। বিজয়-গর্বে আমাদের সারথিটি ঠাণ্ডা হয়েছে আপাততঃ। কিন্তু না, সে গুড়ে বালি। সিগারেটে গোটা দুই-তিন সুখটান দিতে-না দিতেই নকলো আবার

যে-কে সেই। আবার সেই ঝড় হয়ে উঠল। পাগলা হাওয়ার মতো ছুটল।

মারাম পৌঁছে দু'-চার মিনিট নিশ্চিন্তি। গাড়ি থেকে নামল নকলো। এক নাগা বন্ধুর কাছে গুজ্-গুজ্ ফিস্-ফিস্ করে কী সব যেন বলল।

আমি এদিক-ওদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। মারাম-এর শান্ত স্তব্ধ পাহাড়ীয়া পরিবেশে মন্ত্রমুগ্ধ হচ্ছিলাম যেন। ভাবছিলাম, কাংপোক্‌পির সঙ্গে এর মিল আছে। দু'টো জায়গাই যেন পেরাম্বুলেটরে শায়িত শিশুর মতো। ঠিক তেমনি নিষ্পাপ, অকলঙ্ক ও নমনীয়। পাহাড-প্রাচীর উভয়কেই চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।

মারাম এর পর পথ আরও দুর্গম। খাড়া উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। পাহাড়ের চূড়া তাক করে স্বর্গাভিসারী যেন।

বেশ শীত লাগছে এবার। অনেকটা যে ওপরে উঠেছি, তা বেশ মালুম হচ্ছে। এদিকে মিলিটারীর সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমশ। পথের পাশে, পাহাড়ের যত্র-তত্র ওদের চোখে পড়ছে।—সঙীন উঁচিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ, কেউ বা পাথরে গাঁথা দেয়ালের আড়ালে সুরক্ষিত। পাহাড়ের আড়াল থেকে সাবধানে 'হেলমেট'টি বের করে উঁকি-ঝুঁকি মারছে কেউ, কেউ আবার পথের ঠিক পাশেই মেসিন-গান, মর্টার ও সঙ্গীসাথীদের নিয়ে প্রস্তুত।

এদিককার পরিবেশে সর্বত্র যুদ্ধের আমেজ। যেন যে-কোন মুহূর্তে লড়াই শুরু হবে। প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করবে বলে সবাই আগে থাকতেই তৈরী।

এখানে প্রতিপক্ষ বলতে বিদ্রোহী নাগা। অতর্কিতে আক্রমণ হানে ওরা। প্রহরী সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘূর্ণি ঝড়ের মতো মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে চলে যায়।

কখনও ওরা বজ্রের মতো। দূর থেকে মৃত্যুবাণ পাঠায়।

পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাইফেল বা মেসিন-গান থেকে গুলি ছোঁড়ে।

সৈন্যরা দমবার পাত্র নয়। উত্তর দেয় সঙ্গে সঙ্গেই। ঝাঁক ঝাঁক গুলির আকারে। যেন ভীমরুলের চাকে ঘা পড়েছে। ঢিল পড়েছে মৌচাকে। তৎক্ষণাৎ হন্যে হয়ে ছোটা। দল বেঁধে এগিয়ে গিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করা।

শোনা যায়, ঘায়েল অনেকেই হয়। বিদ্রোহী নাগারা যেমন, ভারতীয় সৈন্যরাও তেমনি। নির্জন এই বন-পাহাড় গুলি-গোলার আওয়াজে হঠাৎ কেঁপে ওঠে। গুম গুম শব্দ শোনা যায়। পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে হতে শব্দটা দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

কারফিউ জারি হয় তারপর। এক একটা অঞ্চল ঘেরাও করে ধর-পাকড় চলে।—

ভাবছি, আজও কিছু হয়নি তো? এই কারফিউ-টারফিউ? …হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। মাও-অঞ্চলে গণ্ডগোলের খবর পেয়েছি খানিক আগে। যাচ্ছিও সেদিকেই।

ঠাণ্ডা লাগছে। হাড়-কাঁপানো হিমেল হওয়া থেকে থেকে সূঁচ ফোটাচ্ছে যেন। সাধারণতঃ এসময়ে এত শীত পড়ার কথা নয়। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে বলেই হয়তো শীত এত।

হ্যাঁ, এদিকেও হয়েছে বৃষ্টি। পথের ধারে জায়গায় জায়গায় এখনও জল জমে। আশেপাশের গাছগুলোর গায়েও জলের রেখা. ঠিক যেন ঘর্মাক্ত-কলেবর পথিক। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়েছে। একটু জিরিয়ে নিয়েই এগোবে আবার।

আমাদেরই শুধু জিরোবার বালাই নেই। শুধু এগোচ্ছি আর এগোচ্ছি। বন-পাহাড়কে পেছনে ফেলে সামনের দিকে ছুটছি কেবলই।

দেখতে দেখতে মাও পৌঁছুলাম। থমথমে গম্ভীর একটা পরিবেশ

চারিদিক থেকে আমাদের টুঁটি চেপে ধরল। দেখি, মাও-এর রাজপথ প্রশস্ত, কিন্তু লোক নেই। ঘরবাড়িগুলো মোটামুটি সুদৃশ্য, কিন্তু বাসিন্দা নেই। এমনকি ঘরের দরজা বা জানালায়ও লোক চোখে পড়ছে না।

সন্দেহ হল, এ হয়তো সকালবেলাকার 'এনকাউন্টার'-এর পরিণতি।

মাও-এর চেক্-পোস্টে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল আমাদের। নকলো গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে উপস্থিত পুলিশ এবং মিলিটারীর কাছে বিড়বিড় করে কী সব যেন বলল।

আমি তখন আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। নাগা-সমস্যার অস্পষ্ট কিছু ছবি আঁকছিলাম মনে মনে।—

এই মাও অনেক ঘটনার সাক্ষী। অনেক অশান্তি, অনেক উত্তেজনার। গত দেড় যুগ ধরে প্রায় ছ'হাজার ফুট উঁচু এই শীতল জায়গাটার আবহাওয়া ভেতরে ভেতরে তপ্ত।

১৯৫২ সালের ১৪শে অক্টোবর। উত্তেজিত নাগাদের সামনে এখানেই বক্তৃতা করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

নাগা-উত্তেজনার কিছু কারণ ছিল। ডিমাপুরে এক নাগা ছেলের ওপর আসাম-পুলিশ অত্যাচার করেছে, এই সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল সবত্র।

রাজধানী সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ১২ই অক্টোবর কোহিমায় বিরাট এক বিক্ষোভ-মিছিল বেরোয়।

মোটামুটি শান্তই ছিল মিছিল. নাগারা নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোচ্ছিল। সুসজ্জিত পুলিশবাহিনী অনুসরণ করছিল ওদের। এমন সময় হঠাৎ এক দুর্ঘটনা। কোনো একজন পুলিশ-অফিসারের মোটর-সাইকেলের ধাক্কায় জনৈক নাগা পথচারী আহত হলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে উঠল একদল নাগা। অফিসারটিকে

আক্রমণ করল। অপরদিকে অন্য এক দল চাইল তাকে বাঁচাতে।

পুলিশ সমস্ত ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝে নেবার আগেই গুলি ছুঁড়ল। এবং দুর্ভাগ্য, সেই গুলিতে মৃত্যু হল এমন একজন লোকের, যিনি পুলিশ-অফিসারটিকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন।

এই লোকটির নাম জাসিবিতো। আঙ্গামী নাগাদের উপজাতীয় আদালতের বিচারক ছিলেন তিনি। পুলিশ-অফিসারটিকে বাঁচাবেন বলে কর্তব্যবোধে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন।

আসলে গ্রাম থেকে আদালতের কাজেই সেদিন কোহিমা আসছিলেন জাসিবিতো। আসবার পথে হঠাৎ দেখলেন, ক্রুদ্ধ এক জনতা জনৈক পুলিশ-অফিসারকে নির্যাতন করছে।

যাই হোক, যা হবার তা হয়ে গেল। জাসিবিতোর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল তামাম নাগাভূমিতে।

মাও-নাগারাও অসন্তুষ্ট। বুকে এক একটি আগ্নেয়গিরি নিয়ে ওরা এল নেহরুর ভাষণ শুনতে। চাপা উত্তেজনায় গোটা মাও-এলাকা থমথমে হয়ে উঠল।

নেহরু নাগাদের প্রতি সহানুভূতি জানালেন। বললেন, সমস্ত ব্যাপারটার বিচার-বিভাগীয় তদন্ত হবে।

শোনা যায়, তদন্ত নাকি হয়েছিল। কিন্তু বিচারকদের রায়ে পুলিশী কার্যক্রম নিন্দিত হয় নি এবং মাও-এলাকায়ও শান্তি ফিরে আসে নি আর।

সেই মাও। আজও যেন আগ্নেয়গিরির বিভীষিকা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। এই মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত না করুক, যেন তারই অপেক্ষায়।

তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিক দেখছি। সামনেই পাহাড়ের গায়ে একদল মিলিটারী। রাইফেল উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। খানিকটা দূরে পাহাড়ের চূড়ায় আরও একদল। দূরবীন হাতে নিয়ে কী সব যেন দেখছে। একজন মিলিটারী অফিসার স্টেনগানে সুসজ্জিত

একটা জীপ নিয়ে ছুটলেন। আমাদেরকিন টায়ার তো কমজোরি শাখাপথ ধরলেন হঠাৎ।

খানিকক্ষণ বাদে নকলো ফিরে এল। চেক্-এর মুখের দিকে কর্মী ওকে এগিয়ে দিল গাড়ি অবধি। অন্য একজন আমাদের বলল, পথ আগলে-রাখা গাছের গুঁড়িটাকে উঠিয়ে দিয়ে। ভার্তিনাদ যাক! 'পারমিট'-এর ঝক্কি-ঝামেলা মিটল। 'পীস-সেন্টার'-এর ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত।

এগোলাম আবার। মনে পড়ল,—হাাঁ, নাগা-অশান্তির সেই থেকেই শুরু। সেই জামিবিতোর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে।

কিন্তু কোথায় হত্যা আর হানাহানি! মাও পেরিয়ে খানিকদূর যেতেই নাগাভূমির খাসমহল। সব কিছুকে ছাপিয়ে আদিম অরণ্যের রাজসূয় অভ্যাথনা।

অরণ্য এদিকে সবত্র। পাহাড়ের গায়ে, মাথায়, পাদদেশে। অদ্ভুত এক গন্ধ ভেসে আসছে তা থেকে। ভিজে চুলের মতো যেন। আর পথটা যেন ঠিক অজগরের মতো: পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলা।

পথের একপাশে গভীর খাদ। অনেক নীচে অরণ্য,—শ্যামল নয় ঠিক, ধূসর, কালো কালো।

দিব্যি এগোচ্ছিলাম। নাগাভূমির আদিম অরণ্যকে দেখতে দেখতে। হঠাৎ কী যে হল! প্রচণ্ড এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে থমকে দাঁড়াল জীপ।

তাড়াতাড়ি নামলাম গাড়ি থেকে। নকলো গাড়ির চাকা পরীক্ষা করতে লাগল।—

হ্যা, যা ভেবেছি তাই। 'টায়ার পাংচার'। পেছনের এক চাকায় বিরাট এক গজাল ফুটে আছে।

নকলো বলল,—চাকা খুলতে হবে। 'স্পেয়ার টায়ার' একটা আছে। লাগাতে হবে।

আক্রমণ করল। অ—একসঙ্গে সকলের মাথায় হাত। হ্যাঁ, টায়ার বাঁচাতে। , কিন্তু তা একেবারেই জীর্ণ ও জবুথবু। তার

পুলিশ করে এগুনো, আর বাহাত্তুরে বুড়োকে এভারেস্ট গুলি পাঠানো একই।

কিন্তু না, শেষ অবধি নির্ভর করতেই হল। নকলো কাজে হাত দিল দ্রুত। একবার বলল,—গানা লাগাও।

—গান? এই রকম এক ত্রিশঙ্কু অবস্থায়?—আব্দার বুঝে নিষে অঞ্জলি শঙ্কিত একটু।

নকলো আবার বলল,—লাগাও।

অগত্যা গাইতে হল অঞ্জলিকে। 'উড়িয়ে ধ্বজা' তো বটেই, সেই সঙ্গে আরও দু'টি।

গোপালবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌-ফিস্‌ করলেন,—মজা দেখেছ? রবিবাবুর গান নকলোরও মনে ধরেছে কেমন?

বললাম,—হ্যাঁ, বিনোদিনীর বাড়িতেও ঠিক এই একই জিনিস দেখেছি।

—না দেইখ্যা (দেখে) উপায় নাই।—ফোঁড়ন কাটলেন সুধীরবাবু, —গান যেমুন, গায়িকাও তেমুন এক নম্বরী যে।

মন্দ লাগল না গান। বিশেষ করে 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে' গানটি সেই দূর-দুর্গম পাহাড়ীয়া পরিবেশের সঙ্গে অদ্ভুতরকম খাপ খেয়ে গেল।

গোপালবাবু গান শেষ হবার পর আবৃত্তি করলেন আবার,—

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ-যে তিনি, ঐ-যে বাহির পথে॥
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি।

টায়ার জুড়তে সময় লাগল না। খানিক বাদে হাত মুছতে

মুছতে নকলো বলল,—আভি চলো। লেকিন টায়ার তো কমজোরি হ্যায়। গড়বড় হোনেসে তকলিফ হোগা।

নকলোর কথা শুনে আমরা অসহায়ভাবে এ-ওর মুখের দিকে তাকালাম। নিঝুম পাহাড়পুরী তার বিরাট শূন্যতা নিয়ে আমাদের যেন গ্রাস করতে চাইল। ঝিঁঝির একটানা ডাককে হঠাৎ আর্তনাদ বলে মনে হল যেন।

উঠতে যাচ্ছিলাম তবু। যন্ত্রচালিতের মতো পা রাখছিলাম গাড়িতে। হঠাৎ বাধা। ঝকঝকে এক অ্যামবাসাডার গাড়ি ঠিক আমাদের গা-ঘেঁষে দাঁড়াল।

গাড়িটি প্রায় খালি। যাত্রী বলতে তার চালক আর সহকারী।

—ব্যাপার কী?—জিজ্ঞাসা করতে যাব: দেখি, ওদেরও ঠিক একই জিজ্ঞাসা,—কী ব্যাপার? কলকব্জা খারাপ? না কি হাঙ্গামা-টাঙ্গামা কিছু?

বললাম,—কলকব্জাই বলতে পারেন। 'টায়ার পাংচার'।

গোপালবাবু যোগ করলেন,—জবুথবু আর একটিকে জোড়া হয়েছে। আবার 'পাংচার' দেখব বলে 'রেডী'।

অ্যামবাসাডার গাড়ির চালক আর তার সহকারীকে বাঙালী মনে হল। সহকারী শুধালেন,—যাবেন কোথায়?

বললাম,—কোহিমা।

—আমরাও ওদিকেই যাচ্ছি। কোহিমা ও ডিমাপুর হয়ে নওগাঁ।

—ও! তাই বুঝি!

—হ্যাঁ, কোহিমা আমাদের পথেই পড়বে।

একটু থেমে বললেন,—এক কাজ করুন। আমাদের গাড়িতে দু'জন উঠুন। কিছু মালপত্তরও উঠিয়ে দিন। কোহিমায় নামিয়ে দেব।

আমরা হাতে চাঁদ পেলাম যেন। হঠাৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। আমি আর অঞ্জলি উঠলাম অ্যামবাসাডারে। গোপালবাবু

আর সুধীরবাবু 'পীস-সেণ্টার'-এর জীপে। মালপত্তরগুলো দু'গাড়ির মধ্যে ভাগাভাগি করে দেয়া হল।

আবার এগোলাম। 'পীস-সেণ্টার'-এর গাড়ি আগে আগে। আমরা পেছনে।

এখানে-সেখানে মিলিটারী চোখে পড়ল আবার। কেউ পথের পাশে দাঁড়িয়ে, আবার কেউ বা ট্রাক্-এর যাত্রী।

পথে আর কোনো জনমানব নেই। চারিদিক স্তব্ধ।

অর্থাৎ, সব মিলিয়ে পরিবেশ এদিকেও থমথমে, ভয়াল। যেন যে কোনো মুহূর্তে লড়াই শুরু হতে পারে। গুলি-গোলার প্রচণ্ড শব্দে হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠতে পারে শান্ত-স্নিগ্ধ পাহাড়ভূমি।

এদিককার পাহাড়ের চেহারা আলাদা। মাও বা মারাম-এর তুলনায় খাড়া এরা। তুলনায় বেশি উদ্ধত ও বিপদসংকুল।

এদিকে উপত্যকা বড় একটা নেই। অনেক খুঁজেও এককালি সমতল ভূখণ্ড চোখে পড়ে না। পাহাড়রা সবাই যেন এ-ওর গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে।

ভাবলাম, ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের গাড়ি দু'টোও এইরকম থাকলে ভাল হ'ত। গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে না হোক, পাশাপাশি অন্ততঃ। যা দুর্গম জায়গা! যা বিপদসংকুল! যে কোনো মুহূর্তে যা কিছু ঘটতে পারে! এমন জায়গায় 'পীস-সেণ্টার'-এর গাড়ি তবু কিছুটা নিরাপদ। কিন্তু অ্যামবাসাডার?

গাড়িশুদ্ধ লোপাট হলেও বলবার কিছু নেই।

নকলো অবিশ্যি সতর্ক। একটু এগিয়ে গেলেই দাঁড় করাচ্ছিল জীপ। বার বার উঁকি মেরে দেখছিল, পেছনের আমরা ঠিকমত আসছি কি না।

কিন্তু ভাল করে দেখবারই বা জো কি! আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ। থেকে থেকে মেঘের যবনিকায় রহস্যময় চারিদিক। কা'র সাধ্যি, এমন পরিবেশে ভালো করে দেখে! খাড়া পাহাড়ের গা-বেয়ে

এগিয়ে-চলা দেশলাইয়ের বাক্সের মতো একটি গাড়ির হদিস রাখে !

আকাশ-পাতাল ভাবি আবার। নাগা-অশান্তির গোড়াকার কিছু কথা নিয়ে জল্পনা করি।

১৯৫৩ সাল। বার্মার প্রধানমন্ত্রী থাকিন ন্যুকে নিয়ে নেহরু কোহিমায় এসেছেন। নাগারাও প্রস্তুত, অভাব-অভিযোগের কথা নেহরুকে জানাবেন। কোহিমায় নাগা-সর্দার ও নেতাদের ভীড়। নাগা-পাহাড়ের দূর দুর্গম সব এলাকা থেকে ওঁরা এসেছেন। স্থির হয়েছে, ওঁদের সঙ্গে এক সভায় বসবেন নেহরু; ভারত-সরকারের, কথা বুঝিয়ে বলবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব কিছু বানচাল হয়ে গেল। নাগাভূমির জেলা-কর্তৃপক্ষরা ঘোষণা করলেন, নেহরুর ঐ সভায় নাগাদের কেউ বক্তৃতা করতে পারবেন না; এবং এমন কি লিখিত কোনো ভাষণও পড়তে পারবেন না।

নাগা-নেতারা মাথায় হাত দিলেন,—বলে কী! নিজেদের দাবী-দাওয়ার কথা বলবার সুযোগ না পেলে সভায় এসে লাভ ?

শেষ পর্যন্ত ওঁরা ঠিক করলেন, নেহরু যদি ওদের কথা না শোনেন তো ওঁরাও নেহরুর কথা শুনবেন না।

যেমন শলা-পরামর্শ, তেমনি কাজ। নির্দিষ্ট দিনে সভা শুরু হওয়া মাত্রই নাগারা চলে গেলেন। নেহরুর ভাষণকে 'বয়কট' করলেন সরাসরি।

শোনা যায়, নেহরু নাকি ভাঙা-হাটেই ভাষণ দিয়েছিলেন। মুষ্টিমেয় কিছু সরকারী কর্মচারীর সামনেই। কিন্তু এতে কাজ হয় নি। নাগাদের মধ্যে অশান্তি ও অবিশ্বাস বরং বেড়েছিল। চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, তালিকা তৈরী হচ্ছে; বেছে বেছে কিছু নাগাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

ভারত-বিরোধী নাগারা দেখল, বিপদ ! স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা মানে, পরাধীন হওয়া; যে কোনো মুহূর্তে বন্দী হওয়া পুলিশ

বা মিলিটারীর হাতে। এর চেয়ে আত্মগোপনই শ্রেয়। নিরুপায় হয়ে তখন ওরা 'নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল'-এর পরামর্শ চাইল।

কাউন্সিল সমগ্র বিষয়টাকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেন। ওদের সিদ্ধান্ত হল, উপযুক্ত সময় এখনও আসে নি। ঠিক এই মুহূর্তে নাগাভূমির স্বাধীনতার দাবী নিয়ে এগিয়ে এলে বিপদ অবধারিত। কারণ, জনসাধারণ এখনও সঙ্ঘবদ্ধ হয় নি। স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনা করার মতো শক্তি অর্জন করে নি এখনও। ফলে, এখন যদি কিছু নাগা আত্মগোপন করে তো জনসাধারণের কাছ থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। মূল সংগঠনও দুর্বল হবে ক্রমেই।

তাই 'নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল' গোড়ার দিকে আত্মগোপনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এমন কিছু ঘটল যা শুধু 'কাউন্সিল'-এর সভ্যদের কাছেই নয়, সমগ্র নাগা-সমাজের কাছেও অভিনব।

একদিন রাত্রে। কাউন্সিল সেক্রেটারী সাখরীর বাড়ি ঘেরাও করল পুলিশ। তন্ন-তন্ন করে বাড়ির প্রতিটি ঘর তল্লাশ করল

এ-খবরে কাউন্সিল-এর সঙ্গে যুক্ত সকলেই সাবধান হলেন। রাতারাতি আত্মগোপন করলেন ওরা।

এদিকে বিভিন্ন গ্রামে সশস্ত্র পুলিশের আনাগোনা শুরু হল নাগাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিল পুলিশ। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করল। ফলে, আত্মগোপনকারী নাগাদের সংখ্যা বাড়ল ক্রমেই। নাগা-পাহাড়ের বিরাট এলাকা জুড়ে সন্ত্রাস ও হিংসা ছড়িয়ে পড়ল।

ভারত-সরকার সজাগ হলেন। অতিরিক্ত পুলিশঘাটি স্থাপন করে চাইলেন অবস্থার মোকাবিলা করতে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অবস্থা আয়ত্তে এল না। দিন দিন বরং খারাপ হল। আত্মগোপনকারী নাগারা আগের তুলনায় আরও সক্রিয় হয়ে উঠল। পোস্টার এঁটে, চিঠি লিখে ভয় দেখাল সরকারী কর্মচারীদের।

নাগাদের হাতে কর্মচারীদের কেউ কেউ নিহত হলেন। আবার কেউ বা বন্দী হলেন রাতারাতি। নাগারা ওঁদের জীবনের বিনিময়ে মোটা টাকা দাবী করল।

ওদিকে পুলিশের সঙ্গেও সংঘর্ষ চলল প্রতিনিয়ত। নাগারা অস্ত্র ছিনিয়ে নিল কোথাও; কোথাও আবার বদলা নিতে গিয়ে প্রাণ দিল।

গ্রামের নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষরাও রেহাই পেল না। হয় বিদ্রোহী নাগারা অস্ত্র দাবী করল তাদের কাছে এবং সে-অস্ত্র ওদের দিতে হল; আর না হয় পুলিশ গিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করল সরাসরি। রামকে খুঁজে না পেয়ে শ্যামকে সাজা দিল।

নাগারা এতে উত্তেজিত। ভারত-সরকারকে জব্দ করবে বলে বদ্ধপরিকর। নিঃশব্দ অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ বুঝে পুলিশ বা মিলিটারীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। আবার কখনও বা সেতু উড়িয়ে দেয়, পথে-ঘাটে বাধার সৃষ্টি করে, যানবাহন চলাচল স্তব্ধ করে দিয়ে মিলিটারীকে নাস্তানাবুদ করে।

মিলিটারীও ক্রুদ্ধ। ধর-পাকড় চালায়, কারফিউ জারি করে। নাগা-পাহাড়ে সন্ত্রাস বন্ধ করবে বলে মরীয়া হয়ে ওঠে।

এদিকে দেখতে দেখতে বেশির ভাগ স্কুলে তালা পড়ে, শিক্ষকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ছাত্রছাত্রীরা ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোয় না।

নাগা যুবকদেরও বিপদ। আত্মগোপনকারীদের হাতছানি একদিকে; আবার অন্যদিকে মিলিটারীর বেয়নেট। ওদের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আত্মগোপনকারীদের দলে যোগ দিল। আবার কেউ কেউ চাইল হাঙ্গামা-হট্টগোল থেকে দূরে থাকতে।

আত্মগোপনকারীরা শেষোক্তদের সহজে রেহাই দেয়নি। হয় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিপ্লবের তালিম দিয়েছিল, আর না-হয় ভয় দেখিয়ে কাজ হাঁসিল করেছিল। অনেককেই বাধ্য করেছিল বিনা বেতনে কুলির কাজ করতে।

আসাম-সরকার এ-সংবাদে উদ্বিগ্ন হন। আইন জারি করেন সঙ্গে সঙ্গেই, প্রয়োজন হলে নাগা-পাহাড়ের যে-কোনো কুলি সরকারী কাজ করতে বাধ্য থাকবে।

এবারে নাগা যুবকরা পড়ল বিপদে। মিলিটারী ও পুলিশের ডাকে হাড়ভাঙা খাটুনি একদিকে, অন্যদিকে একই সঙ্গে আবার আত্মগোপনকারী নাগাদের তলবে অতিরিক্ত খাটুনি।

অনেকেই দু'দিকের তাল সামলাতে পারল না। নিরুপায় হয়ে দূর-দূরান্তরের গ্রামে পালিয়ে গেল কেউ। কেউ বা আত্মগোপন-কারীদের সঙ্গে যোগ দিল।

সেই আত্মগোপনকারীরা আজও আছে হয়তো বা আশে-পাশের এই বন-পাহাড়ের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে কেউ কেউ।

আকাশ-পাতাল ভাবি। নাগা-অশান্তির গোড়াকার কিছু কথা নিয়ে জল্পনা করি।

এতক্ষণে মেঘ কেটে গেছে। চারিদিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আবার। খাড়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ বন আবার আশীর্বাদ ছড়াচ্ছে।

পড়ন্ত বেলা। গাছপালার ছায়াগুলো দীর্ঘ এখন। রোদ নিস্তেজ। ছায়া-ঢাকা পথ ধরে এগোচ্ছি। শীত শীত লাগছে।

সামনের পাহাড়ের উপর দিয়ে একঝাঁক নাম-না-জানা পাখি উড়ে গেল। হঠাৎ-হাওয়ার দাপটে পাশেই দেবদারু-বন থর থর করে কেঁপে উঠল। অদ্ভুত মিষ্টি একটা সুবাস ভেসে এল বন থেকে।

অনেক দূরে পাহাড়ের গা-বেয়ে এক ঝরণা। ঠিক রুপোলী ফিতেটি যেন। মেঘলোক থেকে কেউ নামিয়ে দিয়েছে। হিমালয়-সহচরী ছোট-বড় চূড়াদের উচ্চতার হিসেব-নিকেশ হবে।

এদিকে আমাদের ঠিক পাশেই আর এক হিসেব-নিকেশ হয়ে

গেল। দু'টো কাঠবিড়ালী দাপাদাপি করতে করতে খাড়া পাহাড় বেয়ে নামল।

ভাবলাম, 'পীস-সেণ্টার'-এর জীপ? আমাদের ফেলে রেখে সে-ও নেমে যায় নি তো? অনেকক্ষণ তাকে দেখছি না।

ভালো করে তাকালাম একবার। সামনের পথটা বরাবর খানিকদূর অবধি দেখে নিলাম। না, কোথাও নেই সে। এগিয়ে গেছে হয়তো।

আমরাও এগোলাম। গোটা দুই বাঁক ফিরতেই দেখা পেলাম তার।—

দাঁড়িয়ে আছে; পথের একপাশে, পাহাড়ের গা-ঘেঁষে নকলো গোপালবাবু ও সুধীরবাবুও দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে নেমে কী সব যেন তদারকি করছেন।

—ব্যাপার কী?

এতক্ষণে আমাদের গাড়িটি জীপের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে নামতে-না-নামতেই প্রশ্ন করেছি সহযাত্রীদের।

—ব্যাপার গুরুতর,—গোপালবাবু জানান,—আবার 'টায়ার পাংচার'।

—আঃ!—আর্তনাদ করে উঠি। টায়ার-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে-পড়া নকলোর দিকে অসহায়ভাবে তাকাই।

না, চেষ্টার ত্রুটি করে নি নকলো। ভাঙা ডুবন্ত জাহাজের বিচক্ষণ ক্যাপ্টেনের মতো অনেকরকম উপস্থিত-বুদ্ধি খাটিয়েছিল। 'গানা লাগাও' বলতেই অঞ্জলিও সাধ্যমত তালিম দিয়েছিল ওকে। কিন্তু শেষ অবধি কিছুতেই কিছু হয় নি। 'স্পেয়ার টায়ার'-এর অভাবে জীপ চালু হয় নি আর।

অগত্যা নকলো পরামর্শ দিল,—তোমরা অ্যামবাসাডার নিয়ে এগোও। 'পীস-সেণ্টার'-এ পৌঁছে দুসরা গাড়ি পাঠাতে বলো।

জবাব দিলাম,—তা না হয় বলব। কিন্তু তোমাকে একলা ফেলে?

গোপালবাবুও যোগ দিলেন,—এই দুর্গম আর বিপজ্জনক জায়গায় একলা থাকবে তুমি?

নকলো আমাদের কথা শুনে হেসে আকুল। যেন একা থাকাটা কোনো ব্যাপারই নয়। আমরা রীতিমত অপ্রস্তুত। কী করব ভাবছি, এমন সময় নকলো একরকম জোর করেই গাড়িতে উঠিয়ে দিল আমাদের। অ্যামবাসাডার-এর ড্রাইভারকে বললো—'স্টার্ট!'

যেতে যেতে ভাবছিলাম, এখান থেকে খুব একটা দূরে নয় কোহিমা। বড জোর দশ মাইল। কিন্তু জায়গাটা খারাপ, যে-কোনো মুহূর্তে যা খুশি বিপদ হতে পারে।

এই তো, সেদিনও, কী ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হল এ-পথে। তিন-তিনজন মিলিটারী তো বটেই, নিরীহ কয়েকজন নাগরিকও প্রাণ হারাল।

নাগারা সরল যেমন, জেদীও তেমনি যা একবার করব বলে ভাবে, তার একটা হেস্তনেস্ত না করে সহজে হাল ছাড়ে না। তা সে খুনখারাবিই হোক, আর রাজনৈতিক কোনো সিদ্ধান্তই হোক।

১৯৫১ সাল। সারা ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হল। কিন্তু নাগা-পাহাড়ে নয়। নাগারা একজোট হয়ে নির্বাচন বয়কট করেছিল। কারণ, 'নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল' সিদ্ধান্ত নেয়, ভারতীয় সংবিধান বেআইনী; নাগাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ওতে অস্বীকৃত।

যেমন সিদ্ধান্ত, তেমনি কাজ। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নাগাদের কেউই কোনো মনোনয়নপত্র দাখিল করে নি। কেউ ভোট দেয় নি। আসাম বিধানসভায় এবং ভারতের লোকসভায় নাগাপাহাড়ের প্রতিনিধি-আসনগুলো শূন্য ছিল।

১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় অবস্থার সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও নাগা জনসাধারণের মনোভাব আগের মতোই থাকল। নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাল না প্রায় কেউই। তিনজন মাত্র প্রতিনিধি নাগা-পাহাড়ের তিনটি বিধানসভা আসনের জন্যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তবে বেশিদিন আসাম বিধানসভায় ওঁদের বসতে হয়নি। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে নাগা-পাহাড় অঞ্চল আসাম থেকে আলাদা হল: আর ওঁরাও বিধানসভার সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন।

এদিকে চরমপন্থীদের জেদ ক্রমেই বাড়ছিল। নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল-এর সঙ্গে কিছুতেই ওঁরা একমত হতে পারছিলেন না। কারণ, কাউন্সিল হিংসাত্মক কাযকলাপকে সরকারীভাবে আদৌ সমর্থন করেন নি। ভারত-সরকারের সঙ্গে অহিংস অসহযোগিতাই ছিল তার আন্দোলনের মূল কথ

কাউন্সিল-এর সভ্যরা এবার দুদলে বিভক্ত হলেন—চরমপন্থী আর নরমপন্থী চরমপন্থীরা হিংসায় বিশ্বাসী, অস্ত্র-সংগ্রহে আস্থাবান। নাগা-পাহাড়ের দুর্গম সব গ্রামাঞ্চল ওদের ঘাটি, শান্তিপ্রিয় নাগাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সবাত্মক আন্দোলন ওদের লক্ষ্য।

দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে। নাগা-পাহাড়ের বিরাট-বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিদ্রোহীরা তৎপর হয় ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে গড়ে ওঠে 'নাগা ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট' যার সংবিধানে ছিল,—

"নাগাল্যাণ্ড জনসাধারণের স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। সুদূর অতীতকাল থেকেই এরূপ চলে আসছে এই রাষ্ট্রে লোকসভা থাকবে একটি, একশ 'তাতার' বা সভ্য (এম্. পি.) নিয়ে। আর থাকবেন প্রেসিডেন্ট, যিনি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত। প্রেসিডেন্টের ক্যাবিনেটে মোট পনর জন 'কিলোনসার' (মন্ত্রী) থাকবেন। সামরিক ক্ষেত্রে নাগাল্যাণ্ড বরাবরই নিরপেক্ষতা বজায়

রাখবে। ভূমির মালিক হবে জনসাধারণ। ভূমি-কর উঠে যাবে। অন্যান্য কর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন বিভিন্ন শাখার প্রশাসন-কর্তৃপক্ষ।

জনসাধারণের উন্নতি-বিধায়ক সবরকম ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং পরিবহণ স্বাধীনভাবে চলবে এবং সে-সব চালাবার কর্তৃত্ব থাকবে জনসাধারণের ওপর। এছাড়া, নাগাল্যাণ্ডে সকলেরই ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে।"

নাগা গ্রাম ও নাগা পারিবারিক জীবনের স্বার্থরক্ষা বিষয়েও ঐ সংবিধানে কিছু মন্তব্য ছিল। এবং সবোপরি বাইশ বছরের অধিক প্রতিটি নাগরিকের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল ওতে। বলা হয়েছিল, একই কাজের জন্যে স্ত্রী ও পুরুষ একই বেতন পাবে।

'আং'-রা (গভর্ণর) তদারকি করবেন সব কিছু। বিচ্ছিন্ন এক একটি নাগা এলাকার প্রধান হবেন।

কিন্তু না, 'আং' নয়, 'কিলোনসার' বা 'তাতার' তো নয়ই, সকলের নজর পড়ল প্রধান সেনাপতি বা 'কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ্'-এর ওপর তার নির্দেশে দলে দলে নাগা হোম-গার্ড হল। সৈন্য-শিবিরে গিয়ে নাম লেখাল।

হোম-গার্ডরা নিয়মিত মাইনে পেত না। প্রয়োজন অনুযায়ী থোক কিছু কিছু টাকা পেত। অস্ত্রশস্ত্র আসত চোরাগোপ্তা পথে, হয় পুলিশ বা মিলিটারীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, আর না-হয় জনসাধারণের কাছ থেকে জবরদখল করে। এছাড়া, স্থানীয়দের তৈরী বন্দুক, বল্লম এবং বর্শাও কম আসত না।

স্থানীয়দের মধ্যে যারা শিক্ষিত, ফেডারেল গভর্ণমেন্টের আহ্বানে তাদেরও অনেকেই এগিয়ে এল। নার্স, কম্পাউণ্ডার এবং গ্রামের মোড়ল-মাতব্বরও বাদ গেল না।

বিদ্রোহীরা এইবার চূড়ান্ত আঘাত হানল। নাগা-পাহাড়ের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল অশান্তির আগুন। বহু পুলিশ এবং মিলিটারী নিহত হল। সরকারী কর্মচারীদের কেউ কেউ বেঘোরে প্রাণ দিল।

খুন-জখম, লুঠতরাজ এবং রাহাজানি চরমে উঠল। আসাম পুলিশ এবং আসাম রাইফেল্‌স্‌-এর আয়ত্তের বাইরে গেল পরিস্থিতি। কারণ, শুধমাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সংখ্যাই তখন প্রায় বিশ হাজার।...

তাই বলছিলাম, নাগারা সরল যেমন, জেদীও তেমনি। বিদ্রোহের আগুন এখনও ওদের বুকে ধিকি-ধিকি জ্বলছে। নকলো বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয় নি, শুধমাত্র এই অপরাধেও মৃত্যুদণ্ড হতে পারে তার।

হয়েছে এরকম, কত নাকি হয়েছে। নকলোর কাছেই শুনেছি,—

একবার এক নাগা যুবক 'আং'-এর ডাকে সাড়া না দিয়ে ভারত সরকারের অধীনে কাজ নেয়। মোটর ড্রাইভারের কাজ।...এক মাসও পেরোয় নি। একদিন, দেখা গেল, যুবকটির মুণ্ডহীন দেহ গাড়ির ইঞ্জিনের সামনে

সত্যি? এমনও হয়?—পথে যেতে কত কী ভাবি সেদিন। শিউরে উঠি।

ওদিকে পশ্চিমাকাশ লালচে রং ধরে। শ্যামল পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বিদায়ী রোদ চিক-চিক করে। পশ্চিম-দিগন্তকে আড়াল-করা চূড়াগুলো থেকে রাঙা আলো ঠিকরে বেরোয়। দেখতে দেখতে সারা বন-পাহাড় জুড়ে আশ্চর্য অদ্ভুত এক সন্ধ্যারতি শুরু হয় যেন। মন-প্রাণ বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

এমনি বিষণ্ণ আগেও বহুবার হয়েছি। পাহাড়ীয়া বনপথে সূর্য-বিদায়ের ঘনঘটা দেখে স্তব্ধ হয়েছি কতবার কিন্তু এ যেন আলাদা একটু।

এ-পথের গা-ঘেঁষে সারি সারি একশিলা স্তম্ভ। যেন জমাট-বাঁধা বিষণ্ণতা।

স্তম্ভের ঠিক নেই কিছু। কোথাও এক, কোথাও দুই, তিন বা ততোধিক। বেলে-পাথরের টুকরো সব। প্রায় আয়তাকার। মাথার

দিকটা থ্যাবড়া মতো। পুরু বড় জোর আট-দশ ইঞ্চি। লম্বায় এমন কি আট-দশ ফুট অবধি।

খাসিয়া পাহাড়েও এ-ধরনের স্তম্ভ দেখেছি। তবে ওরা তুলনায় আরও বড়। চৌদ্দ-পনের এবং এমন কি কুড়ি ফুট অবধি উঁচু।

খাসিয়াদের দেশে এই স্তম্ভ দেখলে বুঝতে হবে, পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ করছে ওরা। কিন্তু নাগা-পাহাড়ে এর তাৎপর্য ভিন্ন। এখানে উৎসবের স্মৃতি বহন করে এরা; ধনী কেউ বড় গোছের কোনো ভোজ দিলেন, গা-সুদ্ধ লোক খেল—সেই স্মৃতি।

ভোজদাতার উদ্যোগেই স্থাপন করা হয় এদের। উৎসবশেষে গ্রামের প্রধান-পথের দু'পাশে সাধারণতঃ এদের রাখা হয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। বাঁ থেকে ডাইনে ক্রমশ ছোট হয়ে এলো এরা। যেখানে অনেকগুলো স্তম্ভ, সেখানে জোড়-সংখ্যায় কোথাও, আবার কোথাও বে-জোড়ে এসে শেষ হল।

খাসিয়া পাহাড়ে একশিলা স্তম্ভের সংখ্যা সবত্রই বে-জোড়। বড়টি আছে মাঝখানে। আর তার দু'পাশে একটি, দু'টি বা তিনটি করে আছে অপেক্ষাকৃত ছোটরা।

নাগা-পাহাড়ে দেখলাম, স্তম্ভের সংখ্যার ঠিক নেই কিছু: আটটা কোথাও, কোথাও আবার এগারোটা।

শুনেছি, একই উৎসবের স্মরণে একাধিক স্তম্ভ থাকতে পারে। আর আঙ্গামী-নাগাদের প্রধান উৎসব বলতে বোঝায় তেরহেঙ্গী এবং সেকরেঙ্গী।

তেরহেঙ্গী হল 'ফসল-তোলা'-র উৎসব। আর সেকরেঙ্গী ফসল-বোনার। উভয় উৎসবই দশ দিন ধরে চলে। প্রচুর 'জু' (ভাত থেকে তৈরী মদ), মাংস আর ভাত খাওয়ান হয়। একশিলা স্তম্ভ আসে। প্রায়ই অনেক দূর থেকে। শোনা যায়, অদ্ভুত একরকম কাঠের 'স্লেজ'-এ করে অনেক কষ্টে আনা হয় ওদের।

তা হোক। কিন্তু এত বিষণ্ণ কেন ওরা? সন্ধ্যা-সমাগমে

মূর্তিমান শোকের মতো। যেন গোটা নাগা-পাহাড়কে করুণ ও স্তব্ধ করে রেখেছে।

একটু সহানুভূতি জানালেই তামাম বনভূমি থরথর কেঁপে উঠবে। তারে ঘা-পড়া সেতার বা সরোদের মতো কথা কইবে। বেহাগ বা পূরবীর তানে আর্তনাদ করবে চারিদিক।

রক্ত নেহাৎ তো কম ঝরে নি এ-পথে। সংঘর্ষ কম হয় নি। বুলেট-বেঁধা বর্শাটা চেপে ধরে কতজন চিৎকার করেছে—'জল! জল!'

প্রায় ক্ষেত্রেই সাহায্য কিছু মেলে নি। দুর্গম পাহাড়ে মুমূর্ষুর আর্তনাদ ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়েছে। প্রতিবেশী অরণ্য থেকে একটা-দু'টো ঝরাপাতা হতভাগ্যের দেহে এসে পড়েছে। এবং তারপরেই সব চুপ। মৃত্যুর প্রশান্তি নেমেছে অরণ্যে। আবার কখনও বা মর্মরধ্বনি ঘুম-পাড়ানিয়া গান গেয়েছে।

সেই গান আর প্রশান্তি, আর্তনাদ আর দীর্ঘশ্বাস। সব যেন জমাট-বাঁধা আজও। সহানুভূতির সামান্য একটু ছোঁয়া পেলেই গলতে শুরু করবে। তামাম বনভূমি কাঁপতে কাঁপতে কথা কইবে।

—কর্তা!

ড্রাইভারের ডাক শুনে চমকে উঠি,—কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ।

—কী?

—যাইবেন ত কুহিমা?

—হ্যাঁ।

—কুহিমার কুন (কোন) জায়গায়?

—'পীস-সেণ্টার'।

—চিনি না যে।

—চিনবেন,—বললেন, গোপালবাবু,—শহরে ঢুকে কাউকে বললেই দেখিয়ে দেবে।

—শহর ত আইয়া (এসে) পড়ছি!—আদি ও অকৃত্রিম পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় ড্রাইভার জানাল।

তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ, শহরই বটে। খানিকটা দূরে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে।

আমাদের আশেপাশে শহরতলী। ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ি এখানে-সেখানে। ঝাপসা, অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে রহস্যময়।

রাজধানী কোহিমায় রহস্য জমাট নয় অতটা। পথে পথে বাতি জ্বলছে। শহরতলী থেকেও স্পষ্ট চোখে পড়ছে আলোর প্রসাধন।

আরও খানিকটা এগোতেই শহর শুরু।—

না, ইম্ফলের মতো সমতল এ নয়, পাহাড়-ঘেরাও নয়। এ পাহাড়েরই ওপরে, মাঝ-মধ্যিখানে একেবারে। এর সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে সর্বত্র খাড়া পাহাড়। আদলের দিক থেকে এর মিল সিমলা-দার্জিলিং বা মুসৌরী-রাণীক্ষেতের সঙ্গে; শ্রীনগর-কুলু, কাঠমাণ্ডু বা ইম্ফলের সঙ্গে নয়। কারণ, শেষের ওরা প্রায়-সমতল উপত্যকার বুকে, আগের ওদের মতো খাড়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে নয়

—কর্তা!

ড্রাইভারের ডাক শুনে ফিরে তাকাই আবার,—কী?

—কই না যাইবেন, কইছিলেন? জিগান কাউরে

কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করব? পথ দিয়ে যারা চলেছে, তাদের প্রায় সকলেই নাগা। ওরা কি আমার কথা বুঝবে?

ড্রাইভারের কথার জবাব না দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি। হঠাৎ দেখি, পথে আমাদের ঠিক সামনেই এক ভদ্রলোক; ধুতি পাঞ্জাবি ও চাদর গায়ে। সন্দেহ হল, বাঙালী নন তো?

ড্রাইভারকে বললাম,—থামুন একটু।

থামতেই গাড়ি থেকে নেমে সোজা এগোলাম ভদ্রলোকটির দিকে। ইংরেজীতে বললাম,—'পীস-সেন্টারে' যাব। দয়া করে বলবেন একটু, কোন্‌দিকে?

ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় জবাব দিলেন,—ইংরেজী কেন, বাংলায়ই বলুন না! মনে হচ্ছে, আপনারা বাঙালী!

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।—বাংলায় বললাম এবার।

ভদ্রলোক জানালেন,—'পীস-সেণ্টার' বেশি দূরে নয় এখান থেকে; বড় জোর আধ মাইল।...সামনের এই রাস্তাটা ধরে সোজা এগিয়ে যান। বাঁ-পাশের দুটো রাস্তা বাদ দিয়ে তৃতীয়টা ধরুন। ডানদিকে এগোন তারপর। খানিকদূর এগিয়ে বাঁ-দিকে আবার মোড় ফিরুন। দেখবেন, সামনেই 'পীস-সেণ্টার'।

বললাম,—সব তালগোল পাকিয়ে গেল. বাম-ডান, 'পীস-সেণ্টার', সব।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন,—বেশ, চলুন তবে! দেখিয়ে দিচ্ছি।

অবাক হয়ে বললাম,—আপনি আবার কষ্ট করবেন এতটা?

—তাতে কী!—বলেই তিনি সঙ্গী হলেন আমাদের।

যেতে যেতে আলাপ হল তাঁর সঙ্গে। নাম চিন্ময় রায়। কোহিমায় রেডিও স্টেশনে কাজ করেন। কয়েক মাস হল এসেছেন।

'পীস-সেণ্টার'-এ আমাদের পৌঁছে দিয়ে চিন্ময়বাবু বিদায় নিলেন। 'আবার আসবো' বলে ছুটেই পালালেন একরকম।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে 'পীস-সেণ্টার'-এর দিকে তাকালাম।—পাহাড়ের গায়ে বাংলো ধরনের একতলা বাড়ি। স্তব্ধ, নিঝুম। হঠাৎ দেখলে জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না।

পথ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেল বাড়িটির দিকে। পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠল।

ভাবছিলাম, আমরাও উঠি এইবার, সিঁড়িপথ ধরি। এমন সময় হঠাৎ দেখি, এক ভদ্রমহিলা; আমাদের দিকেই এগোচ্ছেন, নামছেন সিঁড়ি বেয়ে।

মুখোমুখি হতেই শুধালেন,—আপনারা ?

গোপালবাবু পরিচয় দিযে বললেন,—ডঃ আরামের বন্ধু। আসছি ইম্ফল থেকে।

—ওঃ। তাই বলুন! আপনাদেরই না আসবার কথা ছিল আজ ?

গোপালবাবু বললেন,—হ্যা, আমাদেরই

—দেরী হল যে আসতে ?

—জীপ-বিভ্রাট। গাড়ি খারাপ হয পথে

—খারাপ হয ?—বলেই ভদ্রমহিলা যেন ক্ষমা চেয়ে নিলেন,—ছিঃ ছিঃ। কী লজ্জার কথা! কষ্ট হল কত!

বললাম,—কষ্ট আমাদের নয, ওদের অ্যামবাসাডার গাড়ির ওই সহযাত্রীদের। কষ্ট করে ওরাই আমাদের লিফ্‌ট্ দিলেন

—ওঁদের কাছে 'পীস-সেন্টার' কৃতজ্ঞ অশেষ কৃতজ্ঞ।—বলেই ভদ্রমহিলা আহ্বান জানালেন আমাদের,—কই! আসুন! দাঁড়িযে কেন ?

আমরা অ্যাম্‌বাসাডার গাড়ির সহযাত্রীদের একরকম জোর করেই সামান্য কিছু টাকা গছিযে দিয়ে এগোলাম সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মহিলাটিকে বললাম,—এক কাজ করুন। শীগ্‌গির গাড়ি পাঠিয়ে দিন একটা। একজন অপেক্ষা করছে এখান থেকে আট দশ মাইল দূরে, ইম্ফল-কোহিমা রোডে

মহিলা বললেন,—গাড়ি পাঠাতে সময় নেবে একটু। ডঃ আরাম ফেরা অবধি অপেক্ষা করতে হবে

শুধালাম,—ডঃ আরাম কি বাইরে এখন ?

—বাইরে মানে, দূরে কোথাও নয়। কোহিমাতেই

—আর মিসেস আরাম ?

—আপনাদের সামনেই।

—অ্যাঃ! 'পীস-সেন্টারে' ঢোকবার মুহূর্তে হঠাৎ দারুণভাবে

চমকে উঠি। ভাবতেই পারি নি যে, ইনি মিসেস আরাম। এঁর অতি সাধারণ পোশাক-আশাক, চেহারা এবং চালচলন দেখে বরং মনে হয়েছিল, 'পীস-সেন্টার'-এর কোনো কর্মী।

ঘরে ঢুকে মিসেস আরামের দিকে ভালো করে তাকালাম।—রোগা লম্বা গোছের চেহারা। পরনে আধ-ময়লা শাড়ি। গায়ে নাগা চাদর। প্রসাধনের চিহ্নও নেই হাবভাবে। মুখ শুকনো, চুল উসকো-খুসকো। হাতে কী সব ময়লা লেগে। যেন এইমাত্র ঢেঁকিশাল থেকে এলেন, অথবা এলেন ঘুঁটে দিয়ে।

গোপালবাবুর কাছে শুনেছিলাম বটে, ডঃ আরামের স্ত্রী বাঙালী। কিন্তু তিনি যে এমন অনাদি ও অকৃত্রিম, তা জানব কী করে!

এদিকে 'পীস-সেন্টার'-এর বসবার ঘরটিতে কিন্তু নাগা-সংস্কৃতির ছাপ। দেয়ালের গায়ে বিরাট এক নাগা বর্শা। পাশেই একটি ভীষণ আকারের দা। 'বুক শেলফ্'এ নাগা-ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে বহু বই। দরজায় এবং জানালায় নাগাভূমির তৈরী পর্দা।

সোফাগুলি কোথাকার তৈরী, জানি না। তিন সেট ছিল মোট। কার্পেট-বিছানো ঘরে অতি সুন্দর করে সাজানো।

তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছিলাম। হঠাৎ মিসেস আরাম তাড়া দিলেন,—নিন, উঠুন এবার। হাত-মুখ ধুয়ে নিন।

বললাম,—বেশ তো আছি! আবার ঝামেলা কেন?

বলতে বলতেই গাড়ির আওয়াজ। 'পীস-সেন্টার'-এর একেবারে সামনে।

মিসেস আরাম বললেন,—এসে গেছেন। উনিই হয়তো।

—উনি? মানে ডঃ আরাম?—বলেই গোপালবাবু উঠলেন সকলের আগে। দরজার দিকে এগোলেন। আমরা সবাই তাঁকে অনুসরণ করলাম।

ঘরের বাইরে যেতেই ডঃ আরামের সঙ্গে দেখা। 'হ্যালো—হ্যালো', বলতে বলতে গোপালবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপর আলাপ-পরিচয় আমাদের সঙ্গে। আদর-আপ্যায়নের ঘনঘটা।

একফাঁকে গোপালবাবু গাড়ির কথা বললেন,—বেচারী নকলো! এখনও পথেই হয়তো!

ডঃ আরাম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। তাড়াতাড়ি গাড়ি পাঠালেন।

অদ্ভুত মানুষ এই ডঃ আরাম। শুনেছি, দক্ষিণ-ভারতের কোন্ এক কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। কোয়েম্বাটুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদও পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি। সব ছেড়ে-ছুড়ে এইখানে পড়ে আছেন। জন্মভূমি সেই সুদূর তামিলনাড়ু থেকে এসে নাগাভূমির কল্যাণের কথা ভাবছেন।

এখন একটাই লক্ষ্য ওঁর,—নাগাভূমিতে শান্তি। যেমন করে হোক তা আনতে হবে; জীবন দিয়ে হলেও।

সেদিন ডঃ আরামের সঙ্গে কথা বলার সময় শান্তির প্রসঙ্গই বার বার ঘুরে-ফিরে এলো।

শুধালাম,—অবস্থা এখন কীরকম?

ডঃ আরাম বললেন,—ভালো। বেশ ভালো। ১৯৬৪ থেকে ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে।

গোপালবাবু বললেন—উন্নতির পেছনে 'পীস-সেন্টার' এর অবদান নিশ্চয় অনেকখানি?

ডঃ আরাম জবাব দিলেন,—শুধু 'পীস-সেন্টার' কেন, অবদান অনেক কিছুরই। ১৯৬৩-র ১লা ডিসেম্বর থেকে নতুন যুগের সূচনা। হ্যাঁ, ঐদিনই জন্ম নিল নতুন রাজ্য 'নাগাল্যাণ্ড'। ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত পূর্ণ একটি প্রদেশের মর্যাদা সে পেল। তারপর ১৯৬৪-র গোড়ার দিকে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হল এখানে। দলে দলে নাগা ভোট দিল। 'পীস মিশন' কাজ শুরু করল ১৯৬৪-র এপ্রিলে। ভারত-সরকার এবং আত্মগোপনকারী নাগাদের মধ্যে মধ্যস্থের

ভূমিকা নিল। এবং অবশেষে ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বরে হল যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি।

শুধালাম,—চুক্তির সর্ত সবাই কি ঠিক মানে?

ডঃ আরাম বললেন,—মানে; পুরো না হোক, কিছুটা। এ-অঞ্চল মোটামুটি নিরুপদ্রব এখন। নাগাদের উচ্ছল উদ্দাম জীবনকে সবাই ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে পারেন।

প্রশ্ন করলাম,—দেখা বলতে?

ডঃ আরাম বললেন,—বড় কিছু নয়, অতি সাধারণ সব ঘটনা।··· উৎসবে নাগা বন্ধুরা নাচছে। গাইছে প্রাণ খুলে। ছেলেমেয়েরা বৃষ্টিতে ভিজে হুল্লোড় করছে। খেলছে কাদা ছুঁড়ে ছুঁড়ে। সোনালী মাঠে চাষী ভাইরা ফসল কাটছে। গানে গানে মুখর করে তুলছে চারিদিক। আর···

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন ডঃ আরাম। হঠাৎ বাধা পড়ে। বছর খানেকের একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢোকে এক যুবক।

মেয়েটি ডঃ আরামকে দেখা-মাত্রই নেচে-কুঁদে অস্থির। পারলে কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে।

ডঃ আরাম যুবকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন,—এই হল অর্ধনারীশ্বর: সংক্ষেপে আন্দু, আমার সহকর্মী। আর এঁরা সবাই বন্ধু: বেড়াতে এসেছেন।

সবাই দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম আন্দুকে। মেয়েটি ততক্ষণে ডঃ আরামের কোলে ঝাপিয়ে পড়েছে। মিসেস আরাম এলেন একরাশ খাবার নিয়ে।

—এই হল কাজিবিন্দু।—মেয়েটিকে আদর করতে করতে ডঃ আরাম বললেন,—আমার মেয়ে।

আবার আমাদের অবাক হবার পালা। কারণ, ডঃ আরামকে দেখে মনে হচ্ছিল, পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই করছেন। মেয়ে নয়, নাতনীকে কোলে নিয়েছেন।

—কাজিবিন্নু মানে জানেন তো?—ডঃ আরাম শুরু করলেন আবার,—আঙ্গামী নাগায কাজি মানে 'পীস'। বিন্নু মানে 'বী উইথ ইউ'।

নামের মানে শুনে গোপালবাবু মুগ্ধ

—বাঃ! ভারী সুন্দর নাম তো!—তিনি বললেন,—ঠিক যেন বাপের 'আইডিয়েল' জুড়ে-বসা!

—আর আইডিয়েল!—গোপালবাবুর শেষের কথাটি লুফে নিতে নিতে ঘরে ঢুকলেন এক বৃদ্ধা। হাপাতে হাপাতে বললেন, —'আইডিয়েল' বলে আজকাল কিছু নেই থাকলে আদ্দু অমন হন্‌হন্ করে ছোটে? জব্দ করে আমায?

—কোথায আর জব্দ করেছি?—বললে আদ্দু,—দিব্যি তো পৌঁছে গেছেন দেখছি। আমার সঙ্গে সঙ্গেই

বৃদ্ধা রাজ্যের বিরক্তি উদ্গিরণ করে বললেন,—ইচ্ছে করলে তোমার আগেও পৌঁছুতে পারতাম জানো, এখনো আমি হানড্রেড পারসেন্ট্ 'ফিট্'

আদ্দু সান্ত্বনা দিল,—হ্যা হ্যা, 'ফিট্' তো বটেই! তা না হলে যখন-তখন অমন ঘোরেন? পাল্লা দেন আমাদের সঙ্গে

—ও! ইয়েস্ ইয়েস্!—ডঃ আরাম মধ্যস্থতা করেন এবার। আমাদের সঙ্গে বৃদ্ধার পরিচয করিয়ে দেন,—ইনি মিস মহান্তি, উড়িষ্যা থেকে এসেছেন। আর এঁরা আমার বন্ধু। এইমাত্র এলেন।

হাত তুলে নমস্কার করলাম মিস মহান্তি প্রথম পরিচযেই ক্ষমা চেয়ে নিলেন,—কিছু মনে করবেন না! আদ্দুর সঙ্গে এই রকম কথা কাটাকাটি আমার প্রাযই হয।

আদ্দুও বললে,—কিছু মনে করবেন না। মিস মহান্তির সঙ্গে প্রায়ই হয় এরকম। উনি যে ছাড়বেন না! পারুন না পারুন সব জায়গাতেই যাওযা চাই।

মিস মহান্তি জ্বলে উঠলেন আবার,—ওঃ! তাই বুঝি?

—তাই নয়?—আদ্দুর চ্যালেঞ্জ,—আজ বিকেলে জোর করে বেরুন নি আমার সঙ্গে? কাজিবিন্নুকে নিয়ে যখন ঘুরতে যাচ্ছি, তখন?

মিস মহান্তি বললেন,—হ্যাঁ, বেরিয়েছি। কিন্তু কী হয়েছে তা'তে? কা'র কী অপকার হয়েছে? আদ্দু, জেনে রেখো, এখনও আমি হানড্রেড পারসেন্ট ফিট্।

—ওঃ! ইয়েস ইয়েস!—ডঃ আরাম মধ্যস্থতা করলেন আবার। আদ্দুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,—প্লীজ!

—প্লীজ!—সেদিনই ভিন্ন একজনকে এই একই কথা বলতে শোনা গেল।

নকলো ফিরে এসে অঞ্জলিকে ধরে বসল,—গানা লাগাও, প্লীজ!

আমরা তখন 'পীস-সেণ্টার'-এর বাইরে পায়চারি করছি। ডঃ আরাম ঘরে বসে কী একটা জরুরী কাজ সারছেন।

নকলোর অনুরোধ এড়াতে চাইল অঞ্জলি,—আজ থাক, টায়ারড্!

কিন্তু নকলোর সেই এক কথা,—প্লীজ!

অগত্যা গাইতে হল অঞ্জলিকে: 'পীস-সেণ্টার'-এর বাইরে, বারান্দায় বসে। আর আমার মনে হল, গান এখানকার আকাশে-বাতাসে; বেরিয়ে পড়ি, আড়ালে গিয়ে কান পাতি একবার।

বেরোলাম। গানের আসর থেকে সরে পড়লাম চুপি চুপি।—

আকাশে তখন লক্ষ তারার সমারোহ। মাটিতেও হাজার হাজার ওরা। যেন চেনা যাচ্ছে না ঠিক, কোন্‌টা আকাশের, আর কোন্‌টা মাটির। কোন্‌টা কালো পাহাড়ের গায়ে গায়ে জ্বলে-ওঠা, আর কোন্‌টা আকাশের বুক চিরে ফুটে-ওঠা। এগিয়ে চলি। 'পীস-সেণ্টার'-এর সামনেকার পথটা ধরে। সোজা।

পথ নিঝুম, স্তব্ধ। সামনেই একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে

ঘুমুচ্ছে। খানিকটা দূরে গোটা দুই ভেড়া; নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে।

বেশ ঠাণ্ডা। উত্তুরে হওয়া চাবুক হাতে যেন; ঘা মারছে এলোপাথাড়ি। সামনে-পেছনে মর্মরধ্বনি উঠছে। যেন ফিস্-ফিস্ করে কথা কইছে কা'রা।

শৈল-শহরে নিরিবিলিতে এইরকম কথা বহুবার শুনেছি। কুলুতে শুনেছি বিপাশার জলতরঙ্গ, কাঠমাণ্ডুতে বাগমতীর, দার্জিলিঙে পাইনের, আবার শ্রীনগরে পপলারের।

শহর যেমন আলাদা, কথাও তেমনি আলাদা হতে বাধ্য। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে কোথায় যেন আবার মিলও আছে। সবাই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে,—'বেরিয়ে পড়ো। এগিয়ে যাও।' তামাম হিমালয় জুড়ে যেন একটাই কথা উচ্চারিত হচ্ছে বার বার,— 'এগিয়ে যাও।'

কিন্তু কোথায় এগোব? কতদূর অবধি এগোব? হিমালয় কি দেখে শেষ করতে পারে কেউ? আকাশ লক্ষ তারার মালা গেঁথে যাঁকে বন্দনা করছে, মানুষ পারে তাঁর মহিমার পরিমাপ করতে?

আকাশ-পাতাল ভাবি। জনশূন্য পথটা ধরে ফিরি ধীরে ধীরে। দূর থেকে অঞ্জলির গান ভেসে আসে—

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে॥
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত
আমারি অঙ্গে বিকাশে॥

পরদিন। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। তাকিয়ে দেখি, 'পীস-সেণ্টার'-এ অবিচ্ছিন্ন 'পীস', অনাবিল শান্তি; কেউ ঘুম থেকে ওঠেন নি।

দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। ঠিক ভোর হয় নি তখনও, হবো-হবো। পুব-পাহাড়ের গায়ে গায়ে সহস্র সলজ্জ বধূ। আকাশ ওখানে আরক্তিম।

আশেপাশের পাহাড়গুলো অস্পষ্ট। ওড়নার আড়ালে ঢাকা সুন্দরীরা যেন।

এগোলাম আর একটু. 'পীস-সেণ্টার'-এর ডানদিকের 'লন' পেরিয়ে গ্যারেজ বরাবর।

দেখি, একমনে কাজ করছে নকলো। গ্যারেজে আলো জ্বেলে জীপ সারাচ্ছে। বললাম,—নকলো? তুমি? এই এত ভোরে?

প্রশ্ন শুনে নকলো আমার দিকে তাকাল একবার। একটু যেন অবাক হল।

আবার বললাম,—খুব ব্যস্ত? গাড়ি সারাচ্ছ বুঝি?

নকলো সংক্ষিপ্ত জবাব দিল,—জী সাহাব! রাতভর।

—মানে, সারা রাত?—বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি,—না ঘুমিয়ে একটানা?

—জী সাহাব!

—কেন? কী হয়েছে এর?

—বেমার। টায়ার মে: মেশিন মে ভি.

—এতে চেপেই আসছিলাম না?

—হ্যা হ্যা, এহি। আপকো ঘুমানে কা লিয়ে ভি ইস্‌কো তৈয়ার রাখনা.

বুঝলাম এতক্ষণে; শুধু টায়ার নয়, যন্ত্রপাতিও সারাচ্ছে নকলো। এই জীপে করেই আমাদের ঘুরবার কথা।

কিন্তু জীপ সারাবার জন্যে কেউ তো ওকে নির্দেশ দেয় নি! যতদূর জানি, ডঃ আরাম তো দূরের কথা, আদ্দুও বলে নি কিছু!

তবে? নকলো কি নিজের থেকেই করছে এসব? পাছে আমাদের অসুবিধে হয় ভেবে?···আশ্চর্য!

নকলোকে যত দেখছি ততই অবাক লাগছে। 'পীস-ক্যাম্প' থেকে ফেরার সময় অন্য মূর্তি তার। শান্তির বদলে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব।

ঘটনাটা খুলেই বলি।—

সকালে চায়ের আসরে ঠিক হল, 'পীস-সেণ্টার'-এর গেস্ট্ আমরা : 'পীস-ক্যাম্প' দেখে সফর শুরু হবে।

ক্যাম্প বেশি দূরে নয় কোহিমা থেকে, ছ' মাইল মাত্র। আদ্দু সঙ্গে থাকবে আমাদের ; নকলো গাড়ি চালাবে।

'পীস-ক্যাম্প' আজকের নাগাভূমির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আত্মগোপনকারী নাগা এবং সরকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হয় ওখানে। খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা হয়। 'পীস-সেণ্টার'-এর তরফ থেকে শান্তিকামীরা উপস্থিত থাকেন। উভয়পক্ষকেই পরামর্শ দেন সাধ্যমত। এ-ছাড়া, আত্মগোপনকারীরা প্রায়ই আসে ওখানে ; থাকে, শলা-পরামর্শ করে। না, মিলিটারী বা পুলিশের হস্তক্ষেপ ওখানে নিষিদ্ধ।

ডঃ আরাম বলেছিলেন,—বলা যায় না, আত্মগোপনকারীদের দেখা পেলেও পেতে পারেন। এমন কি আজই।

খোদ ডিরেক্টারের আশ্বাস। আমরা উল্লসিত সঙ্গে সঙ্গে। পারলে তখনই নকলো আর আদ্দুকে নিয়ে ছুটি।

কিন্তু না, ছুটতে ছুটতে ন'টা বেজে গেল। গাড়ির টুকটাক কাজগুলো সেরে নিতে আরও কিছু সময় নিল নকলো।

যাবার পথে দেখলাম, কোহিমার দারিদ্র্য। আর দশটা শৈল-শহরের মতো জেল্লা নেই তা'র। ঘরবাড়ির জৌলুস নেই। নেহাৎই কাজ-চলা গোছের আয়োজন।

বাহারী দোকানপাট নেই কোহিমায়, লোকজনের পোশাক-আশাকে চটক নেই : সব কিছুই অতি সাধারণ।

দেখতে দেখতে এগোই। শহর ছাড়িয়ে নিরালা এক পথ ধরি।

আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ। এবড়ো-খেবড়ো। তার জায়গায় জায়গায় বুনো ঘাস, দু'ধার থেকে এগিয়ে-আসা লতাপাতা। কোথাও শ্যাওলায় ঢাকা সে, দারুণ পিছল। গাড়ি যে-কোনো মুহূর্তে হড়কে যেতে পারে; পাতালে নামতে পারে সোজা।

একপাশে গভীর খাদ। যেন ফাঁদ পেতে দাঁড়িয়ে। অথচ নকলোর ভ্রূক্ষেপ নেই। চালাচ্ছে ঝড়ের বেগে। খানাখন্দের মধ্যে পড়ে গাড়ি লাফিয়ে উঠছে এক একবার। মনে হচ্ছে, হল বলে :— ডাব্‌ল্ প্রমোশন; পাতাল যেতে যেতে স্বর্গ-যাত্রা।

শ্যাওলার ওপর দিয়ে যাবার সময় প্যাঁচ-প্যাঁচ শব্দ উঠছে একটা। রহস্যময় শোনাচ্ছে। মিস মহান্তি আৎকে উঠছেন থেকে থেকে। আদ্দুকে বলছেন,—বলো না একটু: নকলোকে বলো, সাবধানে চালাক

আদ্দু বলে নি কিছু। আমরা'ও না। কী বলবো? নকলো কি কান দেবে ওতে? যা একরোখা। বললে ফল হয়তো উল্টো দাঁড়াবে

অবিশ্যি রোখ মিস মহান্তিরও কম নয়। নিষেধ সত্ত্বেও সঙ্গ নিয়েছেন।

'হানড্রেড্ পারসেন্ট ফিট্', আর 'পীস-ক্যাম্প' দেখব না?— বলেছেন বার বার।

গোপালবাবুর করুণা সর্বজনে। নিরুপায় হয়ে শেষ অবধি সায় দিয়েছেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখবেন বৈকি! নিশ্চয় দেখবেন।

—দেখুন এইবার। প্রাণভরে দেখুন।—একটু আগে মিস মহান্তির উদ্দেশ্যে বলা আদ্দুর কথাগুলো স্বগতোক্তির মতো শোনাল; এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ভীষণভাবে লাফিয়ে উঠল গাড়ি। মিস মহান্তি 'হেল্‌প, হেল্‌প' বলে চীৎকার করে উঠলেন। নকলো ব্রেক কষল।

আমরা সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

না, কিছু হয় নি সে-যাত্রা। অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছি। গাড়ি লাফিয়ে উঠে খাদের একেবারে গা-ঘেঁষে থমকে দাঁড়িয়েছে।

মিস মহান্তি থামেন নি তখনও। চীৎকার করছেন, হেল্‌প্, হেল্‌প্!

ভদ্রমহিলা খ্রীষ্টান। চমৎকার ইংরেজী বলেন। বাংলাও। আমাদের সঙ্গে বাংলায়ই ওঁর কথাবার্তা হ'ত, এবং এমন কি মাদ্রাজী আন্দুকেও মাঝে মাঝে বাংলা শুনিয়ে চমকে দিতেন তিনি। কিন্তু এই বিপদের মুহূর্তে ইংরেজী ছাড়া কিছুই তিনি বললেন না।

অনেক কষ্টে তাঁকে ঠাণ্ডা করা গেল। 'যেন কিছুই হয় নি' ঠিক এমনি একটা ভাব দেখাল নকুল। বার দু'যেক চেষ্টায় হেলে-পড়া গাড়িটাকে আবার ছোটাল।

কিছুদূর ছুটতেই 'পীস-ক্যাম্প' পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়। দূর থেকে দেখলে মন্দির-টন্দির মনে হয়। কিন্তু সামনে থেকে অন্য চেহারা মনে হয়, পাহাড়-চূড়ার খানিকটা কাটা নিঃসঙ্গ এক অট্টালিকা সেখানে, স্তব্ধ, সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসীর মতো ধ্যানমগ্ন।

ঘুরতে ঘুরতে এগোই। পাহাড়টির চূড়া তাক করে উঠি ধীরে ধীরে। 'পীস-ক্যাম্প'-এ পৌঁছে দেখি, শূন্য। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও।

আন্দু বললে,—ব্যাড্ লাক্! কেউ নেই আজ।

গোপালবাবু বললেন,—তাতে কী। 'পীস-ক্যাম্প' তো আছে।

তা আছে। গোপালবাবুর কথায় সান্ত্বনা খুঁজি। ক্যাম্প-এর দিকে তাকাই বার বার। বাগিচা পেরিয়ে বারান্দায় উঠি।

সুন্দর বারান্দা। প্রশস্ত, ঝকঝকে তকতকে। ক্যাম্প-এর দেয়ালগুলোও সুদৃশ্য। বেশির ভাগই কাঁচ আর কাঠে গড়া। কাঁচের আড়াল থেকে 'পীস-ক্যাম্প'-এর হলটিকে দেখলাম। বেশ বড়-সড়; শ' দুই লোকের স্থান-সংকুলান হবার মতো।

আদ্দু বললে,—ঐ যে, দেখুন! হল-এর পাশে ছোট ছোট ঘর। থাকবার ব্যবস্থা।

বলতে কী ব্যবস্থাটা ঠিক বোঝা গেল না; বাকো আনারও বেশি আন্দাজ করে নিতে হল। বরং বোঝা গেল 'পীস-ক্যাম্প'-এর পরিবেশটিকে।—যেমন শান্ত তেমনি সমাহিত চারিদিক। কোলাহল বা উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই। আশেপাশের পর্বত-প্রহরীরা অতি সাবধানে শান্তিরক্ষা করছে যেন।

ভাবলাম, এই না হলে হয়? জায়গা উপযুক্ত না হলে ঠিক ঠিক কাজ হয় কখনও? শান্তি-শিবিরে কখনও শান্তি-মন্থন চলে?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে এগোই সেদিন। 'পীস-ক্যাম্প'কে ঘিরে-রাখা ফলবাগিচাটি প্রদক্ষিণ করি। কোথা থেকে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া দুরন্ত শিশুর মতো ছুটে আসে। আদরে-সোহাগে অস্থির করে তোলে আমাদের। ওদিকে বলাকারা ডানা ঝাপটায়। 'পীস-ক্যাম্প'-এর অ্যাস্‌বেসটস্‌-এর ছাদকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে উত্তরে অভিসার করে।

মিস মহান্তি তাড়া দেন,—নিন, চলুন এবার। কী আর দেখবেন?

আদ্দু বলে,—দেখবার অনেক কিছু আছে। সামনে, কয়েক মাইল মাত্র দূরেই আছে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড নাগা ক্যাম্প। যাবেন?

সবাই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম,—নিশ্চয়!

এর কারণও ছিল। 'পীস-ক্যাম্প'-এ 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড'দের কাউকেই দেখি নি। অথচ এসেছিলাম অনেক আশা নিয়ে।

এদিকে নকলো কিন্তু যেতে নারাজ। আদ্দু 'প্রোগ্রাম'-এর কথা খুলে বলতেই রীতিমত বিরক্ত সে। না, যাবে না। বেলা বারোটা নাগাদ কোহিমা-বাজারে কী নাকি জরুরী কাজ আছে।

ফেরবার পথে সবাই মিলে আবার অনুরোধ করলাম তাকে। কিন্তু সে নির্বিকার। অগত্যা আদ্দু ধমক দিল। আদেশের সুরে বলল, যাবে না?

নকলো এবারও জবাব দিল না কিছু। গাড়ির বেগটা হঠাৎ বাড়িয়ে দিল শুধু। দেখতে দেখতে ভীষণভাবে বাড়াল।

আমরা সবাই ভয়ে, আশঙ্কায় এতটুকু। নকলোকে বোঝাবার চেষ্টা করেও বার বার নিষ্ফল। যেন সে প্রতিজ্ঞা করেছে, যাবেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাবে। জোরে চালিয়ে আমাদের জব্দ করবার জন্যই যেন।

আমরা অবিশ্যি পুরোপুরি জব্দ। নকলোর ক্রোধ দেখে স্তম্ভিত একেবারে।

গাড়ি তো নয়, সিনেমার কোনো টয়-ট্রেণের মতো জীপ ছুটছিল তখন। দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে যেমন ছোটে।

গোপালবাবু শেষ চেষ্টা করলেন এবার। কৃত্রিম রাগ দেখালেন। পরিষ্কার হিন্দীতে প্রচণ্ড এক ধমক দিলেন আদ্দুকে,—এ কিন্তু ভারী অন্যায় তোমার। নকলোকে জোর করা ঠিক হয় নি।

এতেই কাজ হল নকলো অন্তত: খানিকটা যে শান্ত হয়েছে, তা বোঝা গেল গাড়ির চলন দেখে।

হ্যাঁ। আগের তুলনায় এখন অনেক আস্তে চালালে সে। প্রায় স্বাভাবিক গতিতে বলতে গেলে। এতে উৎসাহিত হলেন গোপালবাবু। আর এক দফা তালিম দিলেন—কিছু মনে করো না নকলো, আমাদেরই ত্রুটি। 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড'দের ক্যাম্পে যেতে হবে না ভাই। তুমি কোহিমাতেই ফিরে চলো।

এবার ফিরল সে। সামনেই বাঁকের মুখে চওড়া মতো একটা জায়গা বেছে নিয়ে খুব সাবধানে গাড়ি ঘোরাল।

আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল, যাক ; ফাঁড়া কেটেছে। নকলোর 'যুদ্ধং দেহি' ভাবটা আর নেই।

এদিকে কোহিমায় পৌঁছে নতুন বিপদ। নকলোর বদলে আদ্দু উগ্রমূর্তি। বললে,—জানেন ? এইজন্যে চাকরি এখনও পাকা হয় নি ওর। এই মেজাজের জন্যে।

নকলো পাশেই দাঁড়িয়ে ছি পথ, সম্মাহ্বাৎই কথার কথা। আসলে
না বুঝলেও কিছু একটা আঁচ বন্দল ওর। না হলে পরদিন
শাট্ আপ !

—কী ? কী বললে তুমি ?—আদ্দু কে স ওই খ্রীস্টান বৃদ্ধাটিকে
খন না।
সময় ডঃ আরাম বেরিয়ে এলেন। সমস্ত ব্যাপার ক্ষু
নিয়ে বললেন,—দোষ দু' তরফেরই। আমাদের আদ্দ কথা। সকাল
তেমনি। আমাদের দোষ, ওকে হঠাৎ করে অনুরোধ ল। ধি কত কী
দুপুরে কাজ আছে, আগেই ও আমাকে বলেছিল। আর কাউন্ট্
অতিরিক্ত রাগ। জেদের বশে জোরে গাড়ি চালানো। সে: হো
তাই না ? নকলো ! আদ্দু !

আশ্চর্য ! ডঃ আরামের মধ্যস্থতায় এক মুহূর্তে ব্যাপারটা মিটে এই
গেল। নকলো বা আদ্দুর কেউই কিছু আর উচ্চবাচা করল না।

লক্ষ্য করেছি, নকলো দারুণ শ্রদ্ধা করে ডঃ আরামকে। সেদিনই বিকেলের দিকে কোহিমা সায়ান্স কলেজে যাবার সময় নতুন করে তার পরিচয় পেলাম।

ঠিক কলেজ নয়, যাচ্ছিলাম অধ্যক্ষ মিঃ হোসেনের বাড়ি। কলেজের গায়েই থাকেন তিনি। আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন,—বিকেলে, চা-খাবার।

এগোচ্ছিলাম ; চারজন আমরা, আর ডঃ আরাম। এবারেও জীপ শহর পেরিয়ে ছুটছিল অতি সুন্দর এক পাহাড়ীয়া পথ ধরে।

ডঃ আরাম বলছিলেন,—নকলো, এত কাজের তুমি ! বিশ্বস্ত এত ! কিন্তু মাঝে মাঝে এমন রেগে যাও কেন ? রাগ কি ভালো ?

ভাবলাম,—সর্বনাশ ! বুঝি বা ভীমরুলের চাকে ঘা পড়ল ! এক্ষুণি ক্ষেপে উঠবে নকলো। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গাড়ি চালাবে।

নকলো এবারও জবাব দিল, উল্টো। নকলো গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিল শুধু। দেখতে দেখতে গ্রামের কাছে সরাসরি ক্ষমা চাইল,—

আমরা সবাই ভয়ে, অ

চেষ্টা করেও বার বার দি হতবাক আমি। দুর্ধর্ষ দুরন্ত নকলো যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাবে হতে পারে, এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর।

জন্যই যেন। বলাম, হয়তো বা ডঃ আরামের গুণেই এ সম্ভব।

আমরা ক ত এবং ভালবাসার গুণে।

একেবারে বে কি ভালবাসা সব পারে?—আকাশ-পাতাল ভাব

গ ন—দুরন্ত কি তারই ছোঁয়ায় বশে আসে? দুর্ধর্ষ মিত্র হয়?

ছু গা-সমস্যার সমাধানেও কি আমাদের দিক থেকে ভালবাসার অভাব আছে কোথাও? সহানুভূতির ঘাটতি আছে?

—হুজুর!—নকলোর ডাক শুনে চমক ভাঙে হঠাৎ। ফিরে তাকাই।

—হুজুর! দেখো উধার, কোহিমা।—আমাদের উদ্দেশ করে সে বলে।

দেখলাম যেন নতুন এক কোহিমাকে—

ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের গায়ে গায়ে শহর একটা নয়, গোটা দুই-তিন রাক্ষুসে ঢেউ যেন স্তব্ধ। দেশলাইয়ের খোলের মতো ঘরবাড়িগুলো তার গায়ে-মাথায় ছড়িয়ে। অনেকটা উপরে উঠে ছ, ঢেউকে জাহাজের মাস্তুল থেকে দেখছি যেন

কিন্তু কলেজ? কই, দেখছি না এখনও! কোহিমা ছাড়িয়ে মাইল চার-পাঁচ এলাম, এখনও হদিস পাচ্ছি না

ডঃ আরামকে একবার বললাম,—শহর থেকে এত দূরে কলেজ, অসুবিধে হয় না?

—হয়।—ডঃ আরাম বললেন,—কিন্তু এ নিয়ে কারও কোনো অভিযোগ নেই। সায়ান্স কলেজে পড়ার সুযোগ মিলছে, এতেই সব খুশিতে আটখানা।

—কিন্তু এই চড়াই পথ, স্বাস্থ্যেই কথার কথা। আসলে
যায় সব ?
বললাম ওর। না হলে পরদিন

—না না, সবাই হাঁটে না। ক... স ওই খ্রীস্টান বৃদ্ধাটিকে
ভাগ ওখানেই থাকে। ঐ যে, দেখুন না।

বলেই বেশ খানিকটা উঁচুতে ক্ষুদে ক্ষুদে ...

দেখালেন ডঃ আরাম। আমরা চড়াই বেয়ে আ... কথা। সকাল
ওপরে উঠলাম। ঘরবাড়িগুলো ক্রমেই স্পষ্ট হল। ...ধি কত কী
গোছের এক বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। কাউন্ট

ডঃ আরাম বললেন,—আসুন ; এই যে. সামনেই মিঃ হো...
কোয়ার্টার।

বলবার দরকার ছিল না। কোয়ার্টারটিকে দেখে অবধি ঠিক এই রকমই কিছু একটা ভাবছিলাম।

এদিকে গাড়ি থেকে নামতে-না-নামতেই দেখি, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক, সপরিবারে আমাদের দিকে এগোচ্ছেন।

আলাপ হল ভদ্রলোকটির সঙ্গে। ড. আরাম পরিচয় করিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, ইনিই সায়ান্স কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হোসেন। এঁর পাশে মিসেস হোসেন ও এঁদের দুই মেয়ে।

হোসেন-পরিবার আদরে-অভ্যর্থনায় অস্থির করে তুললেন। ড্রয়িং-রুমে বসিয়েই ধূমায়িত কফি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। মনে হল, আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল সব। এতক্ষণ ধরে শুধু প্রতীক্ষা চলছিল।

—এ বুঝি প্রতীক্ষারই জায়গা.—একবার ভাবি,—ঘন ঘন কে আসবে এখানে ? পাহাড়ের চূড়ায়, জনপদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই বাংলোতে ?

মিঃ হোসেনের সঙ্গে অনেক কথা হল সেদিন। নাগাভূমির শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য—অনেক বিষয়ে। শিক্ষা নিয়ে কথা উঠতেই মিঃ হোসেন বললেন,—পিছিয়ে আছি। দারুণ পিছিয়ে আছি

নকলো এবারও জবাব দি
বাড়িয়ে দিল শুধু। দেখতে ।! . কিন্তু কলেজ বড় জোর তিন

আমরা সবাই ভয়ে
পড়ানো হয় ?

চেষ্টা করেও বার ক
হয় !—একরাশ হতাশা উদ্‌গিরণ করে মিঃ
অনিচ্ছাসত্ত্বেও হ
।ছলেন,—তবে শুনছি, হবে।

জন্যই যেন। নিশ্চয়ই হবে ;—ডঃ আরাম জোর দিয়ে বলেছিলেন,
আম ।এগোলে শিল্পে-বাণিজ্যেও এ-দেশ এগোবে না।

একে নিয়ে কথা উঠল এবার। প্রসঙ্গ বদল হল।

মিঃ হোসেন বললেন,—জানেন, এই সেদিনও কি হাল ছিল এ-দেশের? ১৯৬৩ সালের ১লা ডিসেম্বর ভারতের ষোড়শ রাজ্য 'নাগাল্যাণ্ড' যখন জন্মগ্রহণ করল, তখন শিল্পের দিক থেকে এ ছিল ভারতের সবচেয়ে অনগ্রসর এলাকা।

শুধালাম,—এর কারণ? এজন্যে কি শুধু শিক্ষাই দায়ী?

মিঃ হোসেন জবাব দিলেন,—শিক্ষার দায়িত্ব নিশ্চয়ই কিছু আছে। তবে নাগাভূমির প্রতি দীর্ঘদিন ধরে যে নানা অবিচার হয়েছে, তা'ও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

ডঃ আরাম বললেন,—ঠিক। ঠিক কথা। ভারত স্বাধীন হবার অনেক আগে থেকেই এ-দেশ উপেক্ষিত। এমনকি স্বাধীনতার পরেও এর ওপর ঠিক নজর দেয়া হয় নি। ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় এ আসে নি।

শুধালাম,—তৃতীয় পরিকল্পনায় এসেছিল?

ডঃ আরাম সরাসরি জবাব দিলেন,—না। তৃতীয় পরিকল্পনায় 'মেজর ইণ্ডাস্ট্রি' বাবদ মোট তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল : কিন্তু নাগাল্যাণ্ড এক পয়সাও পেল না।

মিঃ হোসেন বললেন,—শুনছি, চতুর্থ পরিকল্পনায় পাবে। এ-রাজ্যের বড় ও মাঝারি শিল্পের খাতে সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

—তা হয়েছে।—ডঃ আরাম্‌হাৎই কথার কথা। আসলে নাগাল্যাণ্ড-এর সমস্যার দিকে এতদিনে ন্‌জর ওর। না হলে পরদিন এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে 'সুগার মিল', স ওই খ্রীস্টান বৃদ্ধাটিকে ইণ্ডাস্ট্রীজ ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশান সেণ্টার', ৫
ট্রেনিং-কাম-প্রোডাকশান সেণ্টার' এবং 'সেরিকালচা

মিঃ হোসেন বললেন,—শুনছি, আরও অনেক্‌কথা। সকাল হবে; অনেক ফার্ম, অনেক সেণ্টার। জানি না ঠিক অবধি কত কী

গোপালবাবু বললেন,—যা জানেন, তাই যথেষ্ট। ল একাউণ্ট্‌ কথা শুনলাম। মনে হচ্ছে, নাগাভূমির বিরাট বনজ সম্পা ·
না লাগালে পৃথিবীর লোক আমাদেরই বুনো বলবে। গীবনের

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলবে। আলবত বলবে —মিসেস হোর্স্‌ম আলোচনায় যোগ দিলেন এবার। টেবিলের ওপর একরাশ খাবার গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন,—আমাদের বলতে কিন্তু ভারতীয়দের।

সেদিন আরও খানিকক্ষণ গল্প হল মিঃ হোসেনের বাড়িতে। কিন্তু কলেজ-দেখা আর হল না। কিসের যেন ছুটি; কলেজ বন্ধ। আর তাছাড়া সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে আধার-সমুদ্রের মধ্যে ডুবু-ডুবু দ্বীপ হয়ে উঠেছে পাহাড়ের চূড়াগুলো।

বিদায় দেবার সময় মিঃ হোসেন বললেন,—নাগাল্যাণ্ডকে ভালোবেসে ফেলেছি। এমনকি নিজের দেশ আসামের চেয়েও

শুধালাম,—কেন?

মিঃ হোসেন সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন,—ঠিক জানি না. হয়তো বা সকলের চেয়ে পিছিয়ে আছে বলেই।

—সত্যি! পিছিয়ে ওরা। বড় পিছিয়ে।—ফেরবার পথে আপন মনেই গুন্‌গুন্‌ করেন গোপালবাবু। কবিগুরুর 'গীতাঞ্জলি' থেকে আবৃত্তি করেন:—

নকলো এবারও জবাব ।! তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
বাড়িয়ে দিল শুধু। দেখা সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

আমরা সবাই ভ পড়থেকে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় আটটা।
চেষ্টা করেও বা হয় ও গম্ভীর। হয়তো বা রুষ্টও একটু।
অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছিলে?—আদ্দুকে চুপি চুপি শুধালাম,—মিস মহান্তির
জন্যই যে নিশ্চ

এগোলে!—বলেই আদ্দু মিস মহান্তির হুবহু অনুকরণ করল,
নিয়ে কথা তিয়াত্তর হল আমার। কিন্তু ফিট্ তো আছি।
মঃ হোসেন পারসেন্ট ফিট্। অথচ আমাকে বাদ দিয়েই কিনা
দেশের? ১৯ করছে ওরা! দিব্যি ঘুরছে! কী অন্যায়! ছি ছি!—
'নাগাল্যাণ্ড' স্থায়!

ভার বললাম,—তা বটে! অন্যায়টা গুরুতর বটে! কিন্তু ভদ্র-
মহিলাকে নিয়ে যে মুশকিল হল! সব জায়গাতেই সঙ্গী হতে চান!

আদ্দু বললে,—চাইবেনই। নিজেকে এখনও কিশোরী
ভাবেন যে!

বললাম,—আশ্চর্য!

আদ্দু জবাব দিলে,—তা বলতে পারেন।...গত একমাস ধরে
এই আশ্চর্যকে দেখছি। আবদারের ঠ্যালায় অস্থির হয়ে উঠেছি
একেবারে।

শুধালাম,—মিস মহান্তির আপনজন কেউ নেই?

আদ্দু বললে,—না, নেই। ওঁর আপন যখন যেখানে, তখন
সেখানে। আগে কোন্ এক মিশনারী স্কুলে নাকি পড়াতেন।
নিজেও মিশনারী, খাঁটি খ্রীস্টান।

বললাম,—খ্রীস্টান যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ
এই নাগাভূমিতে কেন?

আদ্দু বললে,—কেন আবার! দেখতে। আর আমাদের
হাড় জ্বালাতে।

আব্দুর এই শেষের উক্তিটি নেহাৎই কথার কথা। আসলে মিস মহাস্তির প্রতি প্রচ্ছন্ন এক মমতাও ছিল ওর। না হলে পরদিন গীর্জায় যাবার সময় নিজে উদ্যোগী হয়ে সে ওই খ্রীস্টান বৃদ্ধাটিকে সঙ্গে নিত না।

ঘটনাটা খুলেই বলি।—

পরদিন। রোববার। এক গীর্জায় যাবার কথা। সকাল আটটা নাগাদ। খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছে। উঠে অবধি কত কী ভাবছি। পড়ছিও। বিশেষ করে 'এ ব্রীফ হিস্টোরিক্যাল একাউন্ট্ অব্ নাগাল্যাণ্ড' বইটির 'ক্রীশ্চানিটি' অংশগুলো বেছে বেছে।…

আশ্চর্য! খ্রীস্টানরা অসাধ্য-সাধন করেছেন। কতবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কত অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের বিনিময়ে নাগাভূমিতে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করেছেন ওঁরা।

প্রচারের উদ্যোগ-আয়োজন আগে থেকেই চলছিল। তবে আসল কাজ শুরু ১৮৫১ সালে। রেভারেণ্ড হোয়াইটিং সে-বছর লোঙ্জাম্ ও মেরাংকং গ্রামের কয়েকজন নাগাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তখনও গীর্জা গড়ে ওঠেনি নাগাভূমিতে; আসামের শিবসাগর শহরের গীর্জায় ধর্মান্তরিত নাগাদের প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল।

নাগাভূমিতে গীর্জা গড়ে উঠল এ-ঘটনার প্রায় একুশ বছর পরে, রেভারেণ্ড ডঃ ক্লার্ক-এর চেষ্টায়।

মিশনারী ডঃ ক্লার্ক ১৮৬৯ সালে আসামে আসেন। শিবসাগর ছিল তাঁর হেড্-কোয়ার্টার। ডঃ ক্লার্ক দেখলেন, পাশেই নাগা-পাহাড়; বিচিত্র কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নাগাদের বাসভূমি। খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হলে ওদের কল্যাণ হবে।

কিন্তু কী করে বশে আনা যায় দুর্ধর্ষ নাগাদের?—তিনি আকাশ-পাতাল ভাবেন। ১৮৭১ সালে গোধুলা নামে এক সহকারীকে পাঠান নাগা-পাহাড়ের ডেকাহেইমং গ্রামে।

রেভারেণ্ড গোধুলা দুঃসাহসী; চরম বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে নাগা-পাহাড় ঘুরে এলেন; কিন্তু ধর্মপ্রচারে সফল হলেন না ঠিক।

ডঃ ক্লার্ক ভাবলেন, নাগাদের সঙ্গে না মিশলে সফল ওঁরা কোনোদিনই হবেন না। মিশতে হবে, ওদের মধ্যে গিয়ে জয় করতে হবে ওদের।

১৮৭২ সালে রেভারেণ্ড গোধুলাকে আবার তিনি নাগা-পাহাড়ে পাঠালেন। বলে দিলেন, কিছুদিন অন্ততঃ থাকতে হবে ওখানে।

গোধুলা থাকলেন। সঙ্গে স্ত্রী লসী। নাগাদের সঙ্গে মিশলেন ওঁরা। বাইরের লোক সম্পর্কে ওদের অবিশ্বাস খানিকটা দূর করলেন।

কয়েকজন নাগা গোধুলার কাছ থেকে ধর্মকথা শুনে মুগ্ধ। শিবসাগরের পথে মিশনারীটির সঙ্গী হল ওরা। দিখু নদী পেরিয়ে ডঃ ক্লার্ক-এর কাছে গেল।

ক্লার্ক ওদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দিলেন। নতুন আরও ন'জন খ্রীস্টানকে আনলেন শিবসাগর গীর্জার আওতায়। কিন্তু তবু তেই যেন মন ভরল না তাঁর। তিনি চাইলেন নিজে নাগা পাহাড়ে গিয়ে কাজ করতে।

বন্ধুরা বারণ করল,—কাজ নেই গিয়ে। জায়গাটা ভয়ঙ্কর

ডঃ ক্লার্ক বললেন,—জানি।

বলেই দুর্গম বন-পাহাড় ধরে এগোলেন। সে-যুগে গলাকাটা বিদ্যেয় নাগাদের জুড়ি ছিল না। 'হেড-হাণ্টার' বলা হ'ত ওদের। বাহবা পাবার জন্যে কাটা মুণ্ডুগুলোকে ওরা জনসমক্ষে প্রদর্শন করত। যে যত মুণ্ডু কেটেছে, নাগা-সমাজে সে তত বড় বীর বলে গণ্য হ'ত।

নাগা গ্রামগুলো গড়ে উঠত পাহাড়ের চূড়ায়। দুর্গম, জঙ্গলাকীর্ণ সব পাহাড়। ওদের চূড়ায় গ্রাম গড়লে প্রতিরক্ষার সুবিধে, সহজে কেউ গ্রাম আক্রমণ করতে পারবে না, এই ছিল নাগাদের বিশ্বাস। আর তা ভিন্ন গ্রামগুলোও ছিল ছাড়া ছাড়া,

পৰধি মিস মহান্তি অস্থির। যেমন,
একটি আরেকটি থেকে অনেক দূরে।
লড়াই লেগেই থাকত। তুচ্ছ কারণে চ...ন,—শরীর ভালো নেই
সন্দেহ করছে, গলা কাটবে বলে শাসাচ্ছে..
বিদেশীদের পক্ষে নাগা-পাহাড়ে যাওয়া. মানে...নাক জবাব,—শরীর
পাঞ্জা লড়া, সন্দেহ নেই।

বিদেশী মিশনারীরা পাঞ্জাই লড়তেন। শ্বাপদ· বলছিলেন.
অরণ্য ধরে এগোতেন প্রাণ হাতে নিয়ে। পথ নেই, ...য়ছিলেন.
হঠাৎ-আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় নেই, শুধুমাত্র সা.
মূলধন করে এগোতেন ওঁরা।

ডঃ ক্লার্ক-এরও মূলধন সাহস আর সুবুদ্ধি। অপরিসীম দুঃখকষ্ট ভোগ করে নাগা-পাহাড়ে গেলেন তিনি। মোলুঙয়িমছেন গ্রামে পৌঁছুলেন এই গ্রামটিতে তাঁর সহকর্মী গোধুলা আগে এসেছেন; কাজও করেছেন কিছু কিছু। তাই গ্রামে পৌঁছে ডঃ ক্লার্ক-এর অসুবিধে বিশেষ হল না। বরং নাগাদের অনেকেরই সহযোগিতা তিনি পেলেন। অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর কাছে এলো।

১৮৭২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর পনের জন নাগাকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন তিনি। নাগা-পাহাড়ের প্রথম গীর্জারও ভিত্তি স্থাপন করেন। তবে শুধমাত্র ধর্মপ্রচারই মিশনারীদের উদ্দেশ্য ছিল না। ওঁরা চেয়েছিলেন, নাগারা লেখাপড়া শিখুক, জ্ঞানের আলোকে নিজেদের প্রবুদ্ধ করুক।

ডঃ ক্লার্ক-এর কথা ধরা যাক। নাগা ছেলেমেয়েদের অনেককেই লেখাপড়া শেখালেন। তারপর শিক্ষিতদের পাঠালেন গ্রামে-গ্রামান্তরে; অন্যদের সাহায্য করবে—আশায়।

সে-যুগে নাগাদের মধ্যে কোনো লিখিত সাহিত্য ছিল না। জীব-জন্তুর চামড়ায় এককালে ওরা লিখত বটে, কিন্তু সে-লেখা ঠিক সাহিত্য হয়ে ওঠে নি; ডঃ ক্লার্ক-এর আমল অবাধ তা টিকেও থাকে নি।

ক্লার্ক নাগা-অক্ষরের সন্ধান করতে গিয়ে জনশ্রুতির ওপর

। কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহও করলেন।
বর্ণমালার অনুকরণে সাজান হল ওদের।
।ক্ষর গড়া হল।
।র কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সে অক্ষর গড়া
।াদের এক উপভাষা আও-নাগায় লেখাপড়াও।
।শক্ষয়িত্রীর কাজ পেল। নাগা-উপজাতি 'আও'দের
শেখানোর কাজ। আও-নাগারা তাঁর কাছে অনেক
।শখেছিল, গ্রামে গিয়ে শিক্ষা-বিস্তারও করেছিল কেউ কেউ।

ডঃ ক্লার্ক নিজে ওদের কাজকর্ম তদারক করলেন। আও-নাগা ভাষায় বইও লিখলেন। শিবসাগর থেকে ছোট একটি মুদ্রণযন্ত্র এনে বই ছাপা হল।

ডঃ ক্লার্ক সত্যিকারের এক কর্মী-পুরুষ। একটানা ছত্রিশ বছর নাগা-পাহাড়ে মিশনারীর কাজ করেন তিনি। নাগা-ইংরেজী অভিধান পর্যন্ত রচনা করেন। তাঁর আমলে কোনো কোনো নাগা-গ্রামে প্রাথমিক স্কুল গড়ে ওঠে। আও-নাগা ভাষায় স্কুলপাঠ্য বই লেখেন মিসেস ক্লার্ক।

এইভাবে মোককচুং অঞ্চলের আও-নাগা মহল্লায় যখন শিক্ষা-বিস্তার চলছিল, তখন নাগা-পাহাড়ের দক্ষিণ অঞ্চলে কাজ করছিলেন ডঃ রিভেনবুর্গ। ইনিও একজন মিশনারী। ১৮৮৫ সালে কোহিমায় আসেন। সে-অঞ্চলের আঙ্গামী-নাগাদের মধ্যে কাজ করেন দীর্ঘ তিরিশ বছর।

পূর্বসূরী ডঃ ক্লার্ক-এর অনুকরণে নাগা-উপভাষা আঙ্গামীতে বর্ণমালা গড়েন তিনি। কোহিমা এবং তার প্রতিবেশী এলাকায় শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করেন।

সেই প্রতিবেশীদেরই একটিতে যাবার কথা আজ; শহর-কোহিমার ঠিক পাশেই কোহিমা-গ্রামে। সকাল আটটা নাগাদ সে-গ্রামের আঙ্গামী-নাগাদের গীর্জায় পৌঁছুবার কথা।

এদিকে গীর্জার নাম শুনে অবধি মিস মহান্তি অস্থির। যেমন হোক করে যাবেনই নাকি।

ডঃ আরাম বোঝাবার চেষ্টা করলেন,—শরীর ভালো নেই আপনার। আজ থাক। আর একদিন বরং...

কিন্তু কে কা'র কথা শোনে! মিস মহান্তির সাফ জবাব,—শরীর ভালো নেই? কে বলল?

ডঃ আরাম আমতা আমতা করে বললেন,—মিসেস! বলছিলেন, মাথাব্যথায় কাল সারারাত নাকি ঘুমোন নি। ওষুধ খেয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওষুধ খেয়েছি, ঠিক কথা,—বললেন মিস মহান্তি,—কিন্তু 'ঘুমোই নি' কথাটা বাজে

আদ্দু বললে,—ঘুমিয়েছেন উনি। দিব্যি। এই তো, একটু আগে ডেকে তুললাম আর ওষুধ?···হাট রীতিমত স্ট্রং না হলে এই বয়সে কেউ সারিদিন গেলে না।

বাস! এতেই কাজ হল। মিস মহান্তি কিশোরী হয়ে উঠলেন আবার আমাদের সঙ্গী হলেন।

বেরোতে বেরোতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। চারিদিক ঝাপসা আজ। ভোর থেকে জোর কুয়াশা। খাদ, পথ, পাহাড়, বাড়িঘর—সব একাকার। দু'হাত দূরের জিনিসও ঠিক চোখে পড়ছে না।

নকলো খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে। হর্ণ দিচ্ছে ঘন ঘন। এরই মধ্যে 'হেড্-লাইট'ও জ্বালিয়েছে। দারুণ ঠাণ্ডা। বর্শার ফলার মতো শীত: জামা-কাপড় ভেদ করে গায়ে বিঁধছে।

মিস মহান্তির গায়ে ধুতির ওপর সামান্য একফালি চাদর। ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন।

আদ্দু বললে,—কষ্ট হচ্ছে খুব?

মিস মহান্তি আকাশ থেকে পড়লেন যেন,—কই! না তো!

—না বললে কী হবে !—আন্দুর প্রতিবাদ,—কষ্ট হবে, এ তো জানা কথা। কিন্তু বোঝাব কা'কে ? কেউ তো কথা শুনতে রাজী নন !

মিস মহান্তি বললেন,—কথাটা আমাকে তাক করেই বলা। কেমন ? তাই না ?

—না না, তা কেন ?—ডঃ আরাম-এর অনুপস্থিতিতে গোপালবাবু মধ্যস্থ এবার,—বরং আন্দুই তো আপনার হয়ে 'প্লীড্' করল।

—তার কোনো দরকার ছিল না।—কাঁপতে কাঁপতে বললেন মিস মহান্তি,—নিজের কেস নিজেই আমি 'প্লীড্' করতে জানি।

বুঝলাম, ব্যাপার ঘোরাল। মিস মহান্তি ভেতরে ভেতরে দুর্বল হচ্ছেন যত, পারিপার্শ্বিকের ওপর চটে গিয়ে ততই রুক্ষ হচ্ছেন। অতএব, বেশি কিছু না-বলাই ভাল।

বললামও না। গোপালবাবু এবং আন্দুও চুপ করে গেলেন। নকলো খুব সাবধানে গাড়ি চালাল গাঢ় ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে এগোল ধীরে ধীরে।

খানিকদূর এগোতেই চড়াই পথ ; ঠিক দেখা না গেলেও গাড়ির গোঙানিতে মালুম হল।

আন্দুকে শুধালাম,—গীর্জা কতদূরে আর ?

—সামনেই, ও বলল,—'কোহিমা ভিলেজ'-এর গা-ঘেঁষে।

কিন্তু কোথায় 'ভিলেজ' ? চারিদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কিছুই ঠিক ঠাওর হচ্ছে না।

—এ-ভিলেজ বহুকালের পুরনো।—এরই মধ্যে আন্দু শুরু করে একবার,—এমনকি উনিশ শতকেও বিদেশীদের কেউ কোহিমা এলে এখানে আসতেন। এ হল নাগা-পাহাড়ের সব চেয়ে বড় 'ভিলেজ'। আজ থেকে এক শো বছর আগেও এখানে প্রায় একহাজার বাড়ি ছিল।

বাড়ি ? কই, একটাও তো চোখে পড়ছে না এখন ! বার বার

মনে হচ্ছে, কুয়াশার সমুদ্রে তলিয়ে গেছি। ডুব-সাঁতার কাটছি সমুদ্রের তলাকার পাহাড়-পর্বতকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

—সাহাব!—আরও খানিকদূর গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল নকলো। বলল,—সাহাব! উতারিয়ে আভি।

আদ্দুও তাড়া দিল,—'হারী আপ'।

দ্বিরুক্তি না করে এগোলাম। আদ্দু পথ দেখাল।—

চৌকোমতো পাথর-বিছানো পথ দারুণ পিছল। জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা জমে আছে। কোথাও বা কাদা, আলগা পাথরগুলোর ঠিক তলাতেই।

সাবধানে পা ফেলছি, রেহাই নেই তবু। প্যাচ্-প্যাচ্ শব্দ উঠছে। পাথরের তলা থেকে কাদা আর নোংরা জল ছড়াচ্ছে আশেপাশে। যেন পিচকারির হাতে কেউ, আমাদের পিছু নিয়েছে, জামা-কাপড়ের বারোটা না বাজিয়ে ছাড়বে না।

বাজালও। বারোটা না হোক, কাছাকাছি। কয়েক পা এগোতেই দেখি, জামা কাপড়ের দফা রফা। এদিকে পথের দু'ধারে গণ্ডা-কয়েক কুকুর। আশে-পাশের বাড়িগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমাদের সাড়া পেয়ে চীৎকার করছে তারস্বরে।

কুকুরদের কোনো কোনোটি আবার অতি-উৎসাহী। কুয়াশার আড়ালেও স্পষ্ট মনে হল, পিছু নিচ্ছে আমাদের।

নেবেই, একবার ভাবলাম,—হালচাল দেখে তো মনে হচ্ছে, এদিককার প্রতি বাড়িতেই কুকুর 'ফার্স্ট লাইন অব ডিফেন্স্' বলতে এরাই।

এই 'ডিফেন্স্'কে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে আর পাথর-বিছানো পথে কাদা ছড়াতে ছড়াতে অনেক কষ্টে তো এগোলাম। গীর্জায় পৌঁছে দেখি, 'লেইট্', প্রার্থনা শুরু হয়ে গেছে। একজন নাগা-ধর্মযাজক বাইবেল থেকে কী যেন পড়লেন একটু: পর-মুহূর্তেই ব্যাখ্যা শুরু করলেন।

গীর্জা লোকে-লোকারণ্য। কিন্তু শব্দ নেই কোথাও, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম। ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী নির্বিশেষে নাগাদের সকলেই তন্ময় হয়ে ধর্মযাজকের ব্যাখ্যা শুনছে।

শুনছিলাম সেদিন আমরাও। দরজায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ। এমন সময় মুরুব্বি-গোছের কে যেন এগিয়ে এলেন। পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করে প্রার্থনা-কক্ষের একেবারে প্রথম সারির আসনে বসিয়ে দিলেন।

ধর্মযাজক তখন বাইবেল-পাঠে নিমগ্ন। উদাত্ত-কণ্ঠে যীশুর বাণী উদ্ধৃত করছেন,—"Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God."

বাণী-উদ্ধারের পরই ব্যাখ্যা। আঙ্গামী-নাগা ভাষায় প্রাণঢালা বিশ্লেষণ। যদিও বুঝছিলাম না সে ভাষার কিছুই, তবু কেন জানি না, মনে হল, অতি সুন্দর ও অপরূপ কিছু, আমার ঠিক সামনে দিয়েই মধুছন্দা ঝরনার মতো চলেছে। দেখতে দেখতে ঝরনা সহস্রমুখী হল যেন। অমৃতবাণী-সিঞ্চনে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিল। এক সৌরভ, একই সুরধ্বনি সর্বত্র—'শান্তিপ্রিয়রা ভাগ্যবান। কারণ, ওঁরা ভগবানের সন্তান বলে গণ্য হবেন'।

ব্যাখ্যা শেষ হতেই ধর্মযাজক এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। আন্দুর সাহায্য নিয়ে উপস্থিত ভক্তদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করলাম। তারপর ধর্মযাজকদের তরফ থেকে অনুরোধ এলো, নতুন বন্ধুরা এসেছেন, কিছু শুনতে চাই।

শেষ অবধি শোনান হল। আমাদের হয়ে গোপালবাবু বললেন। তাঁর ইংরেজী বক্তৃতা আঙ্গামী-নাগায় অনুবাদ করে চললেন যাজকদের একজন।

সেদিন বড় ভাল বলেছিলেন গোপালবাবু। শান্তি নিয়েই বড় সুন্দর কিছু। গৌরচন্দ্রিকায় নাগাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, —আমরা ভালোবাসি আপনাদের, শ্রদ্ধা করি। আপনাদের বন্ধুত্বের

তুলনা নেই, আন্তরিকতার অবধি নেই। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধে পেলে সমগ্র ভারতকে আপনারা নেতৃত্ব দিতে পারেন।

সেদিন গোপালবাবুর বক্তৃতা শুনে নাগারা খুব খুশি। গীর্জায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বক্তৃতা শেষ হতেই অনেকে এসে করমর্দন করল তাঁর সঙ্গে। এবং এমনকি আমাদের দিকেও এগিয়ে এলো কেউ কেউ। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাল।

আমরা ব্যাপার দেখে শ সংবর্ধনার ঘটায় অভিভূত একেবারে। –

ওদিকে গীর্জার প্ল্যাটফর্মের সামনে ভিড়। গোপালবাবুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বহু লোক। হঠাৎ এক বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন। গোপালবাবুর মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন বার বার।

আদ্দ্ স্মল—দেখুন ওঁকে। কোহিমা ভিলেজ-এর সবচেয়ে প্রবীণা। এখনও গীর্জায় আসেন নিয়মিত

অবাক হলাম। বৃদ্ধাটিকে দেখেই শুধু নয়, ধর্মপ্রাণ নাগাদের দেখেও মনে হল, খ্রীস্টানধর্ম অসাধ্য-সাধন করেছে, গত প্রায় এক শো বছরের মধ্যে বুঝি-বা হৃদয়-জয় করেছে নাগাদের।

ওই যে বৃদ্ধাটি এগিয়ে এলেন, ও কি শুধু ধর্মের অনুপ্রেরণায়? হতে পারে। তবে সে-ধর্ম আচার-সাপেক্ষ, অনুষ্ঠান-নির্ভর, দেশ কাল-গণ্ডীবদ্ধ কিছু নয়, বৃহত্তর মানবধর্ম নিশ্চয়।

যুগে যুগে এই মানবধর্মই জয়ী শেষ অবধি। পরকে আপন আর দূরকে নিকট করে সে মনুষ্যত্বের পীড়ন দেখলে তার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মানুষকে সে সত্যের পথ-নির্দেশ করে

তবে কি গোপালবাবুর মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন দেখলেন বৃদ্ধাটি? নিজের কিছু কথার অনুরণন শুনলেন?—

আকাশ-পাতাল কত কী ভাবি সেদিন। ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে-যাওয়া বাহটির দিকে তাকাই।…হ্যা, প্রার্থনা শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। অনেকেই এতক্ষণে চলে গেছে। ফাঁকা গীর্জা খাঁ-খাঁ করছে এইবার।

জরাজীর্ণ অর্গ্যানটা চোখে পড়ছে। প্ল্যাটফর্মের ঠিক পেছনেই ক্রুশচিহ্ন। ভীড় আলগা হতে চোখে পড়ছে তা'ও।

কিন্তু ক্রুশ কি ওখানে একটা? চারিদিকে অ্যাসবেসটাস্-এর সাদা দেওয়াল জায়গায় জায়গায় ফেটে চৌচির। আপনা থেকেই অনেক ক্রুশ গড়ে উঠেছে যেন। কাঠের কড়ি-বরগাগুলোকেও যেন ক্রুশ মনে হচ্ছে।

গীর্জাটি পুরনো। তার আকারে-প্রকারে বিরাটত্বের ছাপ। হাজার দুই লোকের স্থান-সংকুলানের ব্যবস্থা তা'তে আছে। লম্বা লম্বা কাঠের চেয়ারে আছে বসবার ব্যবস্থা।

—সাহাব।—নকলোর তাড়ায় চমক ভাঙে হঠাৎ। ফিরে তাকাই।

—সাহাব।—অভি ওয়াপস যানা।—সে বলে। আর ওদিকে অনুরাগী-পরিবৃত গোপালবাবুও এগিয়ে আসেন।

ফিরে চলি এবার। ধীর-মন্থর পদক্ষেপে এগোই। অনুরাগীদের কেউ কেউ জীপ অবধি পৌঁছে দেন আমাদের।

আশ্চর্য। কুয়াশা কেটে গেছে এরই মধ্যে। রোদ উঠেছে। আলো-ঝলমল 'কোহিমা ভিলেজ' বিনম্র প্রসন্নতায় যেন বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

ভাবলাম, খানিক আগেকার কুয়াশা তবে কি কোনো কিছুর প্রতীক? নাগা গ্রাম ও গীর্জা সম্বন্ধে আমাদের সংশয়-সন্দেহের প্রতিচ্ছবি?

ঠিক জানি না। তবে সেদিনই বিকেলে সন্দেহের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হই আবার। 'পীস-সেণ্টার'-এর ড্রইংরুমে অদ্ভুত-দর্শন এক নাগাকে দেখে চমকে উঠি।

সেমা-নাগা সে। প্রায়-বৃদ্ধ। দূরের এক গ্রাম থেকে এসেছে। নাম আগ্হোকি।

ডঃ আরাম 'পীস-সেণ্টার'-এর কাজে আগ্হোকির গ্রামে যাবেন। তাই দু'জনের মধ্যে শলা-পরামর্শ চলছে।

নকলোর মধ্যস্থতায় দিব্যি চলছিল পরামর্শ। হঠাৎ মুহূর্তের অসতর্কতা ; আগন্তুকের গা থেকে নাগা-চাদরটি খসে পড়ল। আর আমি স্পষ্ট দেখলাম, বিচিত্র উল্‌কিতে ওর সারা দেহ ভর্তি।

আগ্‌হোকি চকিতে সামলে নিল নিজেকে। ত্রস্তভাবে চাদর মুড়ি দিল। কিন্তু ওতেই আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল যেন।

ওদিকে আগ্‌হোকি চলে যেতেই ডঃ আরাম বললেন,—কী ? বুঝলেন কিছু ?

বললাম,—কিছুটা।

—যেমন—

—লোকটি 'হেড্‌-হাণ্টার' তাই না ?

—বোধ হয় তাই। তবে এখন আর 'হেড্‌-হণ্ট' করে না অনেকদিন ও কাজ বন্ধ।

বললাম,—তা হতে পারে। কিন্তু ওর মুখে উল্‌কি দেখে গোড়া থেকেই সন্দেহ হয় আমার। চাদর সরে যেতে সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়।

ডঃ আরাম সমর্থন করলেন,—সন্দেহটা অন্যায় কিছু নয়। 'হেড্‌-হাণ্টার'দের ওরকম থাকত। উল্‌কির পরিমাণ দেখেই বীরত্বের পরিমাপ হ'ত ওদের।

বাস। সেদিন 'হেড্‌-হাণ্টার'দের গল্প উঠল। অদ্ভুত আশ্চর্য সব গল্প। তাদের মূল কথাগুলো জুড়লে অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়—

কিছুকাল আগেও নাগারা সবাই ছিল 'হেড্‌-হাণ্টার'। ছল, বল এবং কৌশলের দিক দিয়ে সকলেরই কায়দাকানুন প্রায় একরকমের ছিল। ছিন্ন মুণ্ড বয়ে-আনা (তা সে যা'রই হোক—নারী পুরুষ শিশু বা বুড়োর) ছিল বীরত্বের পরিচায়ক। বীরদের দেহে উল্‌কি থাকত ; অলঙ্কারও কখনও কখনও। তবে মুণ্ড-শিকারের ব্যাপারটা কোনোদিন ন্যায়যুদ্ধের ধার ধারে নি। বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল তার অন্য নাম।

সাধারণতঃ শত্রুপক্ষের কোনো জলাশয় না নদীর ঘাটকে শিকার-ক্ষেত্র হিসেবে বাছা হ'ত। শিকারীরা ওৎ পেতে বসত ঝোপঝাড় বা পাহাড়ের আড়ালে। সুযোগ খুঁজত কে কখন জল নিতে আসবে। সাদা। সুযোগ একবার পেলেই হল, মুহূর্তে শিকারের ওপর ঝাপি.য় অনেকড়ত আ.ততায়ী, হতভাগোর মুণ্ডচ্ছেদ করত সম্পূর্ণ অতর্কিতে। যেন তারপর সেই ছিন্নমুণ্ডকে নিযে বিজযীর মতো ঘরে ফিরত।

কিন্তু এ তো গেল খুচরো সওদা। বড সওদায আয়োজন বড হাজারকম। কযেকটি গ্রাম মিলে শত্রুপক্ষের কোনো বিশেষ গ্রামকে লক্ষ আক্রমণের ব্যবস্থা

না, ঢাক-ঢোল পিটিযে বা জানাজানি করে নয, সুযোগ বুঝে সম্পূর্ণ অতর্কিতে আক্রমণ হানা হ'ত। গ্রামের বয়স্করা যখন চাষবাসে ব্যস্ত, তখন। আবার যখন দেখা যেত বযস্করা প্রস্তুত, লড়াই করবে বসে দাউ আর বর্শা হাতে দাঁড়িযে, তখন হানাদাররা এগোত না এক পা-ও সুড-সুড করে পিছু হটত

অপ্রস্তুত ও অসহায গ্রামবাসীদের ওপর আক্রমণই ছিল সবচেযে নির্মম হানাদাররা বিদ্যুৎবেগে কাজ হাসিল করত। ছেলে-বুড়ে নির্বিশেষে সবাইকে খুন করত অতি নিষ্ঠুরভাবে আর বযস্করা ক জ সেরে ফিরত যখন, গ্রামের পথে-প্রান্তরে তখন অসংখ্য মুণ্ডহীন দেহ।

মুণ্ডগুলো ?—ন, একটাও পড়ে নেই বড মূল্যবান ওরা। হানাদাররা ওদের নিয়ে গেছে ফিরে গিযে পাড়া-পড়শীদের দেখাবে।

পড়শী মেয়েরাই ছিল যত নষ্টের গোড়া। যে ছোড়া দু-চারটে মুণ্ড কাটে নি, মেয়েরা তাকে পাত্তাই দিত না। গ্রামের নাচ-গানের আসরে তাকে ঘিরে ঠাট্টা-তামাসা করত।

হ্যা, কে ক'টা মুণ্ড কেটেছে, সাজগোজ দেখেই তা মালুম হ'ত সকলের। উল্কি দেখেও।

কিন্তু তবু দেহ তো আর চিরস্থাযী নয়, শতমুণ্ড-বিজয়ী

মহাবীরেরও মৃত্যু হ'ত একদিন। শিকার-করা মুণ্ডুগুলো তার দেহের সঙ্গেই তখন সৎকার করা হ'ত।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল নাগাদের যুদ্ধ। প্রতিবেশী কোনো গ্রাম বা অঞ্চলকে শায়েস্তা করা দরকার মনে হলেই সভা ডাকা হ'ত গ্রামে। বিশেষ করে বয়স্ক মোড়লদের পরামর্শ চাওয়া হ'ত।

মোড়লরা সব উপযুক্ত। মুণ্ডু-শিকারের আঁচ পেলে তরুণদের বড় একটা নিরুৎসাহ করতেন না। বরং বলতেন,—যাও, ঝাঁপিয়ে পড় গিয়ে। গোটাকতক মুণ্ডু এনে গ্রামের ইজ্জৎ রক্ষে করো।

—ইজ্জৎ!—সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাজে পা-পড়া সাপের মতো ফুঁসিয়ে উঠত তরুণরা। বলত,—হ্যাঁ হ্যাঁ, করব বৈকি!

ব্যস। নাচ শুরু হ'ত তারপর, আদিম উদ্দাম। রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠত নাগারা। প্রতিটি যোদ্ধা হাতে নিত দাউ আর বর্শা। এছাড়া, বাঁশের চোঙা-ভর্তি জল নিত সবাই. ছোট্ট এক একটা ঝুড়িতে ভাত নিত। মোড়লরা একেবারে শেষ মুহূর্তেও পরামর্শ দিতেন,—এইভাবে এগোও। ঐভাবে শত্রুর মোকাবিলা করো।

যোদ্ধারা খুব সতর্ক। চিতা-বাঘের মতো পা টিপে-টিপে এগোত। দিনমানেই শত্রু-মহল্লার কাছাকাছি কোনো জায়গায় আস্তানা গাড়ত।

মহল্লাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলত ওরা; অথচ থাকত এমনভাবে যেন কাকপক্ষীতেও না টের পায়

টের কেউ বড় একটা পেত না। অতি-সাবধানী হতে গিয়ে ওরা বরং নিজের লোকদেরই খুন করত শত্রুপক্ষের লোক ভেবে সহযোদ্ধার মুণ্ডচ্ছেদ করত এক এক সময়।

দোষ নেই ওদের। নির্জন পাহাড়। নিঃস্তব্ধ বনস্থলী। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার; এমন পরিবেশে মিত্রকে ভুল করে শত্রু ভাবা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অস্বাভাবিক বরং ওদের যুদ্ধ-কৌশল। ভোর হতে-না-হতেই

আক্রমণ শুরু করত ওরা। প্রচণ্ড সোরগোল তুলে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।

না, কেউ রেহাই পেত না তখন, ছেলে বুড়ো যুবক যুবতী—কেউ না। এমন কি পশুদেরও হত্যা করা হ'ত—গরু ভেড়া শূকর মুরগী কুকুর,—গৃহপালিত কেউই রেহাই পেত না।

সাধারণতঃ একদিনেই কাজ শেষ করে যোদ্ধারা ঘরে ফিরত। তবে কদাচিৎ কখনও বিজিত মহল্লায় দু'চারদিন থাকতেও হ'ত ওদের।

থাকার পেছনে একটিই কারণ, মুণ্ডুগুলো গুছিয়ে নেয়া। মহামূল্যবান ট্রফি ওরা। ওদের একটিকেও ফেলে যাওয়া চলবে না।

যোদ্ধারা ঘরে-ফেরার সময় মুণ্ডু তো সঙ্গে নিতই, তা ছাড়া নিত শিকার-করা হতভাগ্যদের হাত-পা। ছিন্ন অঙ্গগুলো নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াত ওরা দামামা বাজিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে রীতিমত উৎসব করত।

সে উৎসবও যেমন-তেমন নয় আবার, পুরোপুরি ভয়াবহ। ছিন্ন মুণ্ডুগুলোর ওপর ভাত এবং মদ ছুঁড়ত ওরা। বিড় বিড় করে কত কী বলত। আবার কখনও বা জলদগম্ভীর আদেশ শোনা যেত ওদের। মুণ্ডুগুলোর দিকে তাকিয়ে ওরা বলত,—তোদের মা-বাপকে ডাক। আত্মীয়স্বজনদের জড়ো কর। সবাইকে বল এখানে আসতে। বল্ যে, তোদের সঙ্গেই ভাত ও মদ খাবে ওরা। এই দা দিয়ে ওদেরও বধ করা হবে

সাধু প্রস্তাব। কিন্তু কেউ শুনলে তো! ছিন্নমুণ্ড ধুলায় গড়াগড়ি যেত। আর ওতেই খুনীদের রোখ যেত বেড়ে। মদ খেয়ে মাতাল হ'ত ওরা। উন্মাদের নৃত্য নাচত। আবার কখনও বা ক্রোধ ও ঘৃণায় আত্মহারা হয়ে বর্শা তুলে নিত হাতে। ছিন্ন মুণ্ডুগুলোর নাকে চোখে মুখে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার বার করে বলত,—তোদের মা-বাপকে ডাক্। আত্মীয়স্বজনদের জড়ো কর·····

কতকগুলো রেখা। সেমাদের ধারণা,
এই বলা-কওয়ার ব্যাপারে। ...দের গ্রামে গিয়ে থামে।
নয়। ওস্তাদ খুনী অর্থাৎ, যে নাকি ...ক। তবে সে-গ্রামটি আসলে
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, সে স্বভা...
দিতে চাইত। শিকার-করা মুণ্ডুগুলোকে ... ...নীভূত,—পাহাড়ের
করত সে। তারপর অন্য সব সহযোদ্ধাদের শুনিয়ে ...মগডালে বসে
আমি কে? না, পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী ও শক্তিমা... শ্রদ্ধা করো,
সমকক্ষ কেউ নেই। সব মানুষের সেরা আমি। এই যে মুণ্ডু... ...গুলি
আমি জড়ো করেছি, এমন আর কেউ পারবে? আমি সেই মে...
মতো, যে নাকি গর্জে ওঠে, আগুনের গোলা পাঠিয়ে জলের মাছকে
ধ্বংস করে; সেই বাঘের মতো, যে লাফিয়ে পড়ে হরিণকে বন্দী
করে, সেই বাজপাখির মতো, যে ছোঁ মেরে মোরগ ছানাকে নিয়ে
চম্পট দেয়। আমি যাকে পাই, তাকেই কেটে ফেলি, তার কাটা
মুণ্ডু আনি সঙ্গে করে। এই যে, এই অস্ত্রগুলোকে দিয়ে কাটি
আমি—

বলেই দু'হাতে দা আর বর্শা তুলে ধরত সে। অস্ত্রগুলো ঠোকাঠুকি করে বলত,—দেখেছ, কী ভয়ঙ্কর এরা? এদের দিয়েই সামনের এই মুণ্ডুগুলোকে শিকার করেছি। হ্যাঁ, আমিই করেছি। আবার কে?...আমার নাম জেনে রাখো। শুনে রাখো তোমরা, বনের সবচেয়ে বড় জন্তু হাতিকে প্রথম বধ করি আমি। তারপর একে একে অন্য সবাইকে। অন্যরা তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ আমার কাছে। তাই ওদের নাম আর বলছি না।

শোনা যায়, তিন-চারদিন ধরে চলত এইরকম। শিকার-করা মুণ্ডুগুলোকে ঘিরে নাচ গান আর উন্মত্ত উল্লাসে নাগারা মশগুল হ'ত। তারপর হঠাৎ শান্তি নেমে আসত গ্রামের বুকে। কাটা-মুণ্ডুগুলোকে নাহর-গাছের শাখায় শাখায় ঝুলিয়ে দেয়া হ'ত।

দু'চার দিন চুপচাপ তারপর। খুনীদের বিশ্রাম নেবার পালা।

ওদিকে গ্রামের লোকেরা বসে নেই। উত্তেজক মদ বানাচ্ছে।

আক্রমণ শুরু করত ওরা। প্রচণ্ড বাঁশের শলাকা ফুঁড়ে ফুঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

না, কেউ রেহাই পে৷ গুরুত্বপুর্ণ। এ দিয়েই পরে ধরা যাবে, না। এমন কি প৺করেছে। তবে উল্‌কি-পরানোর কাজ খুবই কুকুর ,—গৃহপ'

সাধাস্মাতাল করা হ'ত প্রথমে, বাঁশের শলাকা ফুঁডবার সময় তবে৴া দেহে বিশেষ সাড থাকে। তারপর একটি আধার থেকে .র দেহে ভস্ম ছড়িয়ে দেযা হ'ত।

বলা বাহুল্য, খুনীর ইচ্ছেতেই হ'ত এসব। কারণ, সে-বেচারী মুণ্ডু-শিকারের মতো এক বিরাট কাজ করবে, অথচ তার দেহে কাজের কোন বিজ্ঞাপন থাকবে না, তা কী হয।

এদিকে ফোঁড়াফুঁডি চলবার সময় প্রচুর রক্ত বেরোত। খুনীদের সারা দেহ ফুলে উঠত। অজ্ঞান অবস্থায তিন দিন ধরে ধুলোর ওপর পড়ে থাকত ওরা।

ওঝা আসতেন তারপর, ভাত-তিতা গাছের পল্লব-চূর্ণ হাতে। উল্‌কির ক্ষতস্থানগুলোর ওপর সেই চূর্ণ ছড়িয়ে দিতেন।

দীর্ঘ পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন লাগত সারতে। এবং সারবার পরেই বিরাট উৎসব আবার। শূকর আর মুরগী-হত্যার ধুম।

বিরাট ভোজ হ'ত। গাছের শাখা থেকে আনা ছিন্ন-মুণ্ডুগুলো উঁচুমত একটা জায়গায রাখা হ'ত।

ওই হল কোর্ট বা 'রাজ মুরাঙ্', শত্রুদের শেষ বিচার হ'ত ওখানে। এবং বিচারের সঙ্গে সঙ্গে একমাস ধরে চলত নাচ, গান আর হুল্লোড।

উল্‌কি-পরা খুনীদের কী উল্লাস তখন! নাচছে আর ঘুরে-ফিরে দেখছে দেহের চিহ্নগুলো।—

কত চিহ্ন! 'কত কিসিমের যে উল্‌কি! হাত বা পা'কে ঘিরে চক্রাকার কোনোটা, কোনোটা আবার বুকের ওপর নক্‌শি-কাটা বৃত্ত।

কতকগুলো রেখা। সেমাদের ধারণা,

উল্‌কি দেহের প্রায় সর্বত্রই'ড। ...দের গ্রামে গিয়ে থামে।
পাছা পেট বুক পিঠ নাক মুখ কান এব ...ক। তবে সে-গ্রামটি আসলে
পর্যন্ত।

সে-যুগে নাগাদের স্বপ্ন ছিল এই উল্‌কি— ...নীভূত,—পাহাড়ের
দীন-দরিদ্র কৃষকও ভাবত, এ হলে জীবন সার্থক। মগডালে বসে

কা'রও একহাতে বিশেষ এক ধরনের উল্‌কি; বুঝতে শ্রদ্ধা করো,
একজন শত্রুকে খুন করেছে। কা'রও বা দু' হাতে এবং দেহে উ... ...ব ওই
ধরে নিতে হবে, দু'জনকে খুন করেছে সে। আবার কা'রও হা...
দেহ এবং মুখে উল্‌কি, মানে, তিন জনকে খুন করে সে মহিমময়।

এই সেদিন। উনিশ শতকের শেষ দিকে। এক ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ নাগাদের বললেন,—সৈনিক হবে তো এসো। যোগ দাও আমাদের সঙ্গে। ভালো মাইনে পাবে। থাকা-খাওয়া, পোশাক-আশাক কোনো কিছুরই অভাব হবে না।

নাগারা বলল,—তা কী করে হয়? সৈনিক হলে মুণ্ডু-শিকার চলে কী করে?

সেনাধ্যক্ষ অবাক। বললেন,—মুণ্ডু-শিকার, মানে 'হেড-হান্টিং'? কী হবে ওসব করে?

উপস্থিত নাগাদের হয়ে সর্দার জবাব দিল,—অনেক কিছু। যেমন—শত্রু-হত্যা, উল্‌কি-পরা, বীর আখ্যা পাওয়া।

সেনাধ্যক্ষ শেষ চেষ্টা করলেন এবার। অনেক করে বুঝিয়ে বললেন,—কিন্তু সবাই তো আর এ-সুযোগ পায় না! বেঘোরেও কেউ কেউ প্রাণ দেয়!

সর্দার বললে,—তা দেয়। কিন্তু নাগারা আবার বদলা নিতেও ছাড়ে না।

সর্দারের কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এই বদলার মোহই নাগাদের একদিন নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল। কত নিরপরাধ যে বলি হ'ত সে-যুগে, তার আর সীমাসংখ্যা নেই।

আক্রমণ শুরু করত ওরা। প্রচণ্ড হল কেউ, তার ছিন্নশির নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। ঝাঁ চম্পট দিল; তখন ওই হতভাগ্যের

না, কেউ রেহাই পেত। আত্মীয়স্বজনরা তুলে নিত। পথের ধারে না। এমন কি প[illegible] ওটা রাখত। তিন-চারদিন বাদে অনুষ্ঠান কুকুর;—গৃহপা[illegible]ন্তু বদলার কথা কেউ ভুলত না। মাস, বছর, যুগ—

সাধার[illegible]ক দু'তিন পুরুষ পরে হলেও প্রতিশোধ ঠিকই নেয়া হ'ত। তবে [illegible]সল খুনী বা তার উত্তরপুরুষদের কাউকে পাবার দরকার নেই, [illegible]রে গ্রামের বা উপজাতির কাউকে পেলেই যথেষ্ট।

সে-যুগে কেউ বেঘোরে প্রাণ দিলে 'তোমখোঙ্' বাজাত নাগারা। চামড়া দিয়ে মোড়া বিরাট এক ফাঁপা কাঠের টুকরোর ওপর পেল্লাই সব গদা দিয়ে এমন প্রচণ্ড আঘাত করত যে, তা থেকে বেরোত হাড়-কাঁপানো বিকট শব্দ। দূর-দূরান্তর থেকে সেই শব্দ শোনা যেত, আর যে-কেউ সেটা শুনত সে-ই এক মুহূর্তে বুঝে নিত,—কেউ গেছে। এইবার অন্য কেউ যাবে। বদলা নেয়া হবে ঠিক। নতুন করে কেউ হয়তো উলকি পরবে।

সেই উল্‌কি··· সেই আদিম অন্ধকার দিনগুলোর ভয়াবহ স্মৃতি আগন্তুক নাগাটির দেহে সেদিন দেখেছিলাম। কথায় কথায় ডঃ আরামের কাছ থেকে 'হেড্-হান্টিং'-এর গল্প শুনেছিলাম অনেক। কিন্তু সে-সব থাক। আগ[illegible]োকির কথায় ফেরা যাক বরং।

একদিন। ডঃ আরামের সঙ্গে তাঁর গ্রামে গেলাম। তিজু-উপত্যকার দুর্গম ও দুরধিগম্য এক গ্রাম। সেমা-নাগাদের বাসভূমি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক চড়াই-উৎরাই আর বন-পাহাড় ডিঙিয়ে ওখানে যেতে হল। জীপ গ্রাম অবধি যাবে না। পথ নেই। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে গেল। আমরা হাঁটা-পথ ধরে গ্রামের দিকে এগোলাম। সঙ্গে আগ্‌হোকি, পথ দেখাচ্ছে; আর জীপ-ড্রাইভার নকলো দোভাষীর কাজ করছে। কিন্তু গ্রাম

কতকগুলো রেখা। সেমাদের ধারণা,

কোথায়? আশেপাশে শুধু খাড়া ...দের গ্রামে গিয়ে থামে।
চারিদিকে। ...ক। তবে সে-গ্রামটি আসলে

—গ্রাম কোথায়?—আগ্‌হোকিকে ...

যেন বলল। নকলো হিন্দীতে বুঝিয়ে দিল,— ...নীভূত,—পাহাড়ের
পাহাড়ের চূড়ায়। মগডালে বসে

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ; চূড়ায়ই বটে। ... শ্রদ্ধা করো,
নাকের ডগাতেই যে পাহাড়টি, তার মাথায়। ...ক যাবে ওই

চড়াই পথ ধরে এগোলাম সেদিকে। আগ্‌হো...

...খাথ, মিল খাথ। আর সব নাগা উপজাতি আঙ্গামী, আও, ... বাড়ির
বা রেঙ্গমারা যেমন, আমরাও তেমনি পাহাড়ের মাথায় গ্রাম গড়ি।

বললাম,—হুঁ। তাই বটে। আঙ্গামী ভিলেজ কোহিমার বেলায়ও দেখেছি।

—দেখবেই,—সায় দিল আগ্‌হোকি,—পাহাড়ের মাথায় ছাড়া গ্রামই নেই এদিকে।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলি। গ্রামের কাছাকাছি হই।

ছোট্ট গ্রাম। তার এখানে-সেখানে ঘর। পরিকল্পনার বালাই নেই। কোহিমা ভিলেজ-এ দেখেছি, সারি সারি পথ; তার দু'ধারে বাড়ি। কিন্তু এখানে দেখলাম, পথের সঙ্গে বাড়ির সম্পর্ক নেই; ঘরগুলো যে-যার খুশিমাফিক গড়েছে, পথের তোয়াক্কা না করেই।

আগ্‌হোকি বলল,—এই নাকি রেওয়াজ; সেমা-নাগাদের গ্রাম আদ্যিকাল থেকেই এ-রকম।

ডঃ আরাম বললেন,—এরা ছোটও বটে। বিশেষ করে আর সব নাগা-গ্রামের তুলনায়।

ভাবলাম, কে জানে! হবে হয়তো। ক'টা গ্রাম আর দেখেছি!—

ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছিলাম দিব্যি। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দিচ্ছিল। গ্রামের লোকেরা এদিক-ওদিক থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল বার বার।

আক্রমণ শুরু করত ওরা। প্র পাশেই খড়ে-ছাওয়া একচালা
ঝাঁপিয়ে পড়ত। মোষ, কিসের যেন একটি কঙ্কাল।

না, কেউ রেহাই পেত, আরও কিছু; কঙ্কালের গা-ঘেঁষে একটি
না। এমন কি প

কুকুর;—গৃহপা? কী ওখানে?—আগ্‌হোকিকে শুধাতেই সে
সাহক। সেমা-নাগাদের কেউ মরলে এ গড়া হয়।

তদৌসল খুনীয় ও সমাধির গল্প উঠল। আগ্‌হোকির কাছ থেকে
র গ্রামে সেমাদের কেউ মরলে তাকে তার বাড়ির পাশেই সমাধি
সেওয়। সাধারণতঃ ফুট তিনেক গভীর হয় সমাধি। মৃতের
চামড় বাঁশের মাছুর দিয়ে মুড়ে ওখানে পুঁতে রাখা হয়।

শেষকৃত্যের দিনে গো-হত্যা হবে। গোরুর কঙ্কালটি থাকবে
সমাধির ওপর। আর থাকবে বর্শা ও ঢাল; অবশ্য মৃত যদি সেমা-
পুরুষ হয়: জীবিতকালে বর্শা ও ঢাল ব্যবহার করে থাকে যদি।

মেয়েদের বেলায়, বিশেষ করে যেসব মেয়ে প্রসব করতে গিয়ে
মরে তাদের বেলায় উৎসব প্রায় কিছুই হয় না। কোনোরকমে
তাদের শেষকৃত্য সারা হয়।

নবজাত শিশুরা মরলে উৎসব আরও কম। বাড়ির ভেতরে গর্ত
খুঁড়েই কাজ হাসিল।

—ঐ যে! সামনেই একটি বাড়ি,—সমাধি পেরিয়ে কয়েক পা
এগোতেই আগ্‌হোকি বলে,—শিশু অনেক মরেছে ও-বাড়িতে
ওরই কোন্ এক মরদ নাকি 'কিটিলা'কে পরোয়া করত না।

শুধালাম,—'কিটিলা'? কে সে?

আগ্‌গোকি বললে,—কেউ নয়। পথ একটা। ওখা-পাহাড়ের
গা-বেয়ে গিয়েছে। পথ

বুঝলাম না ঠিক। ডঃ আরামকে ধরতে হল অগত্যা। রে
'কিটিলা' কী?

—মৃত মানুষদের পথ,—উনি শুরু করলেন,—আসলে ওখাম

পাহাড়ের গায়ে গায়ে অদ্ভুত কতকগুলো রেখা। সেমাদের ধারণা, মানুষ মৃত্যুর পর ও-ধরে যায়। মৃতদের গ্রামে গিয়ে থামে।

নকলোও সায় দিল, কথাটা নাকি ঠিক। তবে সে-গ্রামটি আসলে যে কোথায়, তা কেউ জানে না।

কে জানবে।—আগহোকির কথায় রহস্য ঘনীভূত,—পাহাড়ের এপারে বসে ওপারকে কী দেখা যায়? গাছের মগডালে বসে শিকড়ের নাগাল পায় কেউ? তবে হ্যাঁ, 'কিটিলা'কে শ্রদ্ধা করো, বিশ্বাস করো। পথ ঠিক পাবে মৃত্যুর পর ঠিক যাবে ওই গ্রামে

কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলি বড় গাছের এক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই।

আগহোকি বলল,—এই আমার বাড়ি ভেতরে এসো।

যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, সেমা-গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়ি এটি। চৌকোমতো পাথর কেটে কেটে গড়া ছাদে পাথর নেই। খড় আর ঘাস শুধু

অবাক হয়ে সব দেখছিলাম। ডঃ আবাম সেটা লক্ষ্য করে বলেন,—কী অত দেখছেন? এ হল সর্দারের বাড়ি অন্যদের চেয়ে বড় এ হবেই।

আগহোকি বলল,—হুঁ, তাই বটে সেমা-নাগাদের বেলায় এ হয়। সর্দারদের আলাদা খাতির এই সেমা-মুল্লুকে

সেদিন খাতিরের গল্প আরও অনেক শুনলাম আগহোকির ঘরে বসে কথা হল শুনলাম, বংশানুবংশপরম্পরায় সেমা-গ্রামে সর্দার নির্বাচিত হয়। আগে স্বর্গসুখ ছিল সর্দারদের। চাষবাস নাকি কিছুই প্রায় করতে হ'ত না। অন্য সব গ্রামবাসীরা জুম-চাষ করে পেত, সর্দাররা সব সময়েই ভাগ পেত তার। এবং এমনকি গ্রামে কোনো পশু বধ করা হলেও সর্দারকে কিছু মাংস দিতে হ'ত।

সেমা-সর্দারের বাড়ি অন্য সকলের চেয়ে বড়। কারণ, পরিবারও

বড় ছিল তার। স্ত্রী একটি নয়, কয়েকটি ;—তিন, চার এবং এমনকি পাঁচ অবধি।

সেমা-সর্দারের ছেলেরা বড় হলেই নিজেদের চেষ্টায় আলাদা আলাদা গ্রাম গড়ত। তাই সেমা-গ্রামগুলো হ'ত অন্য সব নাগা-গ্রামের তুলনায় ছোট।

তা হোক। সেমারা দুর্ধর্ষ। অন্য সব নাগা উপজাতির তুলনায় ভয়ঙ্কর। অস্ত্রশস্ত্রকে আজও ওরা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু মনে করে।

আগ্‌হোকির কথাই ধরা যাক। কথা বলতে বলতে কতবার যে বাহারী সব বর্শা, দাউ আর ঢাল এনে এনে দেখাল, সীমাসংখ্যা নেই তা'র।

বর্শাগুলো বড় সুন্দর দেখতে। আগ্‌হোকি বলেছিল,—শুধ সুন্দর নয়, কাজেরও খুব। শত্রুকে একটু দূর থেকে ঘায়েল করতে চাও তো এ-নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকো গিয়ে। সুযোগ বুঝে ছুঁড়বে। দেখো, শত্রু আর পালাবার পথ পাবে না। সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গিয়ে ছটফট করবে কেমন!

কথা বলতে বলতে আগ্‌হোকির চোখে-মুখে আদিম হিংসা ফুটে উঠছিল সেদিন। মনে হচ্ছিল, সুযোগ পেলে এখনই ছুটে গিয়ে সে কাজ হাঁসিল করবে।

ডঃ আরাম ধীর ও শান্ত তখন। আগ্‌হোকিরই কথার সূত্র ধরে বললেন,—তা বটে। বর্শাগুলো খুব কাজের বটে। তিরিশ গজ অবধি দূরের শত্রুকে অনায়াসেই ঘায়েল করে।

বললাম,—তাই নাকি ?

বলেই আগ্‌হোকির হাত থেকে একটা বর্শা চেয়ে নিয়ে দেখতে শুরু করলাম। হ্যাঁ, জিনিসটা সুন্দর ও সুদৃশ্য বটে। ঝকঝকে লোহায় গড়া এর ফলা ; লম্বায় প্রায় দু' ফুট, চওড়ায় দু'-তিন ইঞ্চি। মূল দণ্ডটি চার থেকে পাঁচ ফুট আন্দাজ লম্বা। চমৎকার

কারুকার্যখচিত।' লালচে ভেড়ার লোমের সং্

রঙের অদ্ভুত কিছু চুল তার এখানে-সেখানে। ৲ আমি দেখলাম, সেখানে বেতের ওপর কারুকার্য। লালচে ও হলদে রঙের, তার গা ওয়া, মূল দণ্ডটির গায়ে গায়ে জড়ানো। এ-ছাড়া বর্শার ৲

আধ ফুট আন্দাজ লম্বা এক গজাল। এনেছ

আগহোকিকে শুধালাম,—গজাল কেন?

ও বললে,—প্রয়োজনে। গজালটি মাটিতে পুঁতে দাও একটু পর বর্শা দাঁড়িয়ে থাকবে। ফলার কোনো ক্ষতি হবে না।

ডঃ আরাম সায় দিলেন,—হ্যা, ঠিক। ফলাটি তখন থাকবে আকাশের দিকে মুখ করে।

শুধালাম,—এতে লাভ?

ডঃ আরাম বললেন,—লাভ অনেক। দণ্ডটি সোজা থাকবে। ফলার ধারও নষ্ট হবে না।

—আসলে কী জানেন?—একটু থেমে আবার শুরু করেন তিনি। —নাগারা কখনও দেয়ালে হেলানো অবস্থায় বর্শা রাখে না। হয় ঝুলিয়ে রাখবে, আর না-হয় গজালের দিকটা মাটিতে পুঁতে রাখবে।

বললাম,—ব্যবস্থাটা পুরো বৈজ্ঞানিক তাহলে?

ডঃ আরাম ম্লান হেসে জবাব দিলেন,—পুরো না হোক, প্রায় তো বটেই।

এতক্ষণে আগহোকি বিরাট এক দাউ নিয়ে হাজির। ধার পরীক্ষা করতে করতে সগর্বে বললে,—কেমন দেখছেন?

বললাম,—চমৎকার!

—নিন, হাতে নিয়ে দেখুন!—বলেই আগহোকি এগিয়ে এলো আমার দিকে। বর্শাটি ফিরিয়ে নিয়ে দাউটি গছিয়ে দিল।

দাউ হাতে নিয়ে আমি কাহিল। বেশ ভারী ওটা। চার-পাঁচ কিলোর কম নয়। তাছাড়া, আকারেও বিরাট; মূল ফলার দৈর্ঘ্যই প্রায় দেড় ফুট।

বড় ছিল তার। স্ত্রী একটি
পাঁচ অবধি।
সেমা-সর্দারের
আলাদা গ্রাম গ
গ্রামের তুলন
তা হে
ভয়ঙ্কর
মে

...উটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম,—এ-দিয়েই তো এক সময়? কেমন? তাই না?

...ক আমার প্রশ্ন শুনে জুল জুল করে তাকাল। হাসল ওর এই হাবভাব দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হতে আমার। মনে হল, 'হেড্-হাণ্টার'-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ...য নাগাভূমি তা'র সমস্ত ছল, বল ও জিঘাংসা নিয়ে আমায় গ্রাস রতে উদ্যত।

দাউ নিয়ে চলে গেল আগ্‌হোকি। ফিরল বিরাট এক ঢাল নিয়ে। পাঁচ থেকে ছ'-ফুট লম্বা। সুদৃশ্য।

এবার ঢালটিকে পরীক্ষা করার পালা। হাতে নিয়ে দেখি, বেশ মজবুত জিনিস। কঞ্চির ওপর কিসের যেন চামড়া বিছানো। চামড়ার গায়ে আবার আঁকিবুকি। মানুষের মুখ বোধ করি। ঢালের পেছন দিকটায় তক্তা; অথাৎ, আসল জিনিস; বর্শার ফলা থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। ঢালটি ওপর থেকে নীচে ক্রমশ সরু হয়ে এল। ওপরের অংশ ফুট দু'য়েক চওড়া, নীচের অংশের প্রায় দ্বিগুণ। চওড়া জায়গাটির সামনের দিকে ঝুলে আছে লালচে আভার কিছু ভেড়ার লোম, আর কিছু বহুবর্ণ পালক।

অবাক হয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ ডঃ আরাম বললেন,—দুর্ভাগ্য, আসল জিনিসই দেখলেন না।

শুধালাম,—আসল জিনিস? মানে?

ডঃ আরাম জবাব দিলেন,—মানে, ভয়ঙ্কর। ঢাল বনেদী হলে অন্য চেহারা তার। ভেড়ার লোম বা পাখির পালকই শুধু নয়, মানুষের চুলও ওতে থাকবে। মেয়ে-মানুষের চুল; ঢালের মালিক যে-মেয়েকে নাকি নিজ হাতে খুন করেছে।

আগ্‌হোকি আমাদের ইংরেজী কথাবার্তা তন্ময় হয়ে শুনছিল। আদৌ কিছু বুঝছিল কিনা, জানিনে। কিন্তু যখন দেখলাম, এক ফাঁকে সরে গেল সে, ফিরে এল অদ্ভুত-দর্শন একটি ঢাল নিয়ে, তখন

ওর বোধশক্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাই হল আমার। কারণ, আমি দেখলাম, 'আসল জিনিস'টি ওর হাতে ; যে ঢালটি ও এবার এনেছে, তার গা বেয়ে যেন মানুষেরই কালো কুচকুচে চুল।

ডঃ আরাম ঢাল দেখে শিউরে উঠলেন,—এই যে! এনেছ দেখছি! হ্যাঁ হ্যাঁ, 'আসল জিনিস'ই বটে!

আগ্‌হোকি ঢালটিকে দু'হাত দিয়ে ধরে আছে তখন। আবার সেইরকম জ্বল জ্বল করে তাকাচ্ছে। যেন আদিম হিংসা ওর চোখে-মুখে। হাতে তখনও রক্তের দাগ।

ডঃ আরাম অস্বস্তিকর আবহাওয়াটা লঘু করলেন একটু,—না না, আগ্‌হোকি নয় ; ওর বাবার আমলের জিনিস। এর কথা আগেও শুনেছি। আগ্‌হোকিই বলেছে।

ভাবলাম, যাক! তবু ভালো। আগ্‌হোকি খুন করে নি! খোদ 'হেড্-হাণ্টার'-এর সামনে আমরা বসে নেই।···কিন্তু আগ্‌হোকির চোখে-মুখে ওগুলো কিসের দাগ? নাগা-সর্দার ঢাল নিয়ে চলে যেতেই ডঃ আরামকে শুধিয়েছিলাম।

জবাব পাই নি ঠিক। আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে উনি বলেছিলেন,—ঠিক জানিনে। 'হেড্-হান্টিং' তো নেই আজকাল। বন্ধই এক-রকম। তবে ওই দাগগুলো দেখে আমারও সন্দেহ হয়। ইচ্ছে হয় বলতে, ঠিকই ধরেছেন।

নকলো পাশেই ছিল। বললে,—জী সাহাব! বিলকুল! লেকিন···

আরও কী যেন বলতে চাইছিল সে। হঠাৎ বাধা পড়ে। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে দু'জন নাগা। ওদের হাতে বর্শা, চোখে-মুখে শঙ্কা ও সন্ত্রাস।

নকলোর সঙ্গে কী যেন কথাবার্তা হয় ওদের। নাগা-সর্দার আগ্‌হোকিকে ওরা কিছু একটা খবর দিতে চায়।

নকলো ওদের ভেতরে যেতে বলল। আর ওরাও সঙ্গে সঙ্গেই ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

শুধালাম,—ব্যাপার কী নকলো ? কী হয়েছে ?

নকলো ভাঙা হিন্দী আর ভুল ইংরেজী মিশিয়ে যা বলল তা'র মানে দাঁড়ায়,—হযনি এখনও, হবে। বাঘ-শিকার। তিজুর পশ্চিম দিকের জঙ্গলে কে নাকি এক দুশমনকে দেখেছে।

ডঃ আরাম বললেন,—হুঁ! দেখেছে যখন, দুশমনের তখন দফা-রফা। সর্দারকে নিয়ে এখনই ওরা ছুটবে।

ছুটলও। ডঃ আরামের কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলল। মিনিট খানেকও পেরোয় নি, দেখি, কোমরে দাউ আর হাতে বর্শা নিয়ে নাগা-সর্দার প্রস্তুত। আগন্তুক ওই দু'জন নাগাকে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডঃ আরাম শুধালেন,—চললে ?

আগ্‌হোকি জবাব দিল না কিছু। জুল-জুল করে একবার তাকাল শুধু। মিটি-মিটি হাসল।

অদ্ভুত সেই হাসি। আশ্চর্য সেই চাউনি। মনে হল, আদিম হিংসা গলিত লাভাস্রোতের মতো ফুটছে, জ্বলন্ত ক্রোধ মূর্তিমান বজ্রের মতো এগোচ্ছে। ধ্বংস ও হত্যার নেশায় মরীয়া হয়ে উঠেছে আগ্‌হোকি।

—চললে ?—আবার শুধালেন ডঃ আরাম।

আগ্‌হোকি এবারও জবাব দিল না কিছু। সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। কোনোরকম ভূমিকা নেই, অতিথিদের ফেলে যাচ্ছে বলে কোন ক্ষোভ নেই। যেন যাবার ব্যাপারটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক, অথচ গুরুত্বপূর্ণ। যেন সেই 'হেড্-হান্টিং'-এর যুগ ফিরে এসেছে আবার। নাগা-যোদ্ধা রক্তস্নান করবে বলে উন্মত্ত উল্লাসে ছুটছে।

সন্দেহ হল, তবে কি প্রবৃত্তির কারসাজি এ ? রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ডের মোহ আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি নাগারা ? বাঘ-শিকারের নামে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবে বলেই এই ভৈরব-উল্লাস ? তাড়াতাড়ি এমন উন্মাদের মতো ছুটে যাওয়া ?

শতাম।

কে জানে! প্রতিটি মানব-মনের গহনে যে সুপ্ত এক একটি আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে আছে, কে তার খবর রাখে! এমন-কি, সামনের ওই নকলোকেই কি জানি আমরা? নাগাদের শিকার-যাত্রা দেখে ওরও রক্ত যে টগবগ করে ফুটছে না, তার প্রমাণ কী?

আকাশ-পাতাল ভাবি সেদিন। দূর থেকে ভেসে-আসা নাগাদের কলরবের মধ্যে ছিন্নমুণ্ডলোলুপ অতীতের দুর্দান্ত পাহাড়ীয়াদের খুঁজে পাই। কখন আবার চমক ভাঙে হঠাৎ। ডঃ আরাম তাড়া দেন,—নিন, চলুন এবার। ফেরা যাক।

—ফিরব?—আমি অবাক একটু,—কিন্তু কাজ যে সব পড়ে! 'পীস-সেণ্টার'-এর চাঁদা, আগ্‌হোকিকে নিয়ে নাগাদের সঙ্গে আলোচনা, 'পীস-কমিটি'র বৈঠক—সবই পড়ে যে!

ডঃ আরাম সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন,—হুঁ, তা বটে! সব পড়ে। কিন্তু উপায়ই বা কী! 'পীস-মিশন'কে আজ কি আর আমল দেবে কেউ? কাজকর্ম আদৌ কিছু হবে?

বললাম,—কেন হবে না! ওরা ঘরে ফিরুক। আমরা অপেক্ষা করি ততক্ষণ।

ডঃ আরাম হা-হা করে উঠলেন,—তবেই হয়েছে। নাগা-বন্ধুদের খুব চিনেছেন! আরে মশাই, ঘরে ফিরে ওরা কি আর ওদের থাকবে?

সেদিন জবাব দিই নি কিছু। ডঃ আরামের কথাই মেনে নিয়েছিলাম। তিজু-উপত্যকার গা-বেয়ে চলবার সময় স্পষ্ট শুনেছিলাম, শিকার-পাগল নাগাদের কলরব ভেসে আসছে। বন-পাহাড়ের আড়াল থেকে আদ্যিকালের নাগাভূমি কথা কইছে।

কিন্তু কথা কি একরকমের? না কি নাগাভূমি একটুখানি জায়গা?

খানিকদূর যেতে-না-যেতেই অন্য এক কলরব কানে আসে। মনে হয়, কা'রা যেন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে।

—ওরা কা'রা ?—ডঃ আরামকে শুধিয়েছিলাম,—কিসের কলরব ওদিকে ?

ডঃ আরাম সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছিলেন,—নাগাদের। 'ওয়ার ড্যান্স্' চলছে।

—'ওয়ার ড্যান্স্' ?

—হ্যাঁ, নাগাদের সবচেয়ে প্রিয় 'ফেস্টিভ্যাল'। দেখবেন ?

—দেখতে পারি, যদি না আপত্তির কিছু থাকে।

—আপত্তি ? কী যে বলেন ! নাগারা খুশিই হবে বরং।

দেখলাম, কথাটা সত্যি। অক্ষরে অক্ষরে। নাগারা আগন্তুক দেখে বিরক্ত হয় নি ; খুশিই হয়েছিল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে সরু আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরি সেদিন। চড়াই বেয়ে খানিকদূর এগিয়ে প্রায়-সমতল একফালি উঠোনের সামনে এসে দাঁড়াই।

উঠোনটি ঝোপ-জঙ্গলে ঘেরা। জঙ্গলের গা-বেয়ে উঠে গেল খাড়া পাহাড়। যেন স্টেডিয়াম। সুদৃশ্য ও সমুন্নত কিছু ; ভেতরে না ঢুকলে কিছু দেখবার জো নেই।

আমরা ভেতরে ঢুকি ধীরে ধীরে। চড়াই পথটা শেষ হতেই ছোট্ট এক গিরিসংকট পেরিয়ে খানিকটা নীচে নামি। খোদ উঠোনে পা বাড়াই।

ওখানে নাচের আসর জমজমাট। 'ওয়ার ড্যান্স্' চলছে। দু'-দু'টি বৃত্ত থেকে থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে যেন।

ভেতরের বৃত্তটিতে মেয়েরা। নীল বসন ওদের, গায়ে প্রচুর অলঙ্কার। তামার বড় বড় চাকৃতি গলায়, কানে পাথরের দুল। ওরা খুব ধীরে ধীরে নাচছে। গাইছে ধীর ও শান্ত লয়ে। কিন্তু বাইরের বৃত্তটিতে পুরুষদের হালচাল একেবারে আলাদা। ওরা যোদ্ধার বেশে সুসজ্জিত। ওদের একহাতে ঢাল, আর অন্যহাতে দাউ বা বর্শা। থেকে থেকে সোজা লাফিয়ে উঠছে ওরা। কখনও বা ডাইনে-বাঁয়ে প্রচণ্ড এক-একটা লাফ দিচ্ছে। যেন যুদ্ধে ব্যস্ত

সব। শত্রু-হত্যার তাগিদে দিশাহারা। চোখ-মুখ থেকে জিঘাংসা ফুটে বেরোচ্ছে। প্রচণ্ড হুঙ্কারে মুখরিত হচ্ছে আকাশ-বাতাস।

একটু বাদেই মেয়েরা সরে গেল। বীর যোদ্ধারা শুরু করল আসল অভিনয়।

হ্যাঁ, ত্রুটি নেই কোথাও। এগুনো, পেছনো, আত্মরক্ষার কায়দা, শত্রুকে ঘায়েল করার কসরৎ—সব কিছুই দেখাল ওরা। এমনভাবে দেখাল যেন, সত্যিকারের কোনো যুদ্ধ চলছে।

অবাক বিস্ময়ে সেই যুদ্ধ দেখেছিলাম সেদিন। ডঃ আরাম বলেছিলেন,—'ওয়ার ড্যান্স্'-এ মেয়েরা বড় একটা থাকে না। ওটা আসলে পুরুষের ড্যান্স্। আপনি যে মেয়েদের নাচতে দেখলেন, তা কিন্তু ব্যতিক্রম।

—ওহ্! তাই বুঝি!—বলেই নকলোর খোঁজ করলাম একবার। ভাবলাম, এ-ব্যাপারে ওর কাছ থেকে নতুন কিছু জানা যাবে।

কিন্তু কোথায় নকলো! ভালো করে তাকিয়ে দেখি, নাচের আসরে ভিড়ে পড়েছে সে। নিজে না নাচলেও প্রচণ্ড উৎসাহে তালিম দিচ্ছে নাচিয়েদের।

ওদিকে মেয়েরাও দিচ্ছে তালিম। আসরের পাশে দাঁড়িয়ে একঘেয়ে একটানা সুরে কী যেন গাইছে। ডঃ আরামকে বললাম,—গান কিন্তু জমছে না তেমন। তবে হ্যা, নাচ জমজমাট।

ডঃ আরাম সায় দিলেন,—ঠিক; ঠিক ধরেছেন। আসলে নাচই ওদের প্রাণ; জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাই ও জিনিস জীবন্ত হয় এমন; দেখলেই মনে ধরে।

বলতে যাচ্ছিলাম,—যা বলেছেন! সবই সত্যি মনে হচ্ছে যেন। কিন্তু বলা আর হল না। তা'র আগেই ভীষণ জোরে দামামা বেজে উঠল। নাচিয়েরা উন্মত্ত উল্লাসে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। প্রচণ্ড কলরবে চারিদিক থরোথরো কাঁপতে লাগল যেন।

অবশেষে কাঁপন কিছুটা কমতে ডঃ আরাম বললেন,—কেমন?

বোঝা গেল সব? 'ক্লাইম্যাক্স্'-এ হেড-হান্টিং-এর অভিনয় মনে ধরল?

বললাম,—একটু বেশি মাত্রায়ই ধরেছে। মন বলছে, এবার পালিয়ে বাঁচি।

ডঃ আরাম হো-হো করে হেসে উঠলেন। ওদিকে নকলো এগিয়ে আসছে। সঙ্গে জন দুই নাগা।

ব্যাপার কী?...ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই দেখি, নাগাদের একজন আমাদের সামনে কিছু মদ রাখল। অন্যজন ইংবিং করে যা বলল, তার মানে দাঁড়ায়, খাও; তাকিয়ে তাকিয়ে আবার দেখছ কী?

ডঃ আরাম সিগারেট উপহার দিলেন ওদের। পরক্ষণেই আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্-ফিস্ করলেন,—এই হল এদের অভ্যর্থনা। মদ না খান আপত্তি নেই; খাবার ভান করুন অন্ততঃ, ওরা খুশি হবে।

অগত্যা তাই করতে হল। শিশুদের রান্না-রান্না খেলার সময় বড়দের নেমন্তন্ন খাবার অনুকরণে ভোলাতে হল নাগাদের।

কিন্তু ভোলাতে গিয়েও পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসার উপক্রম। যেমন দুর্গন্ধ ওই মদের, তেমনি বিদ্‌ঘুটে ওর রঙ্।

ওদিকে নাগারা সিগারেট ধরিয়ে তখন সুখটান দিচ্ছে। ডঃ আরামের দেয়া দু'-দু' প্যাকেট সিগারেট মুহূর্তের মধ্যে বিলি হয়ে গেছে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে। কেউ কেউ পরম কৌতূহলে দেখছে আমাদের। আবার কেউ বা সিগারেট খেতে খেতেই নাচের তালিম দিচ্ছে।

উঠি-উঠি করছিলাম, এমন সময় নাগাদের একজন হাত-পা নেড়ে কী যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গেই দোভাষী নকলো বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা,—বলছে কী, তোমরা আসাতে খুব খুশি। আবার এসো। সঙ্গে সিগারেট এনো যেন।

বললাম,—নিশ্চয়! নিশ্চয় আনব।

ডঃ আরামও সায় দিলেন,—ও ইয়েস্! ইয়েস্!

সেদিন পথে যেতে যেতে নাগাদের অভ্যর্থনা আর খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কথা উঠল। ডঃ আরাম বললেন,—কী জানেন, আগ্‌হোকিও ঠিক একই রকমভাবে মদ দিয়ে অভ্যর্থনা করত আমাদের। ফুরসং পেল না। আগেই শিকারের ডাক এলো।

শুধালাম,—আচ্ছা, শিকারদের কী করে ওরা? খায়?

আবার হো হো করে হেসে উঠলেন ডঃ আরাম। বললেন,—দেখুন, এমন শিকার খুব কমই আছে যা অন্ততঃ কিছুকাল আগেও ওরা খায় নি। বাঘ, হাতি, গণ্ডার, কুকুর, শূকর, ইঁদুর এবং এমনকি সাপ পর্যন্ত খেত ওরা। মরা হাতির দাম 'লাখ টাকার চেয়েও' বেশি ছিল ওদের কাছে। না না, হাতির মাংস রান্না করে ওরা খায় নি। আগুনে ঝলসে নিয়েই খেত।

স্তব্ধ বিস্ময়ে ডঃ আরামের কথা শুনছিলাম সেদিন। থেকে থেকে আশেপাশের বন-পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম। সন্ধ্যে হয় হয় তখন। চারদিকে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা।—

ঠাণ্ডা নামছে। কুয়াশা জমাট বাঁধছে ক্রমেই। অনেক নীচের উপত্যকা থেকে আঁধার হামাগুড়ি দিয়ে যেন ওপরে উঠছে; দেখতে দেখতে অস্পষ্ট ও রহস্যময় করে তুলছে সব কিছু।

অস্পষ্ট—সব অস্পষ্ট হয়ে উঠল খানিক বাদেই। সন্ধ্যে নামবার সঙ্গে সঙ্গে রহস্য চারিদিক থেকে যেন গলা টিপে ধরল। পাহাড়গুলোকে অতিকায় এক একটি ছায়া বলে মনে হল এক একবার। পরক্ষণেই আবার মনে হল, ছায়া নয় ঠিক; অতন্দ্র সব প্রহরী, কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে ঝিমোচ্ছে; সেকালের সেই আদিম-উদ্দাম নাগাভূমির স্বপ্ন দেখছে হয়তো।

'পীস-সেণ্টার'-এর জীপ একালের জিনিস। কিন্তু তারও ছন্দে যেন

সেকাল প্রতিধ্বনিত। আঁধারের বুক চিরে সে যুগের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের মতো ছুটছে সে। তার তীব্র 'হেড-লাইট' বজ্র-ভীষণ বর্শার ফলার মতো এগোচ্ছে।

খানিক বাদে বাদে বাঁক। 'হেড-লাইট' যেন 'সার্চ-লাইট'-এর ভূমিকা নিচ্ছে। বনভূমির অনেকটা করে জায়গায় আলোর বৃত্তচাপ আঁকছে যেন।

না, কেউ কোথাও নেই। চারিদিক নিঃঝুম, নিস্তব্ধ। জীপের একটানা আর্তনাদ ছাড়া আর কোনো স্পন্দন নেই কোনোদিকে। এমনকি গাছের পাতাও নড়ছে কিনা বোঝবার জো নেই। পীচের মতো গাঢ় ঘন আঁধারে চারিদিক ঢাকা।

হঠাৎ আঁধার একটু ফিকে হল যেন। মনে হল, পথের ঠিক পাশেই কারা যেন আগুন জ্বেলেছে।

—ওরা কারা?—ডঃ আরামকে শুধাব, এমন সময় দেখি, গাড়ি বাঁক ফিরছে; 'হেড-লাইট'-এর আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ছে, সামনেই এক নাগা-গ্রাম; আর পথের একেবারে গা-ঘেঁষে অদ্ভুত-দর্শন বাড়ি একটি। বিরাট এক পোড়ো বাড়ি যেন।

যাবার সময় খেয়াল করিনি এদের। এই বাড়ি এবং গ্রাম আমার বিপরীত দিকে ছিল। এখন খেয়াল হতেই ডঃ আরামকে বিশেষ করে বাড়িটির সম্পর্কে শুধালাম। গাড়ি এগিয়ে গেছে ততক্ষণে বেশ খানিকটা।

ডঃ আরাম জবাব দিলেন না কিছু। নকলোকে শুধু বললেন,—গাড়ি 'ব্যাক' করো; বাঁকের মুখে মোরাঙ্-এর সামনে রাখ।

মোরাঙ্! নাম শুনে চমকে উঠি। অনেক শুনেছি এর কথা। কিছুকাল আগেও শত শত মোরাঙ্ ছিল নাগাভূমিতে।

আজ ওরা নেই, তা নয়; তবে সংখ্যায় আগের তুলনায় অনেক কম। সে-যুগে অবিবাহিতরা সকলেই দল বেঁধে মোরাঙে থাকত। মোরাঙ্ ছিল মেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ছেলেদের ন'-দশ বছর

বয়স হলেই মোরাঙে যেতে হ'ত। মা-বাপের আস্তানায় থাকা চলত না আর। অবশ্য মা-বাপ খাবার যোগাত ছেলের। ছেলেও কাজকর্মে ওদের সাহায্য করত। কুমারীদের আস্তানা ভিন্ন জায়গায়; 'ট্যাবু'তে। ঠিক মোরাঙের মতোই বড়সড় ওগুলো; দল বেঁধে থাকবার মতো।

এই ট্যাবু বা মোরাঙ্ বেশ বড়সড় হওয়া চাই। গ্রামের বড় বাড়ি বলতে ওরাই। কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের বেশিদিন মন টিকত না ওখানে। পনের বা ষোলতে পা দিয়েই ওরা উসখুস করত। সঙ্গিনী খুঁজত মনের মতো। এমন সঙ্গিনী যাকে সহজেই বিয়ে করা যায়, যার হাত ধরে মোরাঙের বড় ঘরের মায়া কাটিয়ে ছোট্ট একটা ঘর-বাঁধা যায়।

মেয়েদের আস্তানা ট্যাবুতে হামেশাই যেত ছেলেরা। হাসি-ঠাট্টায় বা গল্পগুজবে কেউ বাধা দিত না। তবে পাত্রী দয়িতের উপযুক্ত হওয়া চাই। মামাতো বোন হলেই সবচেয়ে ভালো; জ্যাঠতুত বা খুড়তুত হলেও চলতে পারে। আবার মোরাঙ্‌বাসী যে তরুণটির দাদা মরেছে অথচ বৌদি বেঁচে, সে কিন্তু পাত্রীর খোঁজে অন্য কোথাও যাবে না; হয় বৌদির কাছে গিয়ে ঘুরঘুর করবে, আর না হয় অসহায়ভাবে বসে থেকে অন্যদের কীর্তিকাহিনী শুনবে। কেননা, নাগা-সমাজের কানুন অনুযায়ী বৌদির সঙ্গেই বিয়ে হবে তার, তা বয়সে তিনি যত বড়ই হোন। ছেলেপুলে যদি না থাকে তো বুড়ো বৌদির সঙ্গে শিশু দেবরের বিয়ে হতেও আপত্তি নেই। কিন্তু ছেলেপুলে থাকলেই বিয়ে বারণ। বৌদির কপালে বৈধব্য; আর দেবরের কপালে ট্যাবুতে গিয়ে যথাবিহিত পাত্রী-তল্লাশ।

এই তল্লাশের ব্যাপারে পাত্রীরাও অবিশ্যি কম যেত না। ছেলে-ছোকরাদের হাবভাব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করত ওরা, কার দৌড় কতদূর তা নানাভাবে যাচাই করত। ছেলেরা ওদিকে অস্থির,

যাচাইয়ের ঠ্যালায় দিশেহারা। তাই ওরা প্রেয়সীর মন বুঝবার জন্যে অদ্ভুত এক পরীক্ষার ব্যবস্থা করল। ধূমপানের পরীক্ষা।···প্রেয়সীকে নিয়ে বেড়াচ্ছে, গল্পগুজব চলছে পুরোদমে, এমন সময় ওরা নিজেরা ধূমপান করতে করতে ধূমের পান-পাত্রটিকে প্রেয়সীর সামনে আলতোভাবে মেলে ধরত। প্রেয়সী ধূমপান করলে বুঝতে হবে, দরখাস্ত 'মঞ্জুর'; আর যদি না করে তো ধরে নিতে হবে 'না-মঞ্জুর'।

'মঞ্জুর' হলে কেল্লা ফতে। পাত্র তখুনি ছুটত মা-বাপের কাছে। মা-বাপ আবার ছুটত পাত্রীর আত্মীয়-স্বজনের কাছে। ব্যস! দু'চার-দিনের মধ্যেই বিয়ে ঠিক। পাত্র-পাত্রী চিরদিনের মতো মোরাঙ আর ট্যাবু ছাড়বার কথা ভাবত।

জীপ বাঁকের মুখে এসে গেছে এতক্ষণে; ডঃ আরাম তাড়া দিচ্ছেন,—কই! নামুন! সামনেই মোরাঙ্। চালু না হোক, ধ্বংসাবশেষ তো বটে।

নামলাম। ঘুটঘুটে আঁধারের মধ্যে ডুব-সাঁতার দিলাম যেন। ডঃ আরাম টর্চ জ্বাললেন। কিন্তু ওতে লাভ কিছু হল না; টর্চ-এর আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল বরং।

ধীরে ধীরে এগোলাম। অতি সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে। পাহাড়ীয়া ঝিঁঝির আর্তনাদ কানে এল। খানিকটা দূরে কী যেন খস্ খস্ শব্দ তুলে চলে গেল। অনেক দূর থেকে ভেসে এল কোন্ এক ঝরনার কলধ্বনি।

ডঃ আরাম খুব সতর্ক। আগে আগে চলেছেন। টর্চ-এর আলোয় পথ দেখাচ্ছেন সযত্নে।

পথ এবড়ো-খেবড়ো। জায়গায় জায়গায় বুনো লতাপাতায় আচ্ছন্ন। এইরকম পথে পর্বতারোহীরা 'জাঙ্গল্ বুট' ব্যবহার করেন। কিন্তু আমার পায়ে 'জাঙ্গল্ বুট' তো দূরের কথা, অতি সাধারণ 'বুট'ও নেই। যা আছে তা বাটার এক জোড়া পাম্প্। তাই কাঁটালতাকে

ঠিক বাগে আনা যাচ্ছে না। থেকে থেকে মালুম হচ্ছে ওদের অস্তিত্ব।

অবিশ্যি পথ সামান্য, তাই রক্ষে। মিনিট দুইও পেরোয় নি, মনে হল, মোরাঙের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। ডঃ আরাম কাঠের এক ভাঙাচোরা বেদীর ওপর টর্চ-এর আলো ফেলে বললেন,—দেখুন!—বসবার জায়গা। মোরাঙের ছেলে-ছোকরারা বসত।

দেখলাম। অস্পষ্ট আলোয় বসবার জায়গাটির দিকে তাকালাম ভালো করে। মনে হল, দেবদারু জাতীয় কোনো গাছের কাণ্ড দিয়ে এ তৈরী। কাণ্ডগুলোকে চেরা হয নি আর; বড় বড় টুকরো করে ফেলে রাখা হয়েছে।

—দেখছেন?—ডঃ আরাম শুরু করলেন আবার,—একসময় জমাট থাকত এ-জায়গা। মোরাঙের বাসিন্দারা বসে বসে গল্প করত। আর ওই যে, ওদিকেও দেখুন—

বলেই অন্য এক জায়গায় আলো ফেললেন ডঃ আরাম। ওখানে ছোটখাট মঞ্চ একটি। মঞ্চের ওপর বিরাট এক দামামা। ভাঙা, জীর্ণ।

দামামাটির কাছে গেলাম। মনে হল, পেল্লাই কোনো গাছের গুঁড়িকে ফাঁপা করে কোনোদিন এ তৈরী হয়েছিল।

কিন্তু কবে হয়েছিল? কতদিন আগে?—আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় ডঃ আরাম বললেন,—এই ড্রাম খুব কাজের। গ্রামে উৎসব হবে,—ড্রাম বাজাও। শত্রুরা আসছে, বাজাও। দরকার হলে সারা রাত ধরে বাজিয়ে জানিয়ে দাও, আমরা সজাগ। মোরাঙের ছেলেরা বর্শা আর 'দাউ' হাতে নিয়ে প্রস্তুত। কী জানেন, কাজ হ'ত এতে; শত্রুরা অনেক সময় ভয় পেত। রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছিয়ে যেত।

শুধালাম,—যা'রা যেত না?

ডঃ আরাম ভাঙা, প্রায়-বিধ্বস্ত মোরাঙের গায়ে টর্চ-এর আলো

ফেলতে ফেলতে বললেন,—তা'রা লড়াই করত। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ত সরাসরি। মোরাঙ্ দখল করবে বলে মরীয়া হয়ে উঠত এবং অনেক সময় দখল করতও। যেমন এটিকে করেছে। বিধ্বস্ত করে দিয়েছে একেবারে। সেই মোরাঙ্! জীর্ণ, পরিত্যক্ত। বিশ্বাস হয় না যেন। এমনকি আজও যে নাগাভূমিতে এ-জিনিস চালু আছে, তা যেন একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হয়। এদিকে ডঃ আরাম বিশ্বাস করাবেন বলে বদ্ধপরিকর। 'সার্চ লাইট'-এর মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মোরাঙের ওপর আলো ফেলছেন আর বলছেন,—দেখুন, কী অদ্ভুত ছাদ এর! মাটিকে ছুঁয়ে আছে যেন! দিব্যি উঠে গেছে পঁচিশ-তিরিশ ফুট অবধি। যেন ছাদ-সর্বস্ব বাড়ি! আর কিছু আছে কি নেই, বোঝা কঠিন।

বললাম,—আমার কাছে সবই কঠিন। যা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার!

ডঃ আরাম মোরাঙের অন্য দিকে টর্চ ফেললেন এবার। লতা-পাতায় জড়ান জীর্ণ-শীর্ণ একটা দেয়াল দেখিয়ে বললেন,—দেখুন, এই হল মোরাঙের সামনেটা, অর্ধ-বৃত্তেরও অর্ধেক যেন। এর দেয়াল খড়ে-ছাওয়া। দেয়ালের এক কোণে দেখুন, ছোট্ট একটা দরজা। বড় জোর ফুট চারেক উঁচু।

বললাম,—হ্যাঁ, দরজা গোছের কী যেন দেখছি বটে।

ডঃ আরাম বুঝিয়ে দিলেন,—দেখতেই হবে। ওই হল মোরাঙের একমাত্র প্রবেশ-পথ। ও দিয়েই ভেতরে যেত সব। ভেতরের অন্ধকার গা-সহা হতে একটু যা সময় নিত।

আৎকে উঠলাম;—সর্বনাশ। ডঃ আরাম এখনই আবার ভেতরে যেতে বলবেন না তো?

না, বললেন না। বাইরে দাঁড়িয়েই তার আভাস দিলেন,—কী জানেন, ভেতরে আসলে একটাই ঘর। তবে দু'টো ভাগ ওতে। এক ভাগে বাঁশের মাদুর বিছানো; ওখানে সব থাকত। অন্য ভাগটা ফাঁকা। অতিথি এলে ওখানে বসে গল্পগুজব হ'ত।

ওই অতিথি নিয়ে অনেক কথা আবার ; পরে শুনেছি। মেয়েদের আস্তানা ট্যাবুতে তো অতিথি মানেই ছিল পুরুষ-বন্ধু। ওরা যেত, গল্পগুজব করত। হাসিঠাট্টায় মশগুল হ'ত ট্যাবু। আবার কখনও বা কবিতা শোনা যেত ওদের—

যখন মেয়ে-বন্ধুর বাড়ি যাই আমরা
তখন খাবারদাবার নিয়ে ভাবি না।
মদ কতটুকু পেলুম—
মাথা ঘামাই না তা নিয়ে।
শুধু প্রেমের লোভে যাই আমরা—
হেঁটে যাই, হেঁটেই ফিরি।

তা ফিরুক। কিন্তু পদ্মপত্রে নীর তো আর সবাই নয়! মৌমাছিও নয় সব ক'জন! তাই পরিণতি এক এক সময় মর্মান্তিক হ'ত বৈকি!

ইংলঙ্ আর লীওয়াঙ্-এর কথা আজও নাগারা বলে।—ওরা প্রেমে পড়ল। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসল একে অপরকে। কিন্তু মিলনের পথ রুদ্ধ। আত্মীয়স্বজনের প্রবল আপত্তি, বিয়ে ওদের কিছুতেই হতে পারে না।

—পারে না? কিন্তু কেন?—নায়ক ইংলঙ্ আকাশ-পাতাল ভাবে। জঙ্-ধরা বর্শার ফলার মতো বিবর্ণ হয়ে ওঠে দিন দিন।

ওদিকে নায়িকা লীওয়াঙ্-এর চোখেও ঘুম নেই। নাগাভূমির পাতা-ঝরা গাছ যেন সে। নিজেকে ঝরিয়ে দিয়ে আবার মুকুলিত হবার প্রতীক্ষায়।

ওদিকে মুকুল আর ধরে না। বরং দু'জনেই দেখতে হয় ঝরা-পাতার মতো। শেষ-বিদায়ের ম্লান ছায়ায় করুণ, মুমূর্ষু।

ওরা দু'জনে গ্রামের পথে পাশাপাশি দু'টি চিতা জ্বালে ; এবং তারপর সেই চিতায় আত্মাহুতি দেয়। আগুন ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। এর ধোঁয়া ওর সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যায়।...

এ-মিলন চিরকালের। আর কোনোদিন ওরা আলাদা হবে না,
—নাগাদের বিশ্বাস।

আজও ইংলঙ্ আর লীওয়াঙ্‌কে নিয়ে কত কী বলে নাগারা! কতবার করে কাহিনীটা শুনিয়ে দেয়—

ইংলঙ্ আর লীওয়াঙ্
প্রেমে পড়ল—
গাঢ় গভীর প্রেমে।
এবং তারপর একদিন—
ওউ-বয়ু গাছের পাতার মতো ঝরল।
ওউ-বয়ুর লাল পাতা যেমন
ঝরে গিয়ে ওরাও তেমন
দেখতে হল।

কী যে জ্বলন্ত ছিল ওদের প্রেম,
বাসনা ওদের কী যে দুরন্ত ছিল!
কিন্তু তবু ওরা কি পারল বাঁচতে?
বাধাগুলো ঠেকাতে পারল?
শেষ-বিদায়ের আগে—
গ্রামের পথে আগুন
ওরাই কি জ্বালল না?

লোকে বলে,—হ্যাঁ, ওরাই;
গ্রামের পথে দু'টি চিতা
ওরাই জ্বালল।
এবং তারপর—
আগুন উঠল আকাশে

ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল—
অগ্নিকুণ্ড এক হল দেখতে দেখতে
এর ধোঁয়া ওর সঙ্গে মিলল।

এ-মিলন চিরকালের—
কারণ, আর তো ওরা আলাদা হবে না!
হাজার বাধা বারবার এলেও
ওরা আর আলাদা হবে না।

ওদিকে আমরা তখন আলাদা। ডঃ আরাম একদিকে, আর আমরা মোরাঙের অন্যদিকে। টর্চটা কী করে যেন বিগড়ে গেছে।

সেদিন অনেক কষ্টে পথ খুঁজে পেলাম আবার। ভাঙা জাহাজের সন্ধানে ডুবুরি যেমন, আঁধার-সমুদ্রের বুক চিরে আমরাও তেমনি জীপ-এর দিকে এগোলাম।

নকলো আমাদের কাণ্ডকীর্তি দেখে থ। এতক্ষণ জীপ্-এ অপেক্ষা করছিল। এগোচ্ছি বুঝতে পেরে সে-ও এগোল খানিকটা। আমাদের সাহায্য করল।

আবার ছুটলাম। জীপ্-এর 'হেড্ লাইট্' জ্বলল আবার। চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

একটু আগেই একটানা আঁধার গা-সহা হয়ে উঠেছিল দিব্যি। এখন হঠাৎ-আলোর স্পর্শ কেমন যেন অস্বস্তিকর ঠেকল। মনে হতে লাগল, বেশ তো ছিলাম! আদিম-উদ্দাম নাগাভূমিকে অন্তর দিয়ে অনুভব করছিলাম যেন। রাত্রির কালিমা যেন সেদিনের সেই হারিয়ে-যাওয়া নাগা-পাহাড়কে ধারণ করে ছিল। একটু অপেক্ষা করলেই কালিমার খোলসটা খসে পড়ত। *রাত্রির গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে রহস্যময় মূক অতীত ধীরে ধীরে কথা কইত।

কিন্তু না, সব যেন কুহেলিকা। আলোর দৌলতে আঁধার আরও

গাঢ় হল যেন। দেখতে দেখতে তরল থেকে কঠিন হয়ে উঠে অতীত-বর্তমানের সীমারেখায় আকাশ-উঁচু এক প্রাচীর গড়ে তুলল।

—সাহাব!—নকলোর প্রশ্ন শুনে চমক ভাঙে।

—সাহাব! আভি তো কোহিমা যানা?—ডঃ আরামকে শুধায় সে।

আরাম নির্দেশ দেন—হ্যাঁ, কোহিমা।

পরদিন। সকালে। চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আবার। দশটা নাগাদ কোহিমা 'নাগা ইনস্টিট্যুট অব্ কাল্চার' দেখতে গেলাম।

ইনস্টিট্যুট তখনও ঠিক গড়ে ওঠে নি; উঠছে। মিউজিয়াম গড়ার কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। ওখানে বিভিন্ন নাগা উপজাতির মডেল থাকবে। আর থাকবে নাগা পোশাক-আশাক, অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘরবাড়ির নিদর্শন।

ইনস্টিট্যুট্-এর কর্মকর্তাদের অন্যতম 'রিসার্চ অফিসার' পরিমল ভট্টাচার্য, নিজে সঙ্গে করে নিয়ে সব দেখালেন। যত্ন করে বুঝিযে দিলেন সব কিছু। মনে হল, মিউজিয়ামটি অসম্পূর্ণ, কিন্তু তা'তে কী? পরিমলবাবুর বর্ণনার গুণে পূর্ণতার স্বাদ পাচ্ছি।

ঘটনাটি খুলেই বলি। 'নাগা ইনস্টিট্যুট্ অব্ কাল্চার' দেখতে গিয়ে পরিমলবাবুর সঙ্গে পরিচয়। দোতলার অফিস-ঘরে বসে কী যেন লিখছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে লেখা বন্ধ করলেন। পরিচয় হতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন একেবারে।

এদিকে আমাদের অবস্থাও তথৈবচ। পরিমলবাবুকে দেখে উচ্ছ্বসিত আমরাও।—

ভদ্রলোক নামেই যেন অফিস-ঘরে বসে লিখছিলেন; আসলে ওঁর মন পড়ে ছিল অন্য কোনো জগতে। একগাদা পুঁথি-পত্তরের মাঝখানে যেন সমাধিস্থ ছিলেন উনি। আমাদের সাড়া পেয়ে হঠাৎ জেগে উঠলেন।

ওঁর সম্পর্কে আগেও অনেক শুনেছি। নাগা-ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করছেন। নাগাভূমির লোকসাহিত্য এবং উপভাষা সম্পর্কেও ওঁর অবদান বিরাট।

—নতুন কিছু পেলেন?—একবার শুধিয়েছিলাম ওঁকে।

—সবই তো নূতন,—উনি জবাব দিয়েছিলেন,—নাগা উপভাষা ও লোকসাহিত্য নিয়ে কাজ কতটুকু আর হয়েছে, বলুন?

বললাম,—কিছু হয়েছে বৈকি। স্যার গ্রীয়ারসন্ তাঁর 'লিংগুইস্টিক সারভে অব্ ইণ্ডিয়া'য় নাগা উপভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পরিমলবাবু বললেন,—কিন্তু সে আলোচনা প্রাথমিক; সব রকম নাগা-উপভাষার কথা ওখানে নেই। আসলে উপভাষা নিয়ে আলোচনার পথিকৃৎ আমেরিকার কিছু মিশনারী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নাগা-পাহাড়ে আসেন ওঁরা। কতকগুলো নাগা-উপভাষাকে রোমান হরফে লিপিবদ্ধ করেন।

শুধালাম,—রোমান-হরফে কেন? নাগা-ভাষায় নিজস্ব কোনো হরফ ছিল না?

পরিমলবাবু বললেন,—না, ছিল না। আর তাছাড়া নাগা-পাহাড়ে ভাষার বৈচিত্র্যও তো বড় কম নয়। চৌদ্দটি প্রধান উপজাতি নিয়ে নাগা-সমাজ; কিন্তু ভাষার সংখ্যা উপজাতির প্রায় দ্বিগুণ। এক উপজাতি অন্যের ভাষা আবার বোঝে না। আর শুধু কি তাই! এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের উপভাষা আলাদা। এবং এমন কি অনেক সময় একই গ্রামে তিন চার রকমের উপভাষা। শুধালাম,—তা কী করে সম্ভব? এক গ্রামের উপভাষা আলাদা হয় কী করে?

পরিমলবাবু বললেন,—হতে পারে। 'খেল'-এর অধিবাসীরা আলাদা হয় যদি।

শুধালাম,—'খেল'? মানে?

পরিমলবাবু বুঝিয়ে দিলেন,—নাগা মহল্লা বা পাড়া। কী

জানেন, একই গ্রামে তিন-চার এবং এমনকি পাঁচ-সাতটি পর্যন্ত 'খেল' থাকতে পারে। এই 'খেল' দিয়েই নাগাদের বংশ-পরিচয়। কা'র পূর্বপুরুষ কে ছিল, তা এ থেকে ধরা যাবে। কেননা, পূর্বপুরুষ যদি আলাদা হয়, তবে 'খেল'ও আলাদা হতে বাধ্য।

প্রশ্ন করলাম,—এই 'খেল'-প্রথা এখনও চালু ?

পরিমলবাবু জবাব দিলেন,—পুরোপুরি না হোক, কিছুটা নিশ্চয়ই। আগে তো 'খেল' নিয়ে মারামারি কাটাকাটি লেগেই ছিল। আজকাল ওসব নেই। কিন্তু ভাষার পার্থক্যটা থেকে গেছে।

শুধালাম,—ভাষার পার্থক্য মানে, একই গ্রামে নানারকম উপভাষা ?

পরিমলবাবু বললেন,—হ্যাঁ, ঠিক তাই। উদাহরণ হিসেবে নাগা-পাহাড়ের সবচেয়ে বড় গ্রাম কোহিমার কথা ধরুন। মোট চারটি 'খেল' আছে ওখানে; কিন্তু এক 'খেল'-এর অনেক শব্দই অন্যটির থেকে আলাদা। 'সবুজ' বোঝাতে লিসেমা-খেল-এর ওরা বলে 'পেড্জো'; কিন্তু অন্য 'খেল'-এ আবার একই অর্থে 'মেক্জো' বলা হয়।

পরিমলবাবুর ব্যাখ্যা শুনে কৌতূহল বেড়ে গেল। জানতে চাইলাম,—আচ্ছা, ভাষার এই রকমফের কি নাগাদের প্রকৃতির জন্যে? ওরা রক্ষণশীল ছিল, বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে রাখত নিজেদের, সেজন্যে ?

পরিমলবাবু সায় দিলেন,—হ্যাঁ, সেজন্যেই বোধ করি।

—তবে কী জানেন ?—একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে আবার শুরু করলেন তিনি,—সব জিনিসেরই দু'টো দিক আছে। এরও আছে।

শুধালাম,—কী রকম ?

পরিমলবাবু বুঝিয়ে দিলেন,—নাগারা বিচ্ছিন্ন ছিল। ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে। আবার তারই ফলে প্রতিবেশী

অনেক শক্তিশালী ভাষা নাগাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। যুগ যুগ ধরে নাগা-ভাষা অক্ষত ও অপরিবর্তিত থেকেছে।

বললাম,—অক্ষত কিন্তু নাগা-সংস্কৃতিও। উপভাষা অতরকম, উপজাতি অত গণ্ডা, কিন্তু সংস্কৃতি ওদের একটাই। আদ্যিকাল থেকে সবাই ওরা 'নাগা' নামে পরিচিত।

পরিমলবাবু বললেন,—ঠিক। ঠিক ধরেছেন। জাতি হিসেবে আজও ওরা এক ও অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু এর কারণ কী জানেন? আচার-আচরণে অদ্ভুত কতকগুলো মিল ওদের মধ্যে বরাবরই ছিল। যেমন ধরুন, 'হেড্-হান্টিং'; নাগা তা সে আঙ্গামীই হোক, অথবা হোক সেমা বা রেঙ্গ্‌মা—'হেড্-হান্টিং' করতই। এছাড়া, অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের জন্যে সব গ্রামেই আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। ছেলেরা এক জায়গায়, মেয়েরা অন্যত্র বাস করবে। বাঁশের শলাকা ফুঁড়ে গায়ের ওপর আঁকিবুকি এবং পাহাড়ের চূড়ায় গ্রাম সকলের বেলায়ই। তবে, এ সব কিছুর চেয়েও বড় কথা, খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাক-আশাকের মিল। খাওয়ার কথা ধরুন। আজও নাগা-মুল্লুকে এ নিয়ে খুব একটা বাছ-বিচার নেই। সাপ-খোপ থেকে শুরু করে কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত প্রায় সবই কোনো-না-কোনো নাগা খায়। যদিও কুকুর-খাওয়ার কায়দাটা একটু অদ্ভুত।

শুধালাম—কী রকম?

—শুনবেন? গা রী-রী করলে দোষ দেবেন না তো?—বলেই পরিমলবাবু শুরু করলেন আবার,—বেশ, শুনুন তবে। নাগা-পাহাড়ের দুর্গম কিছু গ্রামে আজও এ-জিনিস দেখা যায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি। একবার। লোকসাহিত্যের উপাদান-সংগ্রহ করব বলে লোহটা-নাগাদের গ্রামে চলেছি। দেখি, পথের ধারে তিন-চারজন নাগা যুবক। একটা কুকুরকে ঘিরে কী যেন করছে। এগিয়ে গেলাম। কুকুরটার একেবারে সামনে। মনে হল, খাওয়ানো হচ্ছে তাকে। বিরাট এক থালা ভর্তি ভাত দিব্যি নিশ্চিন্তে সে

খাচ্ছে। কিন্তু ভাতের পাশেই ও কী? 'দাউ' হাতে নিয়ে এক নাগা যুবক অমন কটমট করে তাকাচ্ছে কেন? উপস্থিত দর্শকদের প্রশ্ন করতেই সমস্ত ব্যাপারটা জানা গেল। আমার দোভাষী সঙ্গীটি বুঝিয়ে দিল সব কিছু। শুনলাম, এই যে কুকুরটি, এত যত্ন করে যা'কে খাওয়ানো হচ্ছে, গত তিন দিন ধরে সে উপোস। খাওয়া শেষ হলেই তা'কে বধ করা হবে। এদিকে হামেশা নাকি হয় এমন। নাগারা যে কুকুরকে বধ করবে, দু'-তিনদিন তাকে উপোস রাখে। তারপর কুকুরের যখন প্রচণ্ড খিধে পায় তখন তার সামনে ভাত এগিয়ে দেয়। ক্ষুধার্ত জীব; সঙ্গে সঙ্গেই খেতে শুরু করে। তার খাওয়া শেষ হবে যেমন, ভবলীলাও তেমনি সাঙ্গ হবে। মুহূর্তের মধ্যে 'দাউ' দিয়ে আঘাত করা হবে তাকে। এইবার নিহত পশুকে কেটে এবং ঝলসে নিয়ে পেট থেকে ঐ ভাতগুলো বের করার পালা। খুব নাকি উপাদেয় জিনিস সেটা; সেই ভাতের সঙ্গে কুকুরের ঝলসানো মাংস।···শিউরে উঠলাম শুনে। পথে আর দাঁড়াবার ভরসা পেলাম না। দোভাষীকে নিয়ে ছুটলাম বলতে গেলে।

এই অবধি বলে পরিমলবাবু থামলেন একটু। একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে যেন হাঁপাতে লাগলেন।

শুধালাম,—তারপর?

পরিমলবাবু বললেন,—হ্যাঁ, তার পরের ঘটনাই আসল। কাজ সেরে কোহিমায় ফিরে এলাম। নতুন অভিজ্ঞতার কথা সহকর্মী মিঃ এম্. আওকে বললাম।···সহকর্মী তো হেসেই অস্থির। বললেন, এ আবার নতুন কথা কি! আও-নাগাদের মধ্যেও এ চাল্।

—তাই বলছিলাম,—পরিমলবাবু আবার থামলেন এক মুহূর্ত। আবার পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরে এলেন,—কী জানেন, নাগাদের জাতীয় ঐক্যের পেছনে এই খাওয়া-দাওয়ার মিলটাও বড় কম কথা নয়।

বললাম,—হ্যাঁ, তা তো বটেই। আর শুধু নাগা কেন, বহু জাতির বেলায়ই এ কথা খাটে।

—বহু কিছু জানি নে মশাই। আপাততঃ নাগা-সংস্কৃতি নিয়ে পড়ে আছি।—বলতে বলতে দোতলার অফিস-ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি-পথ ধরলেন পরিমলবাবু। আমাদের নিয়ে একতলার গ্রন্থাগারে ঢুকলেন।

গ্রন্থাগারটি ছোট, কিন্তু সুসজ্জিত। নাগাভূমি নিয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সেখানে আছে।

হাটন-এর 'আঙ্গামী নাগাস্' এবং 'সেমা নাগাস্' থেকে শুরু করে এম্ অ্যালেম্‌ছিবার 'দি আর্টস্ অ্যাণ্ড ক্র্যাফট্‌স্ অব্ নাগাল্যাণ্ড' পর্যন্ত।

শেষোক্ত বইটি পরিমলবাবু যত্ন করে দেখালেন। বললেন,—দেখুন, এ-বইটি ইনস্টিটিউট্-এর উদ্যোগে সম্প্রতি বেরিয়েছে।

—আর, এই যে দেখুন,—বলেই পরিমলবাবু 'এ ব্রীফ হিস্টোরিক্যাল একাউন্ট্ অব্ নাগাল্যাণ্ড' নামে একটি বই আমার হাতে দিয়ে বললেন,—এটিও ইনস্টিটিউট্-এর প্রকাশন।

বইটি হাতে নিয়ে উসখুস করছি। ভাবছি, কিনব কি কিনব না, এমন সময় পরিমলবাবু দুম করে বলে বসলেন,—কী? ভাবছেন কী অত? নিয়ে নিন।

শুধালাম,—দাম?

পরিমলবাবু মৃদু হেসে বললেন,—দিতে হবে না। ও আপনাকে উপহার দিলুম।

—উপহার?—আমি অবাক একটু,—হঠাৎ?

পরিমলবাবু বললেন,—তা কেন! নাগাভূমি সম্পর্কে এত কৌতূহল আপনার। আর নাগা ইনস্টিটিউট্ একটা বই দিতে পারে না?

বই নিয়ে এগোলাম শেষ অবধি। পাশের ভবনটি মিউজিয়াম। ওতে ঢুকলাম।

মিউজিয়াম তখনও অসম্পূর্ণ। দেয়ালের গা-ঘেঁষে ছোট কুঠরী

তৈরীর কাজ চলছে। ওখানে বিভিন্ন নাগা উপজাতির 'মডেল' থাকবে। মাটি-পাথর আর কাঠ-খড়ে নাগা-জীবন প্রতিবিম্বিত হবে। দু'একটি কুঠুরীর কাজ শেষ। নাগা-জীবন সেখানে প্রমূর্ত।

একটিতে দেখলাম, আঙ্গামী-নাগা ; যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত। অদ্ভুত ঝলমলে তার সাজপোশাক। দেখলেই চোখ ধাঁধায়।

পরিমলবাবুকে বললাম,—জীবন্ত মনে হচ্ছে।

হেসে আকুল পরিমলবাবু। বললেন,—কিন্তু আসল জীবন এখানে কোথায় ? যুদ্ধ-যাত্রার আগে আঙ্গামী-নাগা যখন বুক-কাঁপানো চীৎকার করত, যখন অন্য যুদ্ধযাত্রীরাও যোগ দিত তার সঙ্গে, যখন পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'ত সেই চীৎকার, তখন নাগা-জীবনের আদিম-উদ্দাম যে দিকটি উদ্ভাসিত হ'ত, তা কোথায় এখানে ?

মনে হল, অদ্ভুত! আশ্চর্য এই বর্ণনা! হোক মিউজিয়ামটি অসম্পূর্ণ ; পরিমলবাবুর দৌলতে পূর্ণতার স্বাদ পাচ্ছি।

এমনই হয়,—আজ ভাবি। হৃদয়ের স্পর্শে অপূর্ণ পূর্ণ হয়ে ওঠে ; সামান্য হয়ে ওঠে অসামান্য।

তা না হলে, মিস মহান্তি, সামান্য নারী ভেবেছিলাম যাঁকে, হঠাৎ তাঁর মধ্যে অসামান্যকে খুঁজে পাব কেন !

ঘটনাগুলো খুলেই বলি ; সামান্যর ফিরিস্তিটা আগে দিয়ে।—

মিস মহান্তির কথা এরই মধ্যে খানিকটা বলেছি। নিজের শক্তি সম্পর্কে তাঁর অটুট বিশ্বাস, তাঁর যাযাবর জীবন এবং সর্বোপরি তুচ্ছ কারণে আদ্দুর সঙ্গে তাঁর মন-কষাকষি দেখে অবাক হয়েছিলাম প্রথমটায়। কিন্তু সেদিন বিরক্ত হলাম।

সাত-সকালে সদলবলে বেরিয়েছি। পায়ে হেঁটে ঘুরছি কোহিমা। ক্যান্টনমেণ্ট এলাকা পেরিয়ে 'ওয়ার সিমেট্রি'র কাছাকাছি এসেছি। হঠাৎ মিস মহান্তির কথা উঠল।

আমি রসিকতা করে বললাম,—ভদ্র
নি তো? হঠাৎ-আবির্ভাবে চমকে দেবেন ন·হ্ হল আমার।

গোপালবাবু সায় দিলেন,—কিছুই বলা যা॰গু৷ হবার আগে দপ্ ইচ্ছে ছিল।

আদ্দু বললে,—ইচ্ছে ওঁর কিসে নেই, ব -হ্যাঁ, ঠিক তাই। আগ্‌হোকির গ্রামে যাবার ইচ্ছেও ওঁর ছিল। নে॰ একেবা॰র। আমরা 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড'দের ক্যাম্প দেখতে গেলাম, তাই র॰

বললাম,—'নাগা ইন্‌স্টিট্যুট্ অব্ কাল্‌চার' দেখতে গেয়েছিলেন উনি।

আদ্দু বললে,—ইন্‌স্টিট্যুট এরই মধ্যে বার তিনেক উনি দেখেছেন। আবার হয়তো দেখতেন, যদি না সেদিনই আমরা গীর্জায় যেতাম।

গীর্জার কথা উঠতেই গোপালবাবু বিরক্ত একটু,—ওফ্! বড্ড বেশি কথা বলেন ভদ্রমহিলা!

অঞ্জলি বললে,—তবু; ওঁকে সঙ্গে আনলে কী আর এমন ক্ষতি হ'ত!

—ক্ষতি!—আদ্দু আকাশ থেকে পড়ে যেন,—তা অনেক হ'ত। ভোরের এই হাড়-কন্‌কনে ঠাণ্ডায় বুড়ী জমে যেত।

বললাম,—হ্যাঁ, তা বটে।

বলতে বলতেই দেখি, মিস মহান্তি। আমাদের থেকে খানিকটা দূরে। সামান্য একটা চাদর গায়ে দিব্যি এগোচ্ছেন।

আঁৎকে উঠলাম দেখে। বিরক্তও হলাম।

গোপালবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—দ্যাখ, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল।

সুধীরবাবু ফোড়ন কাটলেন,—সারছে রে, কাম সারছে!

এতক্ষণে মিস মহান্তি এগিয়ে এসেছেন আরও খানিকটা। আমাদের মুখোমুখি হয়েছেন প্রায়। আদ্দু মিস মহান্তির দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললে,—কাজটা ঠিক করেন নি। এই ঠাণ্ডায় এতটা চড়াই পথ আসা ঠিক হয় নি।

তৈরীর কাজ চলছে। ওখানে?—মিস মহান্তি তেলে-বেগুনে জ্বলে থাকবে। মাটি-পাথর আর খুশিমত এসেছি। খুশিমতই এগোব। দু'একটি কুঠুরীর কাজ শেষ নাকি?

একটিতে দেখলা ঠিক পরোয়ার কথা নয়। আদ্দু আপনারই ঝলমলে তার সাজলেছে।

পরিমলবাবুআর বলতে হবে না।—বলেই গট্ গট্ করে মিস মহান্তি এগোলেন। আমাদের পেছনে ফেলে সোজা চললেন 'সিমেট্রি'র দিকে।

অগত্যা আমরাও হন্তদন্ত হয়ে অনুসরণ করলাম তাঁকে। 'সিমেট্রি'র পথ ধরলাম। কিন্তু মিস মহান্তি কোথায়? 'সিমেট্রি'তে গিয়ে দেখি, তিনি বেপাত্তা। ঠিক কোহিমার মতোই সারি সারি সমাধিগুলো খাঁ-খাঁ করছে। চারিদিক স্তব্ধ, নিঝুম।

ফিরে আসছি; হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠলেন মিস মহান্তি। কোত্থেকে বেরিয়ে এসে হন্ হন্ করে এগোলেন আবার।

আদ্দু শুধাল,—কোথায় চললেন? আমাদের পেছনে ফেলে?

মিস মহান্তি জবাব দিলেন,—যেখানে খুশি। কাউকে পরোয়া করি নাকি?

বিরক্ত হলাম। বুড়ীকে নিয়ে ফ্যাসাদ ঘনিয়ে উঠছে, মনে হল।

আদ্দু বললে,—ছেড়ে দিন। খুশিমত চলতে দিন ওঁকে। খানিক বাদেই ঠাণ্ডা হবেন।

কিন্তু কোথায় ঠাণ্ডা? পথ বাচাব বলে কোহিমার খেলার মাঠ ধরে চলছি, কংক্রীটের হাড়-জিরজিরে গ্যালারী আর টেকো মাঠ দেখে বিচলিত হচ্ছি থেকে থেকে, এমন সময় মিস মহান্তির নাটকীয় আবির্ভাব আবার—

—কাউকে পরোয়া করি নাকি?—বলেই তিনি হন্ হন্ করে এগোলেন। ঠাণ্ডার বদলে এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে দিলেন যেন।

আমরা ব্যাপার-স্যাপার দেখে থ।

ভদ্রমহিলা লুকোচুরি খেলছেন ?—সন্দেহ হল আমার।

আদ্দু বললে,—এ কিন্তু সন্ধির লক্ষণ। ঠাণ্ডা হবার আগে দপ্ করে জ্বলে-ওঠা।

সেদিন 'পীস-সেন্টারে' ফিরে গিয়ে মনে হল,—হ্যাঁ, ঠিক তাই। কয়েক মিনিটের মধ্যে মিস মহান্তি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ একেবারে। ডঃ আরামের কাছে সানন্দে প্রাতভ্রমণের বর্ণনা দিচ্ছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন,—এই যে! এঁরাও ছিল আমার সঙ্গে। কী সুন্দর বেড়ানো হল।

—সুন্দর ?—মিস মহান্তির কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। ভেবে পেলাম না, আসলে কী চান ভদ্রমহিলা ? কী ভাবেন ?

সেদিনই দুপুরে মিস মহান্তিকে ধরে বসলাম। একা পেতেই লজ্জার মাথা খেয়ে শুধালাম,—কী ব্যাপার বলুন তো ? সকালে পিছু নিয়েছিলেন কেন ?

মিস মহান্তি আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন প্রথমে। ম্লান হেসে জবাব দিলেন,—কেন আবার। 'সেন্ট পারসেন্ট ফিট্', তা প্রমাণ করব বলে।

বললাম,—অস্বীকার করব না, নিজের 'ফিট্‌নেস' সম্পর্কে আস্থা আপনার বরাবরই আছে। কিন্তু ওটাই সব নয়।

—সব নয় ? তাহলে কী ?—মিস মহান্তি রহস্যময়ী এবার। উল্টে আমারই কাছে যেন কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

আমিও নাছোড়বান্দা। জবাব না পেয়ে কিছুতেই ছাড়ব না। শুধালাম,—কী তা আপনিই ভালো জানেন।

—জানি ?—মিস মহান্তি নামক রুদ্ধ ঝরনার মুখ থেকে পাথরটা হঠাৎ খসে পড়ল যেন। গড় গড় করে বলে গেলেন,—গত কয়েক দিন ধরে আদ্দুর খুব বিপদ। গ্যারেজ-এ এক কর্মীর সঙ্গে মন

কথাকথি হয় ওর। কর্মী ভীষণভাবে ওকে শাসায়। সেই থেকে আদ্দুর সঙ্গে সঙ্গে থাকি। একা ছাড়তে আদৌ ভরসা পাই না।

অবাক হলাম। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকালাম মিস মহান্তির দিকে।

উনি তখনও থামেন নি; বলে চলেছেন,—জানেন, ওরই জন্মে আপাততঃ আমি আটক। মেঘালয়ের 'প্রোগ্রাম' ক্যান্‌সেল্ করে কোহিমাতেই পড়ে আছি।

শুধালাম,—কতদিন থাকবেন আরও ?

মিস মহান্তি অদ্ভুত জবাব দিলেন,—ঠিক নেই। কোনো কিছুই ঠিক নেই আমার। মন ঠিক করে ঘর বাঁধতে পারি নি। আবার মনকে উদাসী করে মিশনারীও হতে পারি নি। একূল-ওকূল দু'কূলই হাতছাড়া। দিনক্ষণের হিসেব কখন করব ?

মিস মহান্তি ধীরে ধীরে উঠলেন। পায়চারি শুরু করলেন 'পীস-সেণ্টার'-এর 'লন'-এ। আমি মুহূর্তের মধ্যে অন্য এক মিস মহান্তিকে আবিষ্কার করলাম যেন।

সেদিনই বিকেলে। ভদ্রমহিলা অন্য মানুষ আবার। কোহিমা 'ইভনিং কলেজে' যাওয়া নিয়ে আবার সেইরকম বচসা। আদ্দু যাচ্ছে, অতএব তিনিও যাবেন্।

গেলেন। তবে কলেজে গিয়ে চুপচাপ। যেন কথা বলতে ভুলে গেছেন।

অবিশ্যি সুযোগও ছিল না। কলেজের তরুণ অধ্যক্ষ ডঃ হোরাম ও তাঁর তন্বী স্ত্রী মিসেস আশা হোরাম কথাবার্তায় তুখোড়। আগাগোড়া নিজেরাই জমিয়ে রাখলেন। এবং বিশেষ করে আশা হোরাম তো গল্পের ফুলঝুরি ছোটালেন।

আশা ঐ কলেজেরই অধ্যাপিকা। বাঙালী। নাগা ডঃ হোরামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা শুনে প্রথমটায় অবাকই হয়েছিলাম। এবং এছাড়া, কলেজটিকে দেখেও কম অবাক হই নি।

কলেজ তো নয়, যেন গৃহস্থ-বাড়ি। বড় গোছের কোনো মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র যৌথ-পরিবারের আড্ডা। কোনোরকমে গোটাকতক ঘর দাঁড় করিয়ে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা।

ঘরগুলো ছোট ছোট। প্লাস্টার উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। জীর্ণ জানালা-দরজাগুলো গৃহকর্তার অসঙ্গতি এবং অমনোযোগের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

যখন পৌঁছুলাম, পুরোদমে কলেজ চলছে তখন। দরিদ্র গৃহস্থ-বাড়ি যেন ঘুমুচ্ছে। গ্রামঘরে গভীর রাতে বহুদূর থেকে ভেসে-আসা প্রহরীর চীৎকারের মতো অধ্যাপকদের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো সাড়াশব্দ মিলছে না।

হোরামরাই অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। আদ্দু পরিচয় করিয়ে দিতেই যত্ন করে নিয়ে বসালেন। গল্প উঠল। কলেজের হালচাল নিয়ে প্রথমে। তারপর নাগাভূমি নিয়ে।

কলেজের কথা উঠতেই ডঃ হোরাম ছাত্রদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ,—না না, এখানে কোনো স্টুডেন্ট ইন্‌ডিসিপ্লিন নেই। ছাত্ররা সবাই পড়তে আসে, পড়তে চায়।

শুধালাম,—পড়াশুনা সম্পর্কে নাগাদের 'অ্যাটিচিউড'?

ডঃ হোরাম হাসলেন একটু। এক টুক্‌রো চক লুফতে লুফতে বললেন,—খুব ভালো। আগে পড়াশুনোকে নাগারা ভয় করত। এখন পড়তে না পেলে ভয়ে মরে।

মিসেস হোরাম বললেন,—না না, এ তোমার বাড়াবাড়ি। আসলে সত্যি কি তাই?...কত নাগা আছে যা'রা এখনও স্কুল-কলেজের নামই শোনে নি। পড়াশুনা কী জিনিস, তা'ই জানে না।

ডঃ হোরাম বললেন,—তা বটে। তবে এ থেকে কিন্তু 'অ্যাটিচিউড' প্রমাণিত হল না। 'অ্যাটিচিউড' বলতে বুঝি, যা'রা সুযোগ পাচ্ছে, শিক্ষাকে কীভাবে গ্রহণ করছে তা'রা।

মিসেস হোরাম বললেন,—ছাখ, 'সুযোগ' একটা 'ভেগ' কথা।

আপনা থেকে এ আসে না। একে আনবার জন্যে উদ্যোগী হতে হয়।

পরিষ্কার বাংলায় কথাবার্তা বলছিলেন ওঁরা। বিতর্ক ক্রমেই দাম্পত্য-কলহের দিকে এগোচ্ছিল। এমন সময় ছন্দপতন ঘটালেন গোপালবাবু। হঠাৎ ভিন্ন এক প্রসঙ্গ তুলে ডঃ হোরামকে বেকায়দায় ফেললেন,—ওসব থাক। বরং আজকের নাগাভূমির কথা বলুন। অবস্থা কী রকম এখন?

ডঃ হোরাম ইংরেজীতে জবাব দিলেন,—অ্যাবনরম্যালি নরম্যাল।

—মানে?—জবাব শুনে আমি অবাক একটু। মুখ থেকে ফস্ করে বেরিয়ে এলো প্রশ্নটা।

ডঃ হোরাম কী যেন জবাব দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটলেন।

মিসেস হোরামকে শুধালাম,—ব্যাপার কী? ক্লাশ আছে?

—না, নেই।—জবাব এলো অপর দিক থেকে। বিদ্যুৎ-চমকের মতো এক ঝলক হাসির সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত হল যেন,—উনি গেলেন নজর রাখতে। ছেলেরা যাতে না পালায়, দেখতে।

বললাম,—এখানেও তাহলে সমস্যা আছে? সবাই তাহলে পড়তে আসে না?

মিসেস হোরামের চোখে-মুখে বিদ্যুৎ-চমক আবার। সোজা স্পষ্ট জবাব আসে—ক্ষেপেছেন? না কি ওঁর কথায় ভুলছেন? বাড়িয়ে বলা ওঁর স্বভাব; তিলকে তাল করে আনন্দ। নাগাদের ভুলত্রুটি ঢাকতে এমনকি মিথ্যেরও আশ্রয় নেন উনি।

বললাম,—তাই নাকি?

মিসেস হোরাম শুরু করলেন,—নয় আবার! একদিন, বাবার সঙ্গে এক নাগা-গ্রামে যাচ্ছি। বাবা ধর্মযাজক ছিলেন; তাই হামেশা যেতে হ'ত এরকম।' শিক্ষা সেবা ধর্মপ্রচার– নানা কাজে

যেতে হ'ত। সেদিন যাচ্ছিলাম সেবার কাজে। কয়েকটি গ্রামে প্লেগ শুরু হয়েছে; তাই টিকে দিতে। কিন্তু যাবার পথে বিভ্রাট। গ্রামে ঢুকতে যাব; দেখি পথ একরকম বন্ধ। নানা জাতের গাছ লাগান তার জায়গায় জায়গায়।...'ব্যাপার কী'?—স্থানীয় একজনকে প্রশ্ন করতেই সে বললে,—ওহো! জানো না বুঝি! কী এক শয়তান এসেছে এদিকে! গ্রামে ঢুকে মানুষ খুন করছে! তবে হ্যা, আমরা খুব সেয়ানা। শয়তানকে জব্দ করেছি। গ্রামের পথ আটকে দিয়েছি দিব্যি। যাতে না সে ঢুকবার পথ পায়।...বুঝলাম, শয়তান মানে প্লেগ। আর ভাবলাম,—কী সবনাশ! কোথায় আছে এরা? কোন্ অন্ধকারে?...ঘটনাটা হোরামকে বলেছিলাম একদিন। হ্যাঁ, তখনও বিয়ে হয় নি আমাদের; আর উনিও তখন অধ্যক্ষ হন নি। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'থিসিস্' করছিলেন।...তা, সব শুনে উনি কী করলেন জানেন? হো হো করে হেসে উঠলেন প্রথমে। যেন সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তে উড়িয়ে দিলেন। তারপর আমি চেপে ধরতেই এক কথা বার বার,—না না, ওসব কিছু নয়। ওরা পথ আটকেছিল অন্য কারণে। যাতে তোমাদের মতো বাইরের লোকেরা গ্রামে গিয়ে ঝামেলা না-পাকায়, সেজন্যে।

বললাম,—হ্যা, অনেকটা এ ধরনের অভিজ্ঞতা ক্যাপ্টেন বাটলারেরও হয়েছিল বটে। তবে সেটা প্রায় একশো বছর আগে, উনিশ শতকের শেষ দিকে। আর সেবারের রোগ ছিল বসন্ত, প্লেগ নয়।

মিসেস হোরাম বললেন,—দেখুন, প্লেগ বা বসন্তের চেয়েও বড় রোগ কুসংস্কার। লেফ্টেন্যান্ট্ ভিন্সেন্ট এ নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন।...একবার, নাইন্টিন্থ্ সেঞ্চুরীর মাঝামাঝি। কাছাড় থেকে তিন-তিনটি ছেলেমেয়ে নিরুদ্দেশ। আঙ্গামী-নাগারা ধরে নিয়ে গেছে। অনেক চেষ্টায় ছেলেদের একজনের খোঁজ মিলল। কিন্তু মেয়েটি এবং অপর ছেলেটি বেপাত্তা। শেষকালে জানা গেল,

দু'জনকেই নাকি বিক্রী করা হয়। কোন্ এক লোহ্টা-নাগা ছেলেটিকে কেনে।···ভাগ্য খারাপ ছেলেটির। ও ঘরে আসবার দিনকয়েক বাদেই লোহ্টা মরল। গ্রামের সবাই তখন 'প্যানিকি'— ভয়ে আতঙ্কে দিশাহারা। সবাই ভাবল, যত নষ্টের গোড়া ঐ ছেলেটা। ওরই জন্যে লোহ্টা মরেছে; এবং কে জানে, আরও হয়তো অনেকেই মরবে। অতএব সরিয়ে দাও ওকে। খুন করো। করলেই দেখবে, সব ঠাণ্ডা। ওর ঘাড়ে বসে যে শয়তান, সে-ও সঙ্গে সঙ্গেই খতম। ···যেমন কথা, কাজও ঠিক তেমনি। লোহ্টা-নাগারা সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটিকে পাকড়াও করল। এবং বিশ্বাস করবেন?···ছাল ছাড়িয়ে নিল ওর গা থেকে। টুক্রো টুক্রো করে ওকে কাটল। গ্রামের প্রতিটি ঘরে একটা করে টুক্রো পাঠানো হল তারপর। দেখা গেল, সবাই খুব যত্ন করে ওটা রাখছে; ঘরের যে জায়গাতে ফসল থাকে, সেখানে। সকলেরই ধারণা, এইবার ভালো কিছু হবে। শয়তান শায়েস্তা হল বলে ফসলও ফলবে দ্বিগুণ।

—বলি, কী অত ফলাচ্ছ?—বলতে বলতে হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন ডঃ হোরাম। চৌকিদারীর কাজ সেরে বোধ করি। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—না না, এখানে কোনো স্টুডেন্ট্ ইন্‌ডিসিপ্লিন নেই; ছাত্ররা সবাই পড়তে আসে, পড়তে চায়।

আমরা জবাব দিলাম না কিছু। মিসেস হোরাম শুধু বললেন, —'পড়তে চায়' কথাটা এরই মধ্যে দু'-দু'বার বললে। আবার যদি বলো তো ওঁরা অন্য কিছু ভাববেন।

সবাই এবার একসঙ্গে হেসে উঠলাম। ডঃ হোরামও যোগ দিলেন।

সেদিন 'পীস-সেণ্টার'-এ ফিরে গিয়ে নতুন করে গল্প উঠল আবার। বিষয়বস্তু সেই একই,—নাগা-সমাজ।

আদ্দু বললে,—বহুরকম কুসংস্কার আজও চালু এখানে। নকলোর কীর্তি শুনুন।…একবার। মোককচুঙ্ যাচ্ছি। কোহিমা ছেড়ে সবে কয়েক মাইল এগিয়েছি। হঠাৎ দেখি, এক হরিণ। আমাদের একেবারে সামনে।…হরিণটা ভয় পেয়েছিল খুব। বিদ্যুৎ-গতিতে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটেছিল। কিন্তু নকলোর ভয় আরও বেশি। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল সে। বলল,—যাব না। কিছুতেই না।…শুধালাম,—কেন?…নকলো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল,—গেলে সর্বনাশ হবে।…আবার শুধালাম,—কেন?…নকলো বলল,—হরিণের জন্যে। দেখলে না, পথ পেরোল ও? যা ধরে আমরা যাচ্ছি, ঠিক সেই পথ।…সেদিন অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করি নকলোকে। বার বার বলি,—অযথা ভয় পাচ্ছ। হরিণ পথ পেরোল তো আমাদের কী?…কিন্তু বৃথা চেষ্টা : কিছুতেই কিছু হল না। গাড়ি ঘুরিয়ে কোহিমায় ফিরে এলো নকলো। ডঃ আরাম তখন কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। লিখছিলেন কী যেন। আমায় দেখতে পেয়ে বললেম,—ব্যাপার কী? ফিরে এলে যে?…আমি হরিণের ব্যাপারটা বললুন। নকলোর বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দিলুম সঙ্গে সঙ্গে।…কিন্তু ডঃ আরাম নির্বিকার। মৃদু হেসে বললেন,—এ ওদের বহুকালের সংস্কার। হরিণ পথ পেরোচ্ছে দেখলে ওরা আর সে-পথ দিয়ে যায় না। আগে তো যুদ্ধযাত্রা পর্যন্ত স্থগিত থাকত। অশুভ এই লক্ষণ দেখলে 'হেড্-হাণ্টার'রাও ভয়ে পিছিয়ে যেত।

বললাম,—অশুভ তো শুনলাম। এবার শুভ লক্ষণের কথাও শুনি!

আদ্দু বললে,—শুনবেন বৈকি! নিশ্চয়ই শুনবেন। তবে কী, নিরেট শুভ বলে কিছু নেই। যেখানেই দৈব-নির্দেশ, সেখানেই শুভ-অশুভ পাশাপাশি।

বললাম,—ঠিক বোঝা গেল না। খোলসা করে বলুন।

আদ্দু বলল,—এই যেমন ধরুন, পোষা মোরগ। উড়িয়ে দেয়া হল। যদি বেশ খানিকটা দূর অবধি যায় তো বুঝতে হবে, লক্ষণ শুভ। আর যদি না যায় তো অশুভ।…আবার ধরুন বাঁশ; আগুন দেয়া হল। যদি ফেটে গিয়ে বাঁ-দিকে পড়ে তো শুভ; কিন্তু ডান দিকে পড়লেই অশুভ।

গোপালবাবু বললেন,—আশ্চর্য! এ ধরনের কিছু কুসংস্কার ত্রিপুরীদের মধ্যেও রয়েছে।

অঞ্জলি বললে,—শুধু ত্রিপুরী কেন, সব দেশে সব কালেই রয়েছে। তবে কম আর বেশি!

গোপালবাবু সায় দিলেন,—যা বলেছ। এই তো সেদিন। অ্যাপোলো ১৩-র বিপর্যয়ের পর কত জ্ঞানী-গুণীকে বলতে শুনলুম, 'আন্‌লাকি থারটিন্'। ওরই জন্যে যত অনর্থ।

আদ্দু বললে,—দেখুন, অর্থ-অনর্থেরও আবার হেরফের আছে। 'আন্‌লাকি থারটিন্' আর 'আন্‌লাকি' মুরগীর ডিম এক কথা নয়।

শুধালাম,—কী বলতে চান আপনি?

আদ্দু জবাব দিল,—যা বলতে চাই তা নাগাল্যাণ্ডের একেবারে নিজস্ব।

—অর্থাৎ?

—যা মাথা খুঁড়লেও পৃথিবীর আর কোথাও পাবেন না।

—অর্থাৎ?

—যা দেখে আমি একদিন হতবাক, বিমূঢ়—

বলেই একবার থামল আদ্দু। রহস্যের রসকে সময়ের উত্তাপে গাঢ় করবে বলে একটু যেন দম নিল।—একবার। তিউয়েনসাঙের দিকে যাচ্ছি,—খুব ধীরে ধীরে শুরু করে আদ্দু,—সঙ্গে নকলো; এবং আর একজন দোভাষী। দেখতে দেখতে গাড়ির এঞ্জিন তেতে উঠল। নকলো বলল, সামনেই আছে ঝরনা। জল নিয়ে আসি।…বললুম,—চলো। আমিও যাচ্ছি।…নকলো গাড়ি দাঁড় করাল

তৎক্ষণাৎ। আমরা তিনজন হাঁটা-পথে এগোলুম। দুর্গম পথ। এখানে-সেখানে পেল্লাই আকারের পাথর। জায়গায় জায়গায় পাথরকে ঘিরে আবার ঝোপঝাড়; বুনো কাঁটালতা। খুব সাবধানে চলছি, এমন সময় একেবারে সামনেই ওক-গাছের আড়ালে নাগাদের একটি জটলা চোখে পড়ল। বুড়োমতো একজন চীৎকার করছে। কী যেন আওড়াচ্ছে প্রাণপণে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম দেখতে। উপস্থিত সবাই সকৌতুকে তাকাল। কিন্তু বুড়োর ভ্রূক্ষেপ নেই। চীৎকার করছে তো করছেই।.....ব্যাপার কী?—সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করতেই বুঝিয়ে দিল, বুড়ো এখন দৈব-নির্দেশের অপেক্ষায়। সামনের ওই ডিমগুলো থেকে নির্দেশ মিলবে।...ডিম?...ভালো করে তাকাতেই দেখি, হ্যাঁ, ডিম কয়েকটা আছে বটে। বুড়োর একেবারে সামনে।...কিন্তু চীৎকার করছে কেন ও? কী বলছে? —সঙ্গীদের শুধালুম আবার। নকলো কোনো জবাব দিল না। একমনে তামাসা দেখতে লাগল। অপর সঙ্গীটি জানাল, ও বলছে, প্রিয় ডিমগুলো আমার! ছলনা করো না। ঠিক ঠিক পথ বাৎলে দিয়ো যেন!...পথ? ব্যাপার দেখে আমি থ। ডিম আবার পথ বাৎলাবে কী?...উসখুস করছি দেখে সঙ্গীরা বলল, ঘাবড়াচ্ছ কেন? ছাখই না একটু!...দেখলুম। খানিক বাদেই ডিমগুলোকে ফুটো করা হল। এবং তারপর আগুনে ঝলসান হল ওদের। ঝলসান শেষ হতেই সবাই মিলে কী যেন পরীক্ষা শুরু করল। খুব যত্ন করে কী সব যেন দেখল। সঙ্গীদের কাছ থেকে শুনলুম, নতুন পাড়া মুরগীর ডিম ওগুলো। নাগাদের অনেকেই নতুন কোনো কাজে হাত দেবার আগে ডিম নিয়ে এই পরীক্ষাটি করে। অর্থাৎ কিনা, এইভাবে ঝলসে নিয়ে দেখে, ডিমের কুসুম আস্ত আছে কিনা। ...যদি থাকে তো ভালো, শুভ-কাজে হাত দেয়া চলবে। আর যদি না থাকে তো বুঝতে হবে, খারাপ; কাজে হাত দিলে সর্বনাশ একেবারে অবধারিত।...আমি অবাক হয়ে শুনছিলুম সব কিছু,

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছিলুম। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, নাগাদের মধ্যে আনন্দ-উল্লাস। সঙ্গীরা বলল, ব্যস। লক্ষণ শুভ। ডিমের কুসুম আস্তই আছে।··বললুম, বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু লক্ষণটা কিসের? ওরা কোন্ কাজে যাবে?·····সঙ্গীরা নাগাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বলল, শিকারে। জংলী হাতিকে শায়েস্তা করতে। ধারে-কাছেই কোন্ এক গ্রামে ঝামেলা শুরু হয়েছে নাকি।

—হুঁ, ঝামেলাই বটে।—আদ্দুর গল্প শুনে গোপালবাবুর মন্তব্য, —তবে কিনা, জন্তু-জানোয়ারকে নিয়ে ততটা নয়, যতটা নাকি কুসংস্কারকে নিয়ে।

গোপালবাবুর কথা আক্ষরিক অর্থে সত্যি। নাগাভূমিতে জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা ক্রমেই কমছে। কিন্তু কুসংস্কার আজও বহু জায়গায় অক্ষত। তিউয়েনসাঙ্ জেলায় যেমন, মোককচুঙ্ এবং কোহিমায়ও তেমনি পরিবর্তন হচ্ছে অতি ধীরে ধীরে।

মোককচুঙের বাইরের আদল দ্রুত বদলাচ্ছে। পথঘাট এবং কুটিরশিল্প তো বটেই, কলেজও গড়ে উঠেছে ওখানে। কিন্তু কুসংস্কারের নড়বড়ে ভিতের ওপর নতুন যুগের ইমারৎ উঠতে আরও সময় লাগবে।

এদিক থেকে ডিমাপুর এক ধাপ এগিয়ে। রেল-লাইনের দাক্ষিণ্যে এ শহর অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তামাম ভারতের সঙ্গে আজ এর বাণিজ্যিক যোগাযোগ।

কিন্তু নাগাভূমির অন্য জায়গাগুলো? নাগা-পাহাড়ের শতকরা প্রায় পঁচানব্বুই ভাগ এলাকা?—

আজও সময় ওখানে স্তব্ধ। আদিকাল ধ্যানমগ্ন। প্রহরী পাহাড়-গুলোর গায়ে গায়ে আরণ্যক উত্তরীয় আজও অম্লান। নাগাভূমির এক মহল্লা থেকে অপর এক মহল্লায় যেতে যেতে পাহাড়ের রূপবদল আজও চোখে পড়ে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মহল কোহিমার পাহাড়গুলো খাড়া ধাঁচের। কিন্তু মোককচুঙে ওরা হেলানো। শুধু মোককচুঙ্ বলি কেন, নাগা-পাহাড়ের মাঝমধ্যি-মহল্লার প্রায় সবটুকুই এই চেহারার।

তিউয়েনসাঙে চেহারা উদ্ধত আবার। পাহাড়গুলো খাড়া। যত পুবদিকে এগোবেন ততই ওরা দুরধিগম্য। পথঘাটও অপরিসর এবং বিপজ্জনক।

অবিশ্যি বিপদ কোথায় আছে আর কোথায় নেই, হলফ করে তা বলা কঠিন। খোদ নাগা-পাহাড়ে বিপদে পড়িনি আমরা, পড়েছিলাম ফেরবার পথে, মণিপুরে।—

সেকথা পরে বলছি। নাগা-পাহাড়-পর্ব আগে সেরে নিই।

ফেরবার দিন। সকাল থেকে বৃষ্টি। চারিদিক ঝাপসা. অস্পষ্ট। মনে হচ্ছিল বুঝি ধুয়ে-মুছে গেল নাগা-পাহাড়। অথবা কোহিমার পাহাড়রাও মোককচুঙের চেহারা ধরল। হেলান দিল সেইরকম।

সাত-সকালে 'পীস-সেণ্টার'-এর ড্রইংরুমে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় ডঃ আরাম এলেন বিদায় নিতে।

খুব নাকি দরকার। 'পীস-সেণ্টার'-এর কাজে কোথায় যাবেন।

বললাম,—এই বৃষ্টিতে ?

ডঃ আরাম জবাব দিলেন,—উপায় কী!

গোপালবাবু মধ্যস্থ হবার চেষ্টা করলেন,—ইচ্ছে থাকলে উপায় কিছু একটা হবেই।

ডঃ আরাম নাছোড়বান্দা। পাল্টা প্রশ্নে গোপালবাবুকেই হক-চকিয়ে দিলেন,—ইচ্ছে মানে, যাবার অনিচ্ছে তো ?

গোপালবাবু প্রথমে অবাক একটু, পরক্ষণেই হেসে আকুল,—ঠিক। ঠিক ধরেছেন। এই মুহূর্তে ইচ্ছের ঐ একটাই মানে।

ডঃ আরাম বললেন,—কিন্তু না গেলে যে কাজের ক্ষতি হবে!

অঞ্জলি অভিভাবিকার মতো বলল,—কোথায় কাজ? এই বৃষ্টিতে?

ডঃ আরাম জানালেন,—কোথায় আবার! 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড'দের ক্যাম্প-এ।

—না গেলেই নয়?—আমার শেষ চেষ্টা।

—না, নয়।—ডঃ আরামেরও সাফ জবাব।

তখুনি চলে গেলেন তিনি। আমাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিজতে ভিজতে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

গোপালবাবু ধারা-বর্ষণের মধ্যেই এগিয়ে গেলেন একটু। ডঃ আরামকে উদ্দেশ করে বললেন,—"Blessed are the peace-makers : for they shall be called the children of God".

"Blessed are the peace-makers"—'পীস-সেণ্টার' থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে গোপালবাবু ঠিক এই একই কথা বললেন আব্দু এবং মিসেস মিনতি আরামকে।

ওঁরা জবাব দিলেন না কিছু। মিস মহাস্তি ওঁদের হয়ে বললেন, "Those who raise the sword shall perish with the sword". (যা'রা তরবারি ধরবে তা'রা ওই দিয়েই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।)

ভাবছিলাম, তাই কি? যীশুখৃষ্টের এই বাণী কি অমোঘ? শাশ্বত?—এমন সময় ভাবনায় ছেদ পড়ে। নকলো গাড়িতে স্টার্ট দেয়। আরাম-কন্যা কাজিবিন্নু নেচে-কুঁদে অস্থির করে তোলে ওর মাকে। আর মা মিসেস মিনতি আরামকে চীৎকার করে বলতে শোনা যায়,—কাম্ এগেন! আবার আসবেন।

—ও ইয়েস্! নিশ্চয়ই!—চীৎকার করে উঠি আমরাও। 'পীস-সেণ্টার'কে পেছনে ফেলে ধীরে ধীরে এগোই।

কিন্তু আর কি আসা হবে? ফিরে যেতে যেতে আকাশ-পাতাল ভাবি, নাগাভূমি ঠিক তেমন করে আর কি হাতছানি দেবে আবার?

ওদিকে মেঘ কেটে গেছে এতক্ষণে। বৃষ্টি থেমেছে। আশে-পাশের বনপাহাড়কে এইমাত্র স্নান সেরে-আসা রূপসী নায়িকাটির মতো ঠেকছে।

ভাবি, এ-ও কি সম্ভব? মাত্র ঘণ্টা চারেকের ব্যবধানে বিপ্রলব্ধা কখনও বাসকসজ্জা হতে পারে?... এই তো, খানিক আগেও নাগা-পাহাড়ের কী চেহারা দেখেছি! কী করুণ, বিষণ্ণ! বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। দমকা হাওয়া বইছে তো বইছেই। কিন্তু এখন? ঠিক এই মুহূর্তে?—

তামাম নাগাভূমি প্রিয়-সমাগমে অধীর যেন। প্রসাধন-শেষে যেন মনমোহিনী।

সূর্যের মিঠে আলোয় ঝলমল করছে সে। এখানে-সেখানে জমে-থাকা বৃষ্টির জল এখনও চকমক করছে।

ফিরে চলি ঐ চকমকানি দেখতে দেখতে। ডিমাপুর-ইম্ফল রোড ধরে দ্রুত এগোই। ইম্ফল পৌঁছুতে বেলা প্রায় পাঁচটা। ডিপ্লোম্যাট হোটেলে পুরনো আস্তানায় ফিরে যেতে সন্ধ্যে প্রায়।

হোটেল পৌঁছে শুনলাম, সংবাদ শুভ; রামলাল ফিরেছে।

কিন্তু হায়! তখনও কি জানতাম, কী দারুণ দুঃসংবাদ জন্ম নিচ্ছে আমাদেরই জন্যে!

সন্ধ্যে হয় হয় তখন। ডিপ্লোম্যাট হোটেলের বারান্দায় বসে আছি। সামনেই টিকেন্দ্রজিৎ রোড। দোতলায় বসে লোকজনের আসা-যাওয়া দেখছি। হঠাৎ মনে হল, পশ্চিম দিকটা লালে লাল। ধারে-কাছেই কোথাও আগুন লেগেছে।

—ব্যাপার কী?—সামনেই ছিলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক; তাঁকে শুধালাম।

ভদ্রলোক রসিকতা করে বললেন,—আর ব্যাপার! হেলেন অব্ ট্রয়। আবার কী!

কিছুই বোঝা গেল না। সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে উঠল আরও। এদিকে ভদ্রলোক তখনও ঠিক থামেন নি। উঁকিঝুঁকি মেরে আগুনটা দেখে নিয়েছেন একবার। পরক্ষণেই শুরু করেছেন, —কোন্ এক পাঞ্জাবী ছোকরার কীর্তি। মণিপুরী এক মেয়ের সঙ্গে কী নাকি ফষ্টিনষ্টি করেছে। তাইতেই মণিপুরীরা রেগে আগুন। পাঞ্জাবী হোটেলে আগুন দিয়েছে।

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। পাওনা-বাজার এলাকার আরও দু'তিন জায়গায় দহন শুরু হল। ডিপ্লোম্যাট হোটেলের মালিক শান্তিলাল এলেন। সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন,—আলো নিভিয়ে দিন। ঘরে যান। এ হোটেলও অ্যাটাক্ড্ হতে পারে।

ভাবলাম,—হওয়াটা বিচিত্র নয়। আমরাও পাঞ্জাবী হোটেলেই আছি। শান্তিলাল ভুনেজী খাঁটি পাঞ্জাবী।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলাম। দুমদাম শব্দে হোটেলের সদর-দরজা বন্ধ হল। আলোগুলো নিভিয়ে দেয়া হল সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু তবু, ঠিক অন্ধকার ছিল না কোথাও। সামনেই টিকেন্দ্রজিৎ রোড-এ প্রচুর আলো। তারই খানিকটা দোতলার বারান্দায় এসে পড়েছিল। এছাড়া, হোটেলের জানালাগুলো সব কাঁচের। পর্দাগুলো সাদা। তাই ঘরেও আলোর ছিটেফোঁটা ছিল। অবিশ্যি না থাকলেই ভাল হ'ত। ঘরে ঢোকা মাত্রই আলো-আঁধারির মায়াজালে গা অমন ছমছম করত না।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সবাই বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মনে হল, আরও অনেকেই ওখানে। বেশির ভাগই পাঞ্জাবী। গণ্ডগোলের আঁচ পেয়ে হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন।

এদিকে গণ্ডগোল বাড়ছে ক্রমেই। সমুদ্র-গর্জনের মতো দূর থেকে বহু লোকের কোলাহল ভেসে আসছে

নকলো হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। যা বলল তা'র মানে দাঁড়ায়, 'পীস-সেণ্টার'-এর জীপ হোটেলের একেবারে সামনে। এখুনি ওটা সরানো দরকার।

গোপালবাবু বাধা দিলেন,—তা হয় না। যে কোনো মুহূর্তে এ হোটেলও অ্যাটাক্‌ড্‌ হতে পারে। এখন পথে নামা বিপজ্জনক।

কিন্তু নকলো শুনলে তো! বার বার নিষেধ সত্ত্বেও ঠিক নামল সে। গাড়িটাকে হোটেলের পেছনদিকে কোথায় যেন সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। হাতে একটি টিন।

শুধালাম,—এটা কী?

—পেট্রোল।—সংক্ষিপ্ত জবাব এলো অপর দিক থেকে,—গাড়ি মে থা।

বুঝলাম, পাছে মাছের তেলেই মাছ ভাজে কেউ, পেট্রোল ঢেলে জীপটির অন্তিম-যাত্রার পথ প্রশস্ত করে, সেই ভয়ে নকলো এ-কাজ করেছে। হাজার হোক, সাবধানের মার নেই।

সত্যি কি নেই?—হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সম্ভব-অসম্ভব কত কী ভাবি সেদিন। নকলোর সাহস এবং উপস্থিত-বুদ্ধি দেখে অবাক হই।

ওদিকে ছোকরা বসে নেই এক মুহূর্ত। সবাইকে অভয় দিয়ে বেড়াচ্ছে,—ডরো মৎ! মৎ ঘাবড়াও! আসলে আমরা ঠিক ঘাবড়াই নি তখনও। ভাবছিলাম, এ একটা সাময়িক ব্যাপার। তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণ। হাঙ্গামা কিছুতেই ছড়িয়ে পড়বে না।

এদিকে মিনিট দশেকও পেরোয় নি; দেখি, যা ভেবেছি ঠিক তা'র উল্টো। হাঙ্গামা ছড়াচ্ছে। হোটেল থেকে শ' দেড়েক গজ মাত্র দূরে টিকেন্দ্রজিৎ রোডের ওপরেই আগুন। সারি-বাঁধা কয়েকটা দোকান দাউ দাউ করে জ্বলছে।

নকলো বারান্দায় ছিল তখন। আমাদের সামনেই। দোতলার রেলিঙ্‌-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আগুন দেখছিল।

গোপালবাবু সাবধান করে দিলেন,—খবরদার! উঁকিঝুঁকি মেরো না। ঘরে যাও।

কিন্তু কে কা'র কথা শোনে! নকলো ঘরে যাবার নাম করে ছাদের দিকে ছুটল। যেন জমজমাট তামাসা চলছে অদূরে; না দেখলে সব আনন্দই মাটি।

অবাক হলাম। ভয়-ডর তো দূরের কথা, যেন আনন্দে-উল্লাসে ও ডগোমগো। বহুদিন বাদে সত্যিকারের খোরাক কিছু পেয়েছে।

তবে কি ওর রক্তের মধ্যেই ভৈরব-ভয়ঙ্কর? এই অছিলায় সঞ্জীবিত হল সে? আগ্‌হোকি যেমন শিকারের নাম করে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছিল, এ-ও ঠিক তেমনি এই উল্লাসের মধ্য দিয়ে আদিম কোনো বাসনা মেটাচ্ছে।

—বাবুজী ঘর মে বৈঠিয়ে! ও লোক আ রহা!—ঠিক সেই মুহূর্তে শান্তিলালের সাবধানবাণীতে হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠি। ভালো করে তাকাতেই দেখি, হ্যাঁ ঠিক তাই। ওরা আসছে। শ' দুয়েক লোক মার-মার কাট-কাট করতে করতে আমাদের হোটেলের দিকেই এগোচ্ছে।

তাড়াতাড়ি যে-যা'র ঘরে গিয়ে বসলাম। দম-বন্ধ-করা এক অস্বস্তিকর গুমোট যেন আমাদের টুঁটি চেপে ধরল।

ফিস ফিস করে কথা বলছি। বসে আছি ঠিক 'স্ট্যাচু'র মতো।

ওদিকে চীৎকার ক্রমেই বাড়ছে। একেবারে হোটেলের গায়েই উন্মত্ত-উত্তাল কিছু ঢেউ আছড়ে পড়ছে যেন।

মিনিট কয়েক বাদেই প্রলয় শুরু হল। হাঙ্গামাকারীরা ঢিল ছুঁড়তে লাগল মরীয়া হয়ে। হোটেলের দরজায় ঘন ঘন ঘা পড়ল। বিকট চীৎকারে ভারী হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস।

লক্ষ্য করলাম, সুধীরবাবু ভীষণ ভয় পেয়েছেন। কাঁপছেন থরথর করে। অঞ্জলির অবস্থাও প্রায় তথৈবচ।

ঠিক সেই মুহূর্তে রামলাল ঢুকল আমাদের ঘরে। অভয় দিয়ে

বলল,—ও কিছু না ; বেফায়দা হুল্লোড়। জলদি মিটে যাবে। লেকিন হ্যাঁ, জানালা বন্ধ করো না যেন। ইটা লেগে কাচ গিরবে।

তাড়াতাড়ি খুলে দিলাম জানালাগুলো। ভাবলাম,—কথাটা ঠিক। কাচের জানালা ; খুলে রাখি যদি তো 'ইটা' পর্দায় লাগবে। আঘাত ততটা গুরুতর হবে না।

এদিকে জানালা খুলতেই রামলাল বিদায় নিয়েছে। চীৎকারও খানিকটা কমেছে মনে হল।

ব্যাপার কী ?—ভালো করে কান পাততেই শুনি, হাঙ্গামা-কারীরা অন্যদিকে চীৎকার করতে করতে যেন নতুন কোনো শিকারের সন্ধানে ছুটছে।

তাড়াতাড়ি বেরোলাম ঘর থেকে। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দেখি, আরও অনেকেই ওখানে। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত।

হোটেলের প্রোপ্রাইটার শান্তিলালের ঘরের সামনে ছোটখাটো একটি ভিড়। কী যেন দেখছে অনেকেই।

এগিয়ে গেলাম। দেখি, টেলিফোন হাতে নিয়ে আর্তনাদ করছেন শান্তিলাল। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

না, পুলিশ-অফিসারদের কেউই স্বস্থানে ছিলেন না তখন। কী এক পার্টিতে গিয়েছিলেন নাকি।

রামলাল শেষ চেষ্টা করল। টেলিফোন হাতে নিয়ে কাকুতি-মিনতি করল অনেক। কিন্তু না, বৃথা চেষ্টা। দুম্ করে ফোনটিকে ফেলে রেখে ও যখন উঠে দাঁড়াল, তখনই বুঝলাম, ফলপ্রসূ কিছু হয় নি। মুরুব্বী কা'রও সঙ্গে কথা বলতে পারে নি ও।

টিকেন্দ্রজিৎ রোডে তখনও লাইন দিয়ে আগুন। সারি-বাঁধা কয়েকটা দোকান দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ফায়ার ব্রিগেড এলো। দু'-দু'টো গাড়ি ডিপ্লোম্যাট হোটেলের সামনে দিয়েই বিদ্যুৎবেগে গেল। ভাবলাম, যাক ! অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে আসবে এবার।

কিন্তু কা কস্য পরিদেবনা! ফায়ার ব্রিগেড-এর গাড়ি আসল জায়গা অবধি যেতেই পারল না। ঢিল ছুঁড়ে দুষ্কৃতকারীরা ওদের ফেরৎ পাঠাল।

ভাবনায় পড়লাম। 'পীস-সেণ্টার'-এর গাড়িটি ঠিক আছে তো? আমাদের পোঁছে দিয়ে কাল ভোরেই না নকলোর কোহিমা ফেরার কথা!

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় সেই চীৎকার কানে এলো আবার। হাঙ্গামাকারীরা আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে মনে হল।

এবারের চীৎকার আরও ভীষণ, আরও ভয়ঙ্কর। হাঙ্গামা-কারীদের সংখ্যা আগের তুলনায় যেন আরও বেশি।

রামলাল সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান করে দিল সবাইকে,—অন্দর চলো। শান্ত্ হো যাও বাবুজী! সব কুছ ঠিক হো যায়গা।

কিন্তু কোথায় ঠিক! ঘরে ফিরতে-না-ফিরতেই দেখি, নতুন উদ্যমে আক্রমণ শুরু হয়েছে। হোটেলের একতলায় দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়েছে যেন।

মনে পড়ল, একতলায় দোকান আছে কয়েকটা। বেশির ভাগই পাঞ্জাবীর। আক্রমণ হয়তো ওদেরকে লক্ষ্য করে।

আবার দম বন্ধ হয়ে এল। বারান্দায় গেলাম একবার। মনে হল, কা'রা যেন বলাবলি করছে, হাঙ্গামা নাকি ছড়াচ্ছে ক্রমেই। লড়াই এখন এসে ঠেকেছে মণিপুরী বনাম অ-মণিপুরীতে।

এগিয়ে যাচ্ছিলাম, দুঃসংবাদটুকু পুরোপুরি জানব বলে। এমন সময় কোথা থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে এলো রামলাল। আবার আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলল,—অন্দর চলো। শান্ত্ হো যাও বাবুজী!

আশ্চর্য! রামলালের কাণ্ডকীর্তি দেখে আমি থ। একদিন পয়লা নম্বরের বখাটে আর অপোগণ্ড ভেবেছিলাম যা'কে, এখন এই

বিপদের মুখে দেখছি, সে-ই সবচেয়ে কাজের। ধীর-স্থির মস্তিষ্কে হোটেলের সবাইকে অভয় দিচ্ছে। অথচ সবাই আমরা ভালো-ভাবেই জানি, দুষ্কৃতকারীরা একবার যদি গেট ভাঙে, কোনোমতে একবার ওপরে উঠে আসে যদি তো সকলের আগে বিপদ হবে এই রামলালেরই। কারণ, সে একে পাঞ্জাবী, তায় তরুণ।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরলাম। হোটেলের ওপর ইট-পাথর পড়তে লাগল আবার। ঝন্ ঝন্ শব্দে কী সব যেন ভেঙে পড়ল।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। হৈ-হট্টগোল প্রায় বন্ধ। মনে হল, দুষ্কৃতকারীরা সরে গেছে।

দুরু দুরু বুকে হোটেলের বারান্দায় এসে দাড়ালাম। দেখি, আগুন! আমাদের হোটেলেই। বারান্দার গা-ঘেঁষে তার লকলকে জিভ।

রামলাল সামনেই ছিল। বলল,—আগ লাগায়া বেতমিজ। গ্রাউণ্ড ফ্লোর মে ইণ্টারন্যাশনাল হোটেল কো বরবাদ কর দিয়া।

এখন উপায়? আমাদের সকলেরই মাথায় হাত। হোটেল থেকে বেরোতে না পারলে জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে।

অগত্যা সবাই মিলে বেরোবার উদ্যোগ করি। রামলালকে বলি,—ছাদে যাও একবার। নকলোকে ডাকো।

কিন্তু বেরোয় কার সাধ্যি! হোটেলের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই ইট-পাথর পড়তে লাগল আবার। নিরুপায় হয়ে পরক্ষণেই আবার ঘরে ফিরতে হল।

এদিকে ঘরের অবস্থাও মর্মান্তিক। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। বিদ্‌ঘুটে একটা গন্ধ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করছে ক্রমেই। আত্মরক্ষার শেষ আশাটুকুও যেন লুপ্ত।

ঠিক সেই মুহূর্তে গোপালবাবু ধ্যানে বসলেন। আমি, অঞ্জলি এবং সুধীরবাবু ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

চোখে পড়ল এক হৃদয়বিদারী দৃশ্য: -অসহায়ভাবে ছোটাছুটি করছে কেউ। কেউ বা ভয়ে-দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ছে।

ভাবলাম, চেষ্টা করতেই হবে। এভাবে আত্মসমর্পণ করা কিছুতেই চলবে না।...ঠিক এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো রামলাল। বলল,—আ গিয়া বাবুজী! বন্দুকওয়ালী সিপাহী।

শুধালাম,—পুলিশ এসেছে?

—জী হুজুর!—বলেই রামলাল ছুটল আবার।

এদিকে আমার মনে হল, আরও অনেকেই যেন ছুটছে। পথের ওপর থেকে বহু লোকের জুতোর খট্ খট্ আওয়াজ ভেসে আসছে।

এবারে অন্য দৃশ্য। যাঁরা ভয়ে চুপ, তাঁরা বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন। পুলিশকে বললেন,—ফায়ার!

একমাত্র গোপালবাবুর অনুরোধটাই ভিন্ন রকমের। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন তিনি। পুলিশকে করজোড়ে বললেন,—প্লিজ, ডোণ্ট্ ফায়ার!

শেষ পর্যন্ত ফায়ারিং অবিশ্যি হয় নি। তবে হোটেলের আগুন নেভাতে প্রায় সবাইকেই হাত লাগাতে হয়েছিল। রামলালের নেতৃত্বে ছেলেবুড়ো অনেককেই।

রাত এগারোটা নাগাদ আগুন নিভল। ফায়ার ব্রিগেডও এলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু নকলো কোথায়?

ছাদে গিয়ে দেখি, একা দাঁড়িয়ে। পাশেই এক রাশ ইট-পাথর।

—এখানে কী করছ নকলো?—অবাক হয়ে আমি শুধালাম।

নকলো জবাব দিল,—দেখছি। ওই যে, একটু দূরেই 'পীস-সেণ্টার'-এর জীপ। ওদিকে নজর রাখছি।

—নজর!—জবাব শুনে আমি স্তম্ভিত,—কিন্তু ওই ইট-পাথরগুলো?

নকলো রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল,—খুন করব বলে। যে কেউ গাড়িতে হাত দেবে তা'কেই।

বললাম,—কেউ আর হাত দেবে না। হাঙ্গামা মিটে গেছে। চলো।

কিন্তু না, নকলো কিছুতেই গেল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল
স্তম্ভিত হলাম। ওর কর্তব্যজ্ঞান আর গোঁ দেখে।

পরদিন। খুব ভোরে। যাত্রার তোড়জোর শুরু হল।

নীলকান্তকে ফোন করা হয়েছে। জানিয়েছেন, এয়ার লাইনস্-এর সিটি অফিস-এ দেখা করবেন। সকাল সাতটা নাগাদ।

কিন্তু সিটি অফিস-এ গিয়ে লাভ? টিকিট কি পাব? ছ'টো কোলকাতার, আর ছ'টো আগরতলার?—

আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় নীলকান্তর ফোন এলো। বললেন,—তাড়াতাড়ি সিটি অফিস-এ চলে আসুন। স্টেশন ম্যানেজার মিঃ মুখার্জী কথা দিয়েছেন, টিকিটের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

তখুনি ছুটলাম। সদলবলে। শান্তিলাল জীপ অবধি এগিয়ে দিলেন আমাদের। বার বার করে বললেন,—বাবুজী, ফির আনা ইধার। ছ' চার রোজ ঠহরনা। মণিপুরী আদমী 'কম্যুন্যাল' নেহী। কভি নেহী। কাল তো উন্‌কা গলতি হো গিয়া।

বললাম,—না না, কালকের ব্যাপারটা মনেই রাখি নি। এরই মধ্যে ভুলে গেছি।

কিন্তু সত্যি কি এত সহজে ভোলা যায়? দীর্ঘ চার-পাঁচ ঘণ্টার দুঃস্বপ্ন মুছে ফেলা যায় রাতারাতি?—নিজের মনকেই প্রশ্ন করি সেদিন। জীপে উঠতে উঠতে ইণ্টারন্যাশন্যাল হোটেলের দগ্ধ আসবাবগুলোর দিকে তাকাই।

পথের একপাশে ডিপ্লোম্যাট হোটেলের ঠিক সামনেই স্তূপীকৃত ওরা। ওদের আশেপাশে বহু লোকের ভিড়।

দেখলাম, রামলালও ওখানে। যথারীতি শিস দিচ্ছে। সামনেই বন্দুকধারী পুলিশদের দিকে তাকাচ্ছে ফিরে ফিরে।

মনে হল, যাই একবার। রামলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। কাল রাত্তিরে ওর অন্য মূর্তি দেখেছি।

কিন্তু কোথায় রামলাল ? পলক ফেলতেই দেখি, জীপের ঠিক পা-ঘেঁষেই ও চলে গেল। আরোহী কা'রও দিকে ফিরেও তাকাল না।

তাকিয়েছিলেন স্টেশন ম্যানেজার মিঃ মুখার্জী। আলাপ হতেই একদৃষ্টিতে। বলেছিলেন,—টিকিট চান তো ? হু'টো কোলকাতায়, আর হু'টো আগরতলায় ?

বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে জবাব দিয়েছিলাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হবে টিকিট ;—মিঃ মুখার্জী রহস্যময় এবার,—কিন্তু একটা সর্তে। ভ্রমণ-কাহিনীতে আমার কথা লিখতে হবে।

—ভ্রমণ-কাহিনী ?—আমি অবাক।

ওদিকে মিঃ মুখার্জীও কম যান না। হুম্ করে ব্রহ্মাস্ত্রটি ছাড়েন,—নীলকান্ত সব আমায় বলেছেন।

—নীলকান্ত ? তাঁর এই কীর্তি ?—বলতে বলতেই দেখি, ভদ্রলোক আমাদের একেবারে সামনেই। মাথা নুইয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মুখ-চোখ ফ্যাকাসে। যেন এইমাত্র অসুখ থেকে উঠে এলেন।

বললাম,—বসুন। দাঁড়িয়ে কেন ?

মিঃ মুখার্জীও যোগ দিলেন,—তাই তো! কোন্ দুঃখে দাঁড়িয়ে ? —ও! বুঝেছি!—একটু থেমে আবার শুরু করলেন তিনি,—কালকের ব্যাপারে মন খারাপ। কেমন ? তাই না ?

নীলকান্ত এবারও জবাব দিলেন না কিছু। চুপচাপ রইলেন।

অগত্যা মিঃ মুখার্জীকেই সক্রিয় হতে হল আবার,—দেখুন, ওরা সব কোলকাতার লোক। এমন হাঙ্গামা প্রায়ই দেখেন। অতএব বৃথা এই সংকোচ আপনার। 'ফর নাথিং' একেবারে।

নীলকান্ত হা-হা করে উঠলেন,—না না ; এ আপনি কী বলছেন ? কোলকাতায় অন্ততঃ প্রভিন্সিয়ালিজম্ নেই।

—বেশ মশাই, নেই তো নেই! এখন একটু স্থির হয়ে বসুন

তো !—বলেই মিঃ মুখার্জী উঠলেন একবার। কী এক কাজে যেন বাইরে গেলেন। পরক্ষণেই আমরাও বেরোলাম একটু। নকলোর কাছে গেলাম বিদায় নিতে।

গোপালবাবু ওকে এক লোভনীয় প্রস্তাব দিলেন,—ছ্যাখ নকলো, তোমার কাজে আমরা খুশি। খুব খুশি। যদি চাও তো আগরতলায় চাকরি দিতে পারি। পাকা সরকারী চাকরি।

নকলো প্রথমে জবাব দিল না কিছু। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। গোপালবাবু আবার বললেন,—কী? জবাব দিচ্ছ না যে? 'পীস-সেণ্টার'-এ তোমার তো স্থায়ী কাজ নয়! চাকরি পেলে যাবে?

নকলো সরাসরি জবাব দিল এবার,—নেহী।

—যাবে না?

—নেহী। বলেই ধীরে ধীরে এগোল সে। সামনেই দাঁড়-করানো দীপদানিতে উঠল। আমরা অবাক বিস্ময়ে আদিম বন-পাহাড়ে বেড়ে-ওঠা, আপন পরিবেশের প্রতি মমতাময় দুঃসাহসী ও বিশ্বস্ত নাগা-তরুণটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মিঃ মুখার্জীর ঘরে ফিরে দেখি, নীলকান্ত তেমনি বসে। চুপচাপ, গম্ভীর। ততক্ষণে মিঃ মুখার্জীও এসে গেছেন। ওঁর টেবিলের ওপর কয়েকটা খাবারের প্যাকেট।

আমাদের দেখতে পেয়ে প্রত্যেকের হাতে একটা করে গুঁজে দিলেন। বললেন,—খেয়ে নিন। মা কালীর প্রসাদ।

মনে পড়ল, গতকাল ছিল পয়লা নভেম্বর, কালীপুজোর রাত্রি। কিন্তু তবু, আবাক লাগল খুবই। কেননা, খোদ স্টেশন ম্যানেজারের ঘরে ঠিক এ ধরনের আপ্যায়ন কেউ প্রত্যাশা করে না।

মিঃ মুখার্জী আমাদের অবস্থা আচ করে থাকবেন। তুম্ করে বললেন,—কী, অবাক তো!···না না, অবাক হবার কিছু নেই। আমি এখানকার কালীপুজোর পাণ্ডা। পুজো পুজো করে গত দু' রাত্তির ঘুমোই নি।

মিঃ মুখার্জীর দিকে তাকালাম। স্পষ্ট চোখে পড়ল, পঞ্চাশোত্তর ভদ্রলোকটির চোখে-মুখে রাত্রি-জাগরণের চিহ্ন।

ভদ্রলোক নিজেও বললেন,—সোজা চলে এসেছি মশাই। পুজো-প্যাণ্ডেল থেকে এই অফিসে। হাত-মুখও ধুই নি। আজ আবার বড় কাজ। কোলকাতায় মেয়ের হস্টেলে প্রসাদ পাঠাতে হবে।

হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলেন তিনি প্রসাদ। যে প্লেনে আমরা এলাম, তারই পায়লট মারফৎ। কিন্তু এয়ার-পোর্টে প্লেনে উঠবার মুহূর্তে বিপদ।—

গোপালবাবু নীলকান্তকে বললেন,—আমরা কৃতজ্ঞ। অনেক করেছেন আমাদের জন্যে।

নীলকান্ত জবাব দিলেন না কিছু। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন। আর আমরা স্পষ্ট দেখলাম, তাঁর চোখ দু'টো চকচক করছে।

গোপালবাবু এগিয়ে গেলেন নীলকান্তর কাছে। তাঁর হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে বললেন,—আপনি ভেঙে পড়ছেন নীলকান্ত?

—না না, ঠিক তা নয়;—জবাব এলো অপর দিক থেকে,—তবে হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, আমরা মণিপুরীরা 'কম্যুন্যাল' নই।

বললাম,—বিশ্বাস তো করেই আছি। অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে কেন?

গোপালবাবু বললেন,—দেখুন, এক পাঞ্জাবী ছোকরার দোষে সব পাঞ্জাবী বা সব অ-মণিপুরী যেমন দোষী নয়, ঠিক তেমনি আবার গোটাকতক মণিপুরীর জন্যেও তামাম মণিপুর দায়ী নয়।

নীলকান্ত সায় দিলেন,—তা ঠিক। কিন্তু দায়িত্ব? কাউকে না কাউকে তো নিতেই হবে! মণিপুরী হয়ে তা এড়াই কী করে?

বললাম,—কই! এড়ান নি তো! পয়লা নভেম্বরের পাপকে আজ এই দোসরা নভেম্বর সকালে আপনিই তো ধুইয়ে দিলেন! আপনার চোখই সব ফাঁস করে দিল যে!